কালরুদ্র

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

দেবশ্রী সাহিত্য সমিতি
১১ এ, তারক প্রামানিক রোড, কলিকাতা ৬

শ্রীশান্তিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়
দেবশ্রী সাহিত্য-সমিধ
৯৯এ, তারক প্রামানিক রোড,
কলিকাতা—৬

দাম চার টাকা

প্রচ্ছদ-রূপকার
শ্রীপ্রভাত কর্ম্মকার

সমাজে জন্মে যারা

পায় না সামাজিক জীবন—

বধূ হয়েও থাকে

বিধবার মত অভাগী—

মা হয়েও পায় না

মাতৃত্বের গৌরব—

তাদের উদ্দেশে।

আজিকার কণ্টকাকীর্ণ পথে যাত্রা আমাদের প্রতিকূল বাতাসে বিষাক্ত—জীবন তাই বিপর্য্যস্ত, বেদনাময়; যে শুদ্ধ দৃষ্টি, অনমনীয় দৃঢ়তা, অবিচলিত আদর্শবোধ আজিকার এই জীবন-সঙ্কটকে অতিক্রমনীয় করিতে পারে, তাহারই বলিষ্ঠ ইঙ্গিত আছে এই উপন্যাসে। মানুষের সাধারণ জীবনের পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন—অন্তরের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শবোধের মধ্যে যে দ্বন্দ্বের আবর্ত্ত আজ চলার পথকে জটিল করিয়া তুলিয়াছে—তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া রচিত এই উপন্যাসখানি ফাল্গুনীবাবুর 'জীবনরুদ্র' নামক উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্ব্ব। ইহার তৃতীয় পর্ব্ব 'মহারুদ্র' নামে প্রকাশিত হইবে।

বর্ত্তমান কাগজ-সঙ্কট, প্রেস-বিভ্রাট ইত্যাদির মধ্যে পুস্তকখানি প্রকাশ করিতে আমাদের কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইল, তজ্জন্য আমাদের অনুরাগী পাঠক-পাঠিকার নিকট মার্জ্জনা চাহিতেছি। এরূপ বড় একখানি বই একই সঙ্গে তিন পর্ব্ব প্রকাশ করা আমাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য এবং একসঙ্গে অনেকগুলি টাকা দিতে হইবে বলিয়া উহা ক্রেতাদের পক্ষেও আমরা সুবিধাজনক মনে করি না; এইজন্যই পুস্তকখানিকে আমরা 'জীবনরুদ্র', 'কালরুদ্র' এবং 'মহারুদ্র' এই তিন ভাগে প্রকাশ করিলাম।

আশা করি জীবনরুদ্রের মত কালরুদ্রও জনসাধারণের সমাদর লাভ করিতে সক্ষম হইবে।

বিনীত

প্রকাশক

দেবশ্রী সাহিত্য সমিতি

শঙ্খধ্বনি !

নটরাজের নর্ত্তনভঙ্গীমা যেন পরিবর্ত্তিত হয়ে গেল অকস্মাৎ—আনন্দম্ ! ধ্বংসের প্রলয়-তাণ্ডব থেকে একেবারে নবসৃষ্টির আনন্দালোকে কে এনে দিল এই বিশাল দেশের বিপুল জন-জীবনকে ? —তিনি কে ? কে তিনি ! প্রশ্নটা অবান্তর। অথচ এ প্রশ্ন না করেই পারা যায় না ! উত্তর অপ্রত্যক্ষীভূত ভগবান, আর মানুষের প্রত্যক্ষীভূত এক মহামানব—অহিংসা-মন্ত্রের উদ্গাতা—সাম্য-মৈত্রী-শান্তির মূর্ত্তবিগ্রহ !

কিন্তু এত আনন্দের মধ্যেও কোথায় যেন একটা জ্বালা অনুভূত হচ্ছে, অঙ্গে—না, অন্তরে ? জ্বালাটা বাহ্যিক, কি আভ্যন্তরীণ, তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। থাক্ ঐটুকু জ্বালা,—যে আনন্দের বন্যাস্রোত আজ অন্তরে বাহিরে প্লাবন জাগিয়ে তুলেছে, তাকে অভিনন্দিত করবার জন্য শঙ্খধ্বনি জাগলো—আকাশে, বাতাসে, জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে—পরাধীনতার মুক্তি-মহিমায় ! আলোকনাথ রাত্রি দ্বিপ্রহরের উৎসব শেষ করতে চাইছে না—আজ ১৪ই আগষ্ট—মধ্যরাত্রি—ভারতের স্বাধীনতা ঘোষিত হচ্ছে দিল্লীর সুপ্রাচীন ধূলিতে। মহাভারতের স্বাধীনতা—না, মহাভারতের দুদিকের দুই অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল ! হোক—এই দুই অংশও তো স্বাধীন আজ, এই পরমমুহূর্ত্তে।

শ্রীসাহনী মুখোপাধ্যায়

স্বাধীনতা—স্বাধীন দেশ—স্বাধীন মানুষ! আ! কী আনন্দের জীবন এলো আজ! শাশকের শোষণে জীর্ণ, বিদেশীর পদাঘাতে ভগ্ন, ধনিকের স্বার্থপরতায় পঙ্কিল জীবনের আজ অবসান—আনন্দম্! আনন্দই অমৃত! জাতি আজ অমৃত লাভ করলো! যে মহামানব এই মহামৃত জাতির জন্য এনেছেন—তাঁকে নমস্কার, বারম্বার নমস্কার।—আলোক নমস্কার করলো।

অপর্ণা ঘাস-ঘুচানো উঠোনটায় গোময় লেপন করে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিয়েছে—তারপর দিয়েছে সুন্দর ছাঁদে আলপনা। নও-কিশোর আর যুমনীরা দল গোল হয়ে দাঁড়িয়েছে জায়গাটায়। মাঝে সেই সুদীর্ঘ দণ্ড, যার উপর ভারতের চক্রলাঞ্ছিত পতাকা এই মাত্র উত্তোলন করা হোল—[illegible] হয়ে উঠছে বাতাসের আনন্দ-স্পর্শে। আলোক বার বার চেয়ে দেখতে লাগলো। দিশি দিশি শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি চলেছে—ভেসে আসছে তার অবিশ্রান্ত স্বর—অশ্রুতপূর্ব্ব আবেগ—অমৃতময় আশ্বাস!

[illegible]স! জীবন আজ জাগ্রত হয়েছে, আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে! আর ভয় কি? চিন্তারইবা কি আছে? অচিরে, অবিলম্বে ভারত আবার বিশ্বের গুরুর আসন গ্রহণ করবে—তার প্রস্তুতি প্রয়োজন—, কিন্তু…

—দাদা! বড়দি' তো এলেন না?

অপর্ণা প্রশ্ন করলো অকস্মাৎ। বড়দিমণি! এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাত্রী, প্রাণ-স্বরূপিনী। এমন উৎসবের দিনে, এত বড় আনন্দের অংশ গ্রহণ করতে তিনি এলেন না! কেন? তা জানে আলোক, কিন্তু নিতান্ত অশিক্ষিতা ঐ গ্রাম-কন্যাকে সে-তত্ত্ব বোঝানো যাবে না! তাই বললো সান্ত্বনার সুরে,

—হয়তো তাঁর বাড়ীতেই কিছু করছেন! কাল সকালে নিশ্চয় আসবেন।

কিন্তু অপর্ণা সান্ত্বনা পেল না। এই আশ্রমে তার একমাত্র আশ্রয় বড়দিমণি; যদিও অপর্ণার থেকে তিনি বয়সে ছোট এবং অপর্ণার থাকলেও, অভিজ্ঞতাতেও খাটো। অপর্ণা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললো,

—বড়দিমণি বলছিলেন যে, দেশ যখন স্বাধীন হোলো, তখন তোমরা আবার বাপ-পিতামোর ভিটেতে ফিরে যেতে পারবি—যারা দেশ ছেড়ে গেছে তারাও আসবে। সত্যি দাদাবাবু? চাল পাব—কাপড় পাব—ঘরে গিয়ে থাকতে পারবো?

—সেই রকম তো আশা করছি, দিদি! বহু বহু বৎসরের জীবনের গ্লানি আজ ধুয়ে মুছে এই চক্রচিহ্নিত পতাকা নিয়ে আমরা চলেছি আজকার অভিযাত্রীদল—আজ সব দুঃখ-বেদনা ভুলবার জন্য [illegible] কাপড়-কুঁড়ের তুচ্ছ কথা থাক আজ বোন।

বলেই কিন্তু আলোক হাসলো নিজেই। জীবনের নিতান্ত প্রয়োজন চাল-কাপড়-কুঁড়ে! সেটা না থাকলে চলে না! না থাকলে স্বাধীনতার অর্থটাও বোধগম্য হয় না ওদের কাছে। স্বাধীনতার মত মহান বস্তুকে ওরা শুধু চাল-কাপড়-কুঁড়ে দিয়েই যাচাই করতে চায়, জীবন আজ এতোখানি নেমেছে শোষনের গহ্বরে, কিন্তু সত্যি কি চাল-কাপড়-কুঁড়ে হবে? হবে! আজ না হয়, দশ বছর পরেও হবে। যে মহান নেতৃত্বের বিশালতায় আজ এই বিজয়-শঙ্খ নিনাদিত হচ্ছে—সে শঙ্খধ্বনি শুধু যুদ্ধ জয়েরই ধ্বনি নয়—যুদ্ধোত্তর জীবনের শান্তি-সাম্য-শৃঙ্খলারও শুভ-সূচনা! কিন্তু…

আলোক কেন যেন বিষণ্ণ হয়ে পড়লো অকস্মাৎ। অথচ বিষণ্ণ হবার কোনো কারণ আজ খুঁজে পাওয়া যায় না। সারা মহানগরী উৎসবে মেতেছে! সম্প্রদায়ের ভেদাভেদ ভুলে, বীভৎস বিদ্বেষের প্রাচীর ভঙ্গ করে তারা আজ আলিঙ্গনবদ্ধ হচ্ছে জাতি-ধর্ম-আচারের বিভেদকে অগ্রাহ্য

করেও আজ সত্যি আনন্দের দিন—কিন্তু···আলোক ভাব বুঝ্যে ক্রিয় করা হোল এই স্বাধীনতা, তার প্রত্যাশিত ফল শান্তি সমৃদ্ধি !—সেটা কি সম্ভব হবে !

—রাস্তামে ঝুঠা আউর খানে নাহি হোগা দাদাবাবু ? ঝুম্

—তা ঠিক বলতে পারি না ঝুমনী—হয়তো রাস্তা পরিস্কার হয়ে যাবে যে ঝুঠাও পাওয়া যাবে না— !

—তব্ হামি বাঁচবে কি খাইয়ে বাবুজি ?

নওকিশোরের কঠিন প্রশ্ন ! আলোক উত্তর দিতে ইতস্ত কিন্তু কিশোর তার প্রশ্নের জবাব চায় ; আবার বললো,

—কিয়া চুরি করেগা ?

—না—না কিশোর ; নেতারা বিশেষভাবে জানেন, দেশে খাবার নাই—কাপড় নাই, এটা ভালই জানেন তাঁরা ! তবে সব করতে কিছুদিন সময় তো তাঁদের দিতে হবে ভাই !

—সাবাস্—বাহ ! লেকিন, হামি লোক তো স্বাধীন চুরিউরি আউর নেহি করবে। দাঙ্গামে বৈজনাথ বহুৎ লুঠ হামকো থোড়া রূপেয়া দিয়েছিল বাবুজি—উ রূপেয়া হামি স্বর জমা দিয়েছে ! একঠো ঝাণ্ডা কিনেছে আউর আঢ়াই সের খা'জাইয়ে-থোড়া জলখাবার—খা লিজিয়ে।

—কিন্তু তোমার সে ঝাণ্ডা কোথায় ?

—উ হাম্ রাখিয়ে দিল ! কাল সবের তো কুছ করতে উ দুসরা ঝাণ্ডা কাল উড়াইয়ে। আ যাইয়ে বাবুজি—আ-যাও আ-যাও বহিনলোক—ভেঁইয়ালোক—আ-যাও।

কিশোর রসগোল্লার ভাঁড়টার পাতা খুললো—হাতে হাতে করে দিল সবাইকে দুটো করে। আলোকের হাতেও দিল

ভারতের প্রথম খাদ্য—সুস্বাদু মিষ্টান্ন—হোকনা সে খাদ্য অত্যন্ত অর্জিত অর্থে ক্রীত। আলোক মুখে দিল—আঃ অমৃত যেন।

শেষ হোল উৎসব রাতের মত, কিন্তু এ উৎসব কি শেষ হবে, না শেষ হওয়া উচিৎ? যুগান্ত পারের এই স্বাধীনতা-উৎসব যুগযুগান্ত ব্যাপ্ত হয়ে চলতে থাকুক! ভারতের সাংস্কৃতিক পরিরক্ষণের সুপ্রাচীন ভাণ্ডার মথিত করে দিনে দিনে এই উৎসবের আচার-পদ্ধতি অপরূপ সুষমায় পূর্ণ হয়ে উঠুক! —বিশ্বের কোনো জাতি উৎসবকে ভারতের মত [illegible] কালানুমোদিত করতে পারেনি—এই সত্য সারা জগতে ব্যাপ্ত হোক।

আলোক শুয়ে শুয়ে চিন্তা করছিল—স্বাধীন ভারতের মৃত্তিকায় শুয়ে। সত্যি কি স্বাধীন হোল ভারত? স্বপ্ন দেখছে না তো আলোক? বিশ্বাস করা এখনো যায়কি, দীর্ঘ দু'শতাব্দির ইংরাজশাসন মুক্ত হয়েছি আমরা আজ? —আজ দিল্লীর গগনে-পবনে বিঘোষিত হচ্ছে স্বাধীনতার শঙ্খরব!-কোনো রক্তপাত নেই—কোনো বিপ্লব নেই—এমনকি, কোনো রকম আন্দোলনও ব্যাপকভাবে সক্রীয় নেই—তবু ইংরাজ ভারত ছেড়ে দিল···আশ্চর্য্য!

আশ্চর্য্য নয়। ভারতের বরেণ্য সন্তানগণের দীর্ঘ দিনের সাধনা আজ সফল হোল—সিদ্ধিলাভ করলো! ইংরাজ বুঝেছে—এ জাতিকে আর পরপদানত রাখা যাবে না, তাই সময় থাকিতে সরে পড়লো, কিন্তু সরে পড়বার পূর্ব্বে সে যে-খেলা খেলে গেল, যে-পাশা চেলে গেল, তার পরিণাম···আলোকের চিন্তাটা এইখানে এসে থেমে যেতে চাইছে।

কিন্তু স্বাধীন জীবনের অনাস্বাদিত আস্বাদ বড়ই মধুর—মনটা আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে যেতে চাইছে যেন। আলোকের মনের চিন্তাধারা বিশৃঙ্খল

হয়ে যাচ্ছে আত-আনন্দের আওতায়। উৎসব করবার দিন আজ সাত্য এসেছে। কিন্তু···আলোকের অতি-বিচারশীল সূক্ষ্ম দার্শনিক মন আবার চিন্তায় কুঞ্চিত হয়ে উঠলো,—এই স্বাধীনতা জাতির ভিক্ষালব্ধ, নাকি পৌরুষার্জ্জিত! ভিক্ষালব্ধ হলে তো বড়ই পরিতাপের কথা!

চিন্তাটা বিরক্তিকর এই আনন্দের মুহূর্ত্তে; তথাপি চিন্তা না করে পারা যায় না। কত দুঃখ, কত নির্য্যাতন, কত রক্ত, কত মৃত্যুর পরে এল এই স্বাধীনতা—কিন্তু সে স্বাধীনতার জন্য বীর্য্যের গৌরব করবার মত কি রইল? অনাগত যুগের সন্তানগণ কোন্ পৌরুষের উত্তরাধিকারী হবে [illegible] বীরত্বের মহিমা-মার্জ্জিত, মৃত্যুর রক্তাক্ত পথের পতাকা [illegible] মৃত্তিকায় যদি প্রোথিত করতে হয়, তবে তার থেকে দুঃখের আর [illegible] নাই—তা ছাড়া—আলোক আবার ভাবতে লাগলো—পৃথিবীর [illegible] রাজনৈতিক বুদ্ধিসম্পন্ন ইংরাজ কি সত্যি স্বাধীনতা দিল ভারতবর্ষকে? কে জানে! কালরূপী রুদ্র এর সত্যতা প্রমাণ করবেন। প্রমাণ করবেন মানুষের জীবনরূপ মহাকাল···!

—বাবুজি···নওকিশোর ডাক দিল। রাস্তায় নাচানাচি করে এসেছে!

—এসো কিশোর; কোথায় গিয়েছিল ভাই?

—রাস্তামে বহুৎ ঘুরলো, চিল্লাচিল্লি করলো—বহুৎ আনন্দ্ ভি হোল বাবুজি।

—বেশ—এবার শোও একটু!

—নেহি বাবুজি, একঠো বাত হ্যায়। নওকিশোর বসলো ওর কাছে। বলল—শুনিয়ে বাবুজি—একঠো সাধুবাবাকো দেখলাম। ওহি পাতিয়া-পুকুরমে যো বুঢ়্ঢা বড়গাছঠো হ্যায় না—উসিকো নীচু মে বৈঠা রহা। বহুৎ বড়া সাধু আছে; লেকিন, একঠো চিজ ওস্‌কো পাশ মেই দেখে হেঁ!

—কি চিজ? আলোকের প্রশ্নে আগ্রহ নেই কিছু!

—একঠো—শুনিয়ে বাবুজি—কিশোর ওর কাণের কাছে মুখ আনলো।

—বলো—! আলোক বিরক্ত না হলেও ভালবোধ করছে না!

—একঠো যন্তর! কিশোর বলল,

—কিসের যন্তর? —কঠিন স্বরেই শুধুলো আলোক এবার।

—ওহি, জিস্‌মে বাত কহা যাতা হায়—রেডিও যন্তর!

—তাতে কি হয়েছে? সাধুজি হয়তো গান ভালবাসেন—মধ্যে মধ্যে শোনেন! —যাও, শোও গিয়ে কিশোর!

—আরে নেহি বাবুজি—গাওনা নেহি—ওহি যন্তরসে বাত্ কহতা রহা, ঔর বাত ভি বহুৎ খারাব্ বাৎ—উ কহাতা রহা, যো এহি স্বরাজ কুছ নেহি—ইস্‌কো কাহেবাস্তে লিয়া হুয়া—এহি স্বরাজ একদম্ ঝুঠ—আনন্দ্ মত্ করো ভাই লোক—ই সব বাত!

আলোক ঠিক বুঝতে পারলো না কে এই সাধু এবং কি তার বক্তব্য। কিশোরের কাছ থেকে শুনে কিছু বোঝাও সম্ভব নয়; আর এই ভোর রাত্রে পাতিপুকুর গিয়ে সাধুকে দেখে আসাও সম্ভব নয় তার পক্ষে। তা ছাড়া, দেখতে গেলেই সাধুজি যে দেখাবেন, এমনও মনে হচ্ছে না। সারা ভারত আজ আনন্দ করছে—তার সঙ্গে সারা পৃথিবী। প্রত্যেক দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষিরা বাণী পাঠিয়েছেন আনন্দের—তার মাঝে কোথায় কোন্ সাধু এটাকে ঝুটা স্বরাজ বলে চেলাদের উপদেশ দিচ্ছেন আনন্দ না করতে, কি তাতে এসে যাবে লোকের? স্বরাজ এসেছে—ঝুটাও যদি হয়, তবু এসেছে স্বরাজ। এই আগমনকে কোনোরকম অকল্যাণের চিন্তায় পীড়িত হতে দেওয়া হবে না। যেই হোক সেই সাধু—তার কথা আজ শোনা অনাবশ্যক! আলোক চোখ বুজলো ভাল করে।

—বাবুজি···!

সাড়া দিলে কিশোর আরও বিরক্ত করবে, তাই আলোক চুপ করে পড়ে রইল। কিশোর আবার ডাকলো, তারপর বললো—ঘুম গিয়া··· দুঃখিত হয়ে উঠে চলে গেল কিশোর, কিন্তু শুলো না। কোথায় বেরিয়ে গেল আবার। কোথায় ও যায়—কি করে—কারই বা জানা থাকে? ও জীবন মুক্ত জীবনরুদ্র—কোথাও বাধা বন্ধন নেই—না শ্মশানে, না-বা সমাজে!

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছে আলোক—হঠাৎ শঙ্খধ্বনি, সঙ্গীত—সারা পৃথিবী জেগেছে, জেগেছে সারা ভারত—স্বাধীনতার উৎসব চলছে আবার উষার আনন্দালোকে। অরুণরাগে রঞ্জিত হয়ে গেছে আকাশ—, সুন্দরি ধরণী! আলোক উঠে বসলো।

সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো মেয়েগুলি সমস্বরে গান গেয়ে যাচ্ছে,

"জনগণ-মন-অধিনায়ক জয় হে"

ওদের প্রত্যেকের পরণে একই রকম শাড়ী ব্লাউস্—কেশবিন্যাসও একই রকম—শুধু বয়সে আর চেহারায় যা-কিছু পার্থক্য। অনেক বড়লোকের মেয়েও আছে ওদের মধ্যে। কিন্তু সকলেই ওরা গৃহবঞ্চিতা, পরিত্যক্তা। সমাজ-জীবনের নিদারুণ অপমান-কলঙ্ক মাথায় নিয়ে ওরা এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে—কেউ ষোল, কেউ আঠারো, কেউ বা বিশ ছেরের। দু একটি বিশ থেকে পঁচিশের মধ্যে—তারা আছে সারির পিছনে।

গান চলছে—তার সঙ্গে চলছে ধীরে ধীরে পদক্ষেপ—সামনের দিকে। কাথায় যেন ওরা যাত্রা করেছে—ওরা অভিযাত্রিক! সবার আগে যে মেয়েটি রয়েছে—দীর্ঘাঙ্গী হলেও মাথায় সে আর সকলের ছোট—বয়স ষোলর বেশী নয়···নাম রেবতী।

ও জন্মেছিল রাজঐশ্বর্য্যের মধ্যে, এক ভদ্রবংশের কনিষ্ঠা কন্যারূপে। তারপর এক পশুশক্তি ওকে অপহরণ করে—উদ্ধার করে রাজশক্তি নয়—দেশেরই সমবেত শক্তির ক্ষুদ্র একটি অংশ। তারপর হয় এখানে ওর আশ্রয়। রেবতী পিতৃগৃহে ফিরবার জন্য বিস্তর কান্নাকাটি করেছিল, কিন্তু সে-গৃহদ্বার রুদ্ধ হয়ে গেছে ওর কাছে। ওর উদ্ধারকারী হনুমান সিং শেষে আলোকের কাছে ওকে এনে বলেছিল,

—আপ্ কুছ বন্দোবস্ত্ কিজিয়ে বাবুজি—মেই সেকতা নেহি।

সেই থেকে ও এখানে আছে! এই আশ্রমের পরিচালিকা উৎপলা ওকে স্নেহের চোখে তো দেখেই, উপরন্তু ওর অসামান্য রূপ-ঐশ্বর্য্যের জন্য ওকে সে সর্ব্বাগ্রে স্থাপন করে বাইরের সবকিছু কাজে। রেবতী এরই মধ্যে বেশ ভাল করে জেনেছে—রূপ তার অপরূপ এবং সে ঐ রূপের জন্যই বিশেষভাবে আদৃত এখানে। কিন্তু এটা অভাগী মেয়েদের আশ্রম, এখানে রূপের আদর কেন এতো! ভাবলে বিস্মিত হতে হয়, তবু এটা সত্য। উৎপলা ওকে ঐ জন্যই আদর করে বেশী! কিন্তু হয়তো এটা সত্যি নয়—উৎপলার ওকে আদর করার অন্য কারণও থাকতে পারে। আলোক কিন্তু ভাবে মাঝে মাঝে।

উৎপলা আজ এখনো এসে পৌছায় নি, তবু আশ্রমের এখানকার পরিচালিকা কৃষ্ণা দেবী ওকেই প্রথমে দাঁড় করিয়ে শোভাযাত্রা পরিচালনা করছেন। কৃষ্ণা দেবী উৎপলার দক্ষিণ হস্ত, অনেকদিন আছেন এখানে! কুমারী তিনি—বয়স তেইশ বছর মাত্র। রূপের ঐশ্বর্য্য তাঁর কিছু কম নাই, কিন্তু যে-রূপ মানুষের মনকে মাতাল করে, কৃষ্ণা দেবীর রূপ তা নয়। স্নিগ্ধ সুকুমার সুষমাময় সে রূপ! রেবতী যেন চোখ-ঝলসানো বিদ্যুৎ!

—চলো—এগিয়ে চলো—কৃষ্ণা আদেশ দিল।

ওরা চলেছে—রাজপথে নামলো—চলতে লাগলো ধীর পদক্ষেপে। আলোকনাথ নিজের ঘরটায় বসে দেখছিল। এ ঘর বাইরের দিকে, অফিসঘর সংলগ্ন। আলোক এখন এখানকার পুরুষ সেক্রেটারী। ওর বাংলা নাম হয়েছে 'কর্ম্মসচিব'। আলোক বেশ কাজ চালিয়ে যাচ্ছে!

প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশটি মেয়ে চলে গেল ওর সম্মুখ দিয়ে—সঙ্গে কৃষ্ণা। ওরা যাচ্ছে উৎপলারই বাড়ীর দিকে। ধনবতী উৎপলা নিজস্ব বাড়ী খরিদ করেছে এই বছরখানেক হোল। বাড়ীটা বরাহনগরে; এখান থেকে প্রায় মাইল খানেক। বাড়ীর গেটেই মার্ব্বেল-ফলকে লেখা আছে, —কুমারী উৎপলাদেবী।

ওরা যাবে সেই কুমারী উৎপলার বাড়ীতে। সেখানে হবে আবার পতাকা-উত্তোলন। স্বাধীনতার পতাকা!

পতাকাটি অশোক-চক্রে চিহ্নিত হয়েছে, ত্রিবর্ণ রঞ্জিত তো আছেই। প্রত্যেক মেয়ের হাতে একটি করে পতাকা—রেবতীরটা বড় খুব। কিন্তু সারা সহরের সহস্র প্রাসাদশীর্ষে উড়ছে পতাকা আজ—আরো উড়বে লক্ষ লক্ষ। ঐযে মোড়ের মাথায় বিক্রী হচ্ছে পতাকা—অসংখ্য!! পরবার জন্য কাপড় পাওয়া যায় না—মানুষ উলঙ্গ নাহোক, অর্দ্ধোলঙ্গ। পরবার কাপড়গুলোই সব পতাকা হয়ে গেছে নাকি! আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু ওগুলো প্যারাসুটের সিল্কের তৈরী পতাকা; অধিকাংশই বিশুদ্ধ প্যারাসুট-বস্ত্র! এই লক্ষ লক্ষ পতাকা তৈরী করিয়েছে কে? নিশ্চয় ধনী মহাজনগণ; যাঁরা বহু অর্থ নিয়োগ করতে পারেন এই ব্যবসায়ে। দেড় ফুট লম্বা, এক ফুট চওড়া পতাকার দাম পাঁচ টাকার কম নয় আজ—কিন্তু কিনছে লক্ষ লোক! স্বাধীনতার মহামহোৎসব! আজ সত্যই আনন্দের দিন!

আলোক দীর্ঘশ্বাস ফেললো। হাতের কলমটা দোয়াতে চুবিয়ে ভাবছে; কি যেন লিখবে—এসে ঢুকলো একটি নারী,—তরুণী!

—নমস্কার !

—নমস্কার, বসুন—আলোক আহ্বান জানালো ! আপনার কি প্রয়োজন ?

—আপনিই কি সেক্রেটারী ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ ! আলোক উত্তর দিল !

তরুণী আর একবার ভালো করে দেখলো আলোকনাথকে।

—আলোকদা !···কণ্ঠে ওর অপূর্ব্ব বিস্ময় !

—অবন্তী !···আলোকের বিস্ময় ততোধিক !

প্রায় মিনিট খানেক কেউ কথাই বলতে পারলো না। অবন্তীকে দীর্ঘকাল পরে দেখছে আলোক—কৃশাঙ্গী, ক্ষীণদেহা, কিন্তু সুন্দরী আরো ! সীমন্তে ওর সিন্দুররেখা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন, তবু মনে হয়, বিবাহিতা হয়েছে অবন্তী। আলোক বললো,

—কেমন আছ অবন্তী ? তোমার মা ? বাবা ?

—তাঁরা ভাল আছেন আলোকদা—আমিও—ভালই··· ।

—কিন্তু তোমার কথার সুর ভাল ঠেকছে না অবন্তী ; কিছু কি অমঙ্গল হয়েছে ?

—আমার স্বামী—তুমি চেন তাকে, আমাদের গ্রামের সেই সিধুদা, তারই সঙ্গে বি—য়ে হয়েছে আমার। বিয়ের কিছুদিন পর থেকে আর দেখা হয় নি ; সে নিরুদ্দেশ ছিল—হঠাৎ কাল···

—কি হোল কাল... ?

আলোকের উদ্‌গ্রীব প্রশ্ন ; অবন্তী ধীরে ধীরে বললো,

—কাল নাকি পাতিপুকুরের বুড়ো বটগাছের তলায় কোন সাধু এসেছিল—তার নাকের উপর আঁচিল,—

—সেই কি সিদ্ধেশ্বর ? নাকের উপর আঁচিল আছে নাকি তার ?

—না—যখন সাধু হয়ে কোথাও বসে তখন মেক্-আপ্ করে আঁচিল দিয়ে ; আমার মনে হচ্ছে, ও সেই-ই !

—তুমি গিয়ে দেখে এলেই পার ?

—গিয়েছিলাম—নেই ওখানে। কয়েকজন লোক বলল, এই আশ্রমেরই একটা ছেলের সঙ্গে সে কোথায় গেছে ভোর রাত্রে ! তুমি কিছু খবর জানো আলোকদা—?

—না অবন্তী—বলেই কিন্তু আলোকের মনে পড়ে গেল গত রাত্রের নওকিশোরের কথাটা। বললো—খবর ঠিক জানি না, তবে যে ছেলেটার কথা শুনেছো, সে আশ্রমে না থাকলেও এখানে আসে। সে ফিরলেই আমি খবর নেব ! তুমি ভেবনা !

—আলোকদা—অবন্তী আস্তে ডাকলো—বহু দুঃখের মধ্যে সিধুকে বিয়ে করতে হয়েছে—কিন্তু ঐ বিয়ে পর্য্যন্তই। ঠিক এক বছর পরে সে একদিনের জন্য দেখা করেছিল, কিন্তু সে বড় করুণ ইতিহাস !

জিজ্ঞাসু নেত্রে আলোক চেয়ে রয়েছে অবন্তীর পানে। অবন্তী বললো,

—সে আমাকে যেমন চেয়েছিল, আমি তা হতে পারিনি আলোকদা।

—ঠিক বুঝলাম না অবন্তী !

—অনেক কথা বলতে হবে ; বড় লজ্জার কথা আলোকদা—বড় দুর্ভাগ্যের কথা আমার। তবু তোমাকে বলতে হয়তো পারবো আমি ! কিন্তু এখানে নয়—আমার বাড়ীতে এসো একদিন !

—কোথায় তুমি থাকু অবন্তী ?

—বালীগঞ্জে ! বাবা আমায় বাড়ী কিনে দিয়েছেন। গাড়ীও একটা দিয়েছেন, দিতে পারেন নি গৃহজীবন ; কিন্তু তার জন্য বাবা দায়ী নন !

—তুমি নিজে সিধুকে ভালবেসে বিয়ে করেছ অবন্তী ?

—না—তুমি যে-সিধুকে চেন, আমি তাকে বিয়ে করিনি—আমি এক উদার মহান সর্ব্বস্বত্যাগী সন্ন্যাসী সিধুকে বিয়ে করেছি!

—অর্থাৎ তুমি বলতে চাও, সিধু পরিবর্ত্তিত হয়েছে?

—হ্যাঁ—সে পরিবর্ত্তন শুধু আশ্চর্য্য নয়, অসম্ভব! কিন্তু সে-কথা এমন করে বলা যাবে না আলোকদা—বাড়ীতে এস আমার!

—ঠিকানা রেখে যাও, সময় হলেই যাব—আর তোমার ফোন্ আছে?

—না—ফোন্ এখন পাওয়া কঠিন। তুমি কালই এসো আলোকদা।

—যাব!—আলোক কথা দিয়ে ফেললো!

নিতান্ত ছোট বয়সের একটা ছেলে হাসতে হাসতে আসছে,

—"ঝান্দা উঁচা লহে হামালা"

গান গাইছে ছেলেটা—হাতে ছোট্ট পতাকা একটি।

—বেশ ছেলেটি তো? কার ছেলে আলোকদা, তোমার?

অবন্তী হাত বাড়িয়ে কোলে তুললো ওকে। আলোক বললো,

—না—এখানে অপর্ণা নামে একটি মেয়ে থাকে, তারই ছেলে!

—নাম কি? এই খোকা, নাম কি তোমার?

—জীব্ অন—লু—দ্—ল—হাসছে ছেলেটা। সুন্দর দেখতে! ভারী সুন্দর!

—কি বলছে আলোকদা? বুঝতে পারছি না!

—জীবন। ওর নাম জীবনরুদ্র

—ওরে বাবা—রুদ্র! অবন্তী হাসলো একটু—বললো,—এ নাম নিশ্চয় তোমার রাখা—নয় আলোকদা?

—তুমি দেখছি কিঞ্চিৎ চেন আমাকে—আলোক হাসলো।

—কিঞ্চিৎ নয়, অনেকখানি—হয়তো তোমার মা'র পরেই তোমাকে চিনি আমি! মা কেমন আছেন আলোকদা?

—নেই !—আলোকের কণ্ঠ সজল হচ্ছে না, স্বাভাবিকই আছে।

—নেই !—অবন্তীর কণ্ঠই সজল হয়ে উঠলো—কত দিন গেছেন ?

—অনেকদিন—প্রায় চার বছর। জেল থেকে ফিরে দেখা হয় নি !

—তারপর এই চাকরীতে ঢুকেছো ? অবন্তী প্রশ্ন করলো।

—না—তারপর বহু বিচিত্র ঘটনা ঘটেছে !

—তুমি আমার ওখানে গেলে শুনবো সব !

আলোক ওকথার কোনো জবাব না দিয়ে বললো,

—সিধু সন্ন্যাসী হয়ে ঘোরে কেন অবন্তী ? ফেরারী নাকি ?

—এক রকম তাই ! বিপ্লব-আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। হিংসার মন্ত্রে ওদের দীক্ষা—সারা ভারতব্যাপী ওদের দল !

—তার তো আর কিছু প্রয়োজন লাগবে না। দেশ স্বাধীন হয়ে গেল। আলোক বলল—কিন্তু বলেই আবার বলল,

—অবশ্য এ স্বাধীনতা কতখানি স্বাধীনতা, তা আমার জানা নেই !

—থাক গে ভাই, আজ তো খুব উৎসব চলবে। কে জানে মানুষের অন্ন-বস্ত্র-আশ্রয় জুটবে কিনা ! নেতারা তো বলছেন—কৃষক-প্রজা-মজুর-রাজ তাঁরা স্থাপন করবেন অনতিবিলম্বে। তোমার কি মনে হয় আলোকদা ?

আলোক হাসলো, বললো—থাক অবন্তী, ওসব কথা এখন আলোচনা না করাই ভাল ! তোমার ঠিকানাটা বলো তো !

ঠিকানা বলে, জীবনকে কোল থেকে নামালো অবন্তী।

নাম ঠিকানা লিখে নিল আলোক—অবন্তী ওর মুখপানে চেয়ে রয়েছে। আলোক অত্যন্ত অন্যমনস্ক; এটা অবশ্য ওর প্রকৃতিগত, কিন্তু এখন যেন কিছু ভাবছে আলোকনাথ—গভীর কোনো কিছু; হঠাৎ অবন্তীকে বলল,

—সিধুর সঙ্গে তোমার বিয়ে হোল ? আশ্চর্য্য লাগছে !

—তার থেকেও আশ্চর্য্য আছে আলোকদা!—অবন্তীর মুখে করুণ হাসির অনুলেপন।

—আছে! কি সেটা অবন্তী?—আলোক অতি বিস্ময়ে তাকালো!

—তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে না হওয়া—অবন্তীর মুখখানা উদাস!

আলোক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইলো অবন্তীর পানে—অবন্তী জানালা-পথে বাইরের পতাকা দেখছে। ওর চোখদুটোতে অশ্রু না অগ্নি? বললো,

—বিধাতাপুরুষ খুব রসিক আছেন আলোকদা—অবন্তীর কণ্ঠস্বর কাঁপছে না,—এর সঙ্গে ওকে আর ওর সঙ্গে তাকে জুটিয়ে বেশ মজা দেখেন—তিনি লোক ভালো!

হাসলো অবন্তী অল্প, কিন্তু আলোক কিছুমাত্র সাড়া দিল না, নীরবে সে ভাবছে, অবন্তীর ওকথা বলার তাৎপর্য্যটা কি? কোথায় তার অন্তর ব্যথিত এবং কেন? তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী অবন্তী বুঝলো আলোকের চিন্তাধারা। বলল,

—Marriages are made in Heaven—না আলোকদা? আচ্ছা আলোকদা, তুমি তো অনেক পড়াশুনো করেছ—বলোতো, একটি আত্মাকে ভাগ করেই নাকি স্বামী-স্ত্রী তৈরী করা হয়েছে?

—আমাদের শাস্ত্র সেই কথাই বলে—স ইমেবাত্মানং দ্বেধা প্যাতয়ৎ, ততঃ পতিশ্চ পত্নীচাভবতাম্—উপনিষদ বলেছেন এই কথা—আলোক উত্তর দিল।

—তা হ'লে—অবন্তী হাসলো ক্ষীণ হাসি—যার সঙ্গে যে নয়, তার সঙ্গে কেন যুক্ত হ'তে হয় তাকে? এমনটা কেন হয় আলোকদা?

—ও তত্ত্ব বড় গভীর অবন্তী—অত সহজে বোঝা যায় না—কে বলতে পারে যে স্নিগ্ধর আত্মার সঙ্গে তোমার আত্মা এক কি না? হয়তো ঠিকই হয়েছে!

—কিন্তু আলোকদা—অবন্তী কি যেন বলতে চাইছে, বলতে পারছেনা।

—হ্যাঁ—এরকম হয়, আত্মা দ্বিধা বিভক্ত হলেও প্রত্যেক অংশে কিছু কর্মস্বাধীনতা থাকে; তার প্রভাবে ব্যক্তি, নর বা নারী, আপন আপন সুকৃতি বা দুষ্কৃতির ফল পায়—কাজেই দুই বিভক্ত অংশের পুনর্মিলন হতে দেরী হয়ে পড়ে!

—কিন্তু মাঝে যে-সব মানুষ আসে—যেমন ধরু তোমার সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা!

অবন্তী এবার সাহস করে সোজা প্রশ্নটাই করে বসলো। মনের মধ্যে যে জিজ্ঞাসা ওর গুমরাচ্ছিল, এতক্ষণে রূপ পেল সে ভাষায়। আলোক বলল,

—ওকে বলে প্রীতি! বৈষ্ণব শাস্ত্রে প্রীতি তিন রকমে হয়, নৈসর্গিক, সাঙ্গিক আর গুণগত! এর মধ্যে নৈসর্গিক প্রীতিই শ্রেষ্ঠ; যার সঙ্গে যার আত্মার মিল, তারই সঙ্গে অন্তরের যোগ থেকে যায় বরাবর—শেষে মিলন হয়।

অবন্তী আনন্দিত হচ্ছে! আলোকের সঙ্গে তার অন্তরের যোগ আজো ক্ষুণ্ণ হয় নি—এইটাই নৈসর্গিক—খুসী হয়ে আবার শুধুলো,

—আর অন্য রকম প্রীতি কি ভাবে হয়?

—গুণগত প্রীতি হয় গুণ বা রূপের কথা শুনে, চোখে না দেখলেও হয়, যেমন হয়েছিল দময়ন্তীর—নলের রূপগুণ শুনেই তিনি প্রীতিপরায়ণা হয়েছিলেন।

—আর সাঙ্গিক? অবন্তীর চোখের তারায় হাসির ঝিলিক।

—দীর্ঘ দিন একসঙ্গে খেলাধুলো, আলাপ-আলোচনা, একত্র বাস, একসঙ্গে অধ্যয়ন, একরকম বিপদের মধ্যে বা আনন্দের মধ্যে দিন যাপন

ইত্যাদি দ্বারা সাঙ্গিক প্রীতি জন্মায়—এ প্রীতি স্থায়ী না হতেও পারে, 'আউট্ অব সাইট্ আউট অব্ মাইণ্ড্' হওয়াও বিচিত্র নয় ; সাঙ্গিক প্রীতি খুব নীচু স্তরের !

—তোমার সঙ্গে আমার প্রীতিটা তাহলে কোন স্তরের আলোকদা ? হাসছে অবন্তী। ওর নিশ্চয় ধারণা, আলোক বলবে, ওটা নৈসর্গিক। কিন্তু আলোক বলল,

—ওটা সাঙ্গিক ! ছোট বেলায় এক সঙ্গে খেলাধূলো করার ফলে জন্মেছিল !

—আলোকদা !—অবন্তী যেন অতি দূর থেকে আর্ত্তিক্ষীণ আহ্বান জানালো।

আলোক সামনে চেয়ে দেখলো অবন্তীর পানে ; প্রেমের দার্শনিক তত্ত্ব শোনাতে গিয়ে কোথায় এমন নির্ম্মম আঘাত করলো সে অবন্তীকে ! আশ্চর্য্য !

—আলোকদা, তুমি আমার আত্মাকে আজ হত্যা করলে !—অবন্তীর কণ্ঠস্বর অসীম আর্ত্ততায় কাঁপছে—উঠে দাঁড়িয়ে পড়লো অবন্তী,—বলতে লাগলো,

—আমি বেঁচেছিলাম আলোকদা, জীবনের অপরিসীম গ্লানির পঙ্কেও আমি বেঁচেছিলাম ; আমার প্রাণশক্তি কতো বেশি, তুমি জানো না ;—এক মুহূর্ত্ত থামলো অবন্তী,তারপর বলে চললো,

—সাদা মানুষের শয়তানি আমার প্রাণকে হত্যা করতে পারে নি ; সমাজের রুদ্র কশার আঘাত আমি সিধুকে আশ্রয় করে এড়িয়েছি—কিন্তু, কিন্তু আলোকদা, তোমার সঙ্গে আমার প্রীতিটা শুধু সাঙ্গিক ! শুধু তোমার সঙ্গলাভের ফলেই জন্মেছিল ! আমার আত্মাটাকে আজ কোথায় আমি আশ্রয় দেব আলোকদা ? ···অবন্তী বসে পড়লো।

আলোক ঠিক বুঝতে পারছে না, অবন্তীর অন্তর কোথায়, কেন রক্তাক্ত হয়ে উঠছে! আলোক চিরদিনই ধীর—উচ্ছ্বাস তার হৃদয়কে কদাচিৎ মোহগ্রস্থ করে।

—আমি প্রীতির দার্শনিক তত্ত্ব বোঝাচ্ছিলাম অবন্তী—আলোক আস্তে বললো।

—হ্যাঁ, আর বলছিলে যে ঐ তত্ত্বে তুমি বিশ্বাস করো,—আমার সঙ্গে তোমার প্রীতি শুধু সাঙ্গিক—আলোকদা, মানুষ এমন সহজ কথায় এমন কঠিন সত্য বলতে পারে!—অবন্তীর দুচোখে দুটি মুক্তাবিন্দু!

—পারে; পারা উচিৎ—দৃঢ়' স্বরে বললো আলোক—সত্যের স্বর মেঘমন্দ্রবৎ, বজ্রগম্ভীর হওয়াই দরকার—সত্যের প্রকাশ সূর্য্যালোকের মত; রুদ্র অথচ জীবনদাতৃ—সহজ অথচ সতেজ,—লোকোত্তর আবার লোকায়ত্ত! সত্যকেই অতি সহজে প্রকাশ করা যায় অবন্তী—মিথ্যার জন্যই দরকার হয় বহু কথার, বহু বিতর্কের!

কিন্তু অবন্তীর দুই গণ্ড বেয়ে ধারা নেমেছে, মাথাটা টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ছে ওর। আলোক অবাক হতে গিয়েও অবুঝ হোল না—, বললো,—আমার সঙ্গে তোমার প্রীতিকে অস্বীকার করিনে অবন্তী, কিন্তু তাকে 'সাঙ্গিক' বলায় কেন তুমি এতো বিচলিত হচ্ছো?

—আলোকদা—আমি তোমার দার্শনিক প্রীতি বুঝিনে, কিন্তু—অবন্তী ঘাড় সোজা করেই বলল—কিন্তু মানুষের অন্তর বা আত্মা যেখানে আশ্রিত থাকে, অকস্মাৎ সে যদি সেখান থেকে চ্যুত হয়, তাহলে তাকে কোন্ মহাশূন্যে ঝুল্‌তে হবে,—তুমি জানো না! তুমি পণ্ডিত, তুমি কুশাগ্রবুদ্ধি দার্শনিক—কিন্তু তুমি আকাশের তারার খবর জানো, মাটির পাত্‌কো'র খবর রাখ না!—অবন্তী উঠে দাড়ালো, আবার বললো, —যাই আলোক দা, আমার জীবনের সব দুর্ভাগ্যকেই আমি অনায়াসে

মেনে নিতে পেরেছিলাম, কিন্তু আজ সেই মহাশক্তিময়ী অবন্তীর আত্মার মৃত্যু হোল—যাই, প্রণাম !

অবন্তী মাথাটা নামিয়েই আবার খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে চলে যাচ্ছে, দুই চোখে অশ্রুবিন্দু—আলোক দেখলো, ধীরে বললো—চিরায়ুষ্মতী হও !

—না—অবন্তী যেন রুখে দাঁড়ালো—কোনো আশীর্ব্বাদই চাইনে আমি আর ! তুমি আলোক—কিন্তু জানো আলোকদা, অনেক জীব অন্ধকারে থাকতেই পছন্দ করে ! আমি অন্ধকারেই থাকবো—আশীর্ব্বাদের আলোর দরকার নেই।

অবন্তী বেরিয়ে যাচ্ছে ঘরের বাইরে—টলছে অবন্তীর পা দু'খানা !

—থামুন একটু— !

পাশের ঘর থেকে একটি লাবণ্যবতী নারী এসে হাতখানা ধরলো অবন্তীর। অবন্তী আচমকে থেমে গেল, দেখলো মেয়েটিকে। বয়স পঁচিশ কি ত্রিশ, কিন্তু প্রগাঢ় যৌবনা, অনবদ্যাঙ্গী—আয়ত-নেত্রা !

—পাশের ঘরে আমি অনেকক্ষণ এসেছি—ইচ্ছা না থাকলেও কথাগুলো শুনতে পেলাম—মাফ চাইছি তার জন্য ; একটা প্রশ্ন করতে পারি আপনাকে ?

অবন্তী অশ্রুসজল চোখ তুলে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো !

—অন্ধকারকে আশ্রয় করবার ইচ্ছার মূলে আপনার কি আছে, আত্মবিলোপ করবার অভিমান, নাকি আত্ম-উন্নয়নের সঙ্কল্প ?

অবন্তী চুপ করে রইল, যেন কথাটা ঠিক মত বুঝতে পারছে না !

—কেঁচো-কৃমিরা অন্ধকারকে আশ্রয় করে নিরুপায় হয়ে—কিন্তু যোগীরা অন্ধকারকে আশ্রয় করেন সত্য-সূর্য্যকে লাভ করবার জন্য—আপনি কোন্‌টা করতে চান ?

—আমি ঐ কেঁচো-কৃমির দলেই—বলে অবন্তী এগুতে চেষ্টা করছে !

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

—তাহলে নিরুপায় হয়ে ?

—হ্যাঁ—সত্যসূর্য্য এতো দীপ্তিমান যে, আমি সইতে পারলাম না।

—সত্যকে সইতেই হবে অবন্তী—আলোক ঘরের ভেতর চেয়ারে-বসা অবস্থাতেই বললো—সত্যের আলোতে নিজের আত্মাকে আবিষ্কার করতে হবে; কৃমিকীট সূর্য্য দেখতে পারে না, কিন্তু সৌরতাপ তাদের একান্ত প্রয়োজন!

—থামুন দার্শনিকপ্রবর—উৎপলা হেসে বললো আলোকের উদ্দেশে, মানুষের মনকে কেটে টুকরো টুকরো করে বিশ্লেষণ করবার জন্যই সৃষ্ট হয়েছে আপনাদের ঐ শাস্ত্র—কিন্তু মনে রাখবেন, ঐ শাস্ত্রটা মানুষেরই তৈরী!

—ঋষির—তাঁরা সত্যদ্রষ্টা!—আলোকের স্বর গভীর—গম্ভীর!

—কিন্তু আমরা ঋষিকন্যা নই, নিতান্তই মানবকন্যা—উৎপলা হাসলো, বললো,—সামাজিক প্রীতি স্বর্গীয় প্রেমে পরিণত হতে পারে কি না, সে বিষয়ে আপনার ঋষি কি বলেন?—অবন্তীর হাত ধরে আবার ঘরে আনলো তাকে উৎপলা।

—পারে, কিন্তু সে তপস্যা কঠিন, কঠোর শুধু নয়,—তার উপর থাকা চাই পিতার নৈসর্গিক আশীর্ব্বাদ! —আলোক উচ্চারণ করলো মন্ত্রের মত ধীরে ধীরে কথাগুলো!

—সে আশীর্ব্বাদ এর উপর আছে কি না, আপনার যখন জানা নাই, তখন অকারণ কেন ওকে আঘাত করছেন আলোকবাবু?

—আঘাত নয় দেবী, সূর্য্য উঠবেনই,—কে কোথায় সেই তেজে শুকিয়ে যাবে, সূর্য্যের তা দেখলে চলে না। সত্য—সত্যই; তার প্রকাশ অনস্বীকার্য্য!

—কিন্তু সত্যের সবটা আপনি জানেন না!—উৎপলার ঠোঁটে বিদ্রূপ!

আলোক চুপ করে রইল এবার! উৎপলাই বললো অবন্তীর চোখ মুছে দিতে দিতে—জীবনের সত্য কোথায়, তা কেউ জানে না বোনটি; কোনো ঋষিই সেটা—বলে যান নি—আত্মার কথা অসংখ্যবারই তাঁরা বলেছেন, কিন্তু জীবন—মানুষের ব্যক্তিগত আর বস্তুগত জীবন আত্মা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক না হয়েও আত্মা থেকে পৃথক; পৃথিবীর পথ, প্রকৃতির নিষ্ঠুরতা, মানুষের লোভ-দ্বেষ-হিংসা আত্মার ক্ষতি কত করে জানি না—কিন্তু জীবনের যে কত ক্ষতি করে, তা ভালই জানা আছে আমার! কিন্তু যাক্ সে কথা—উৎপলা আধ মিনিট থামলো,—তোমার পুরো পরিচয় কি জানতে পারি?

—ও আমার পাশের গ্রামের জমিদারের মেয়ে—আমার ছেলেবেলার খেলার সঙ্গী—আলোকই বললো—বহুদিন পরে ওর সঙ্গে আজ এখানে দেখা! ওর বিয়ে হয়েছে, হয়তো ছেলেমেয়েও হয়েছে—ওর স্বামীকে আমি চিনি, সে ঐ গ্রামেরই একটি ছেলে, নাম সিদ্ধেশ্বর—সে সন্ন্যাসী হয়ে কোথায় চলে গেছে—তারই খোঁজে ও এসেছিল আজ এখানে—তারপর…

—তারপর—? উৎপলা প্রশ্ন করলো কঠিন কণ্ঠে!

—তারপর যে কথা হোল, আশা করি আপনি শুনেছেন। ও যাকে বিয়ে করেছে, সে যেমনি হোক, আজ সে-ই ওর স্বামী; ওর নিষ্ঠাহীনতা আমায় ব্যথিত করেছে উৎপলা দেবী!

—বিয়ে আমার তার সঙ্গে ঠিক নিয়মমত হয় নি আলোকদা। মন্ত্রপাঠ তো নয়ই; আমার সঙ্গে তার……অবন্তী আর বলতে পারলো না, কেঁদে ফেললো।

—তোমাকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল সে?

—না—আমিই নিরুপায় হয়ে তাঁকে আমার স্বামী বলে পরিচয় দিয়েছিলাম।

—তার পত্নীত্ব তুমি নিশ্চয়ই গ্রহণ করেছ ?

—না ! সেও আমার স্বামীত্ব কোনোদিন কথার স্বীকৃতির অধিক গ্রহণ করে নি।

—কথাই মন্ত্র অবন্তী—ওকে অস্বীকার করাই নিষ্ঠাহীনতা ! আলোকের কণ্ঠ উচ্চ ! হয়তো কিঞ্চিৎ রূঢ়।

—হবে,—কিন্তু আলোকদা, কথার তলায় অন্তঃসলিলা থাকে অন্তর-লক্ষ্মী !

—তা'হলে সিধুকে খুঁজতে এলে কেন ?—আলোক যেন অগ্নির কশা হানছে অবন্তীকে।

—ওর মাহাত্ম্য আমি স্বীকার করি আলোকদা, কিন্তু মাহাত্ম্য স্বীকার করার শ্রদ্ধার মধ্যে ভালোবাসার রক্তিমাভা কি মেলে সব সময়ই ! ওকেই কি তোমার শাস্ত্রে গুণজ প্রীতি বলে না ? কিন্তু থাক্ আলোকদা, তোমাকে আর বিরক্ত করবো না। যাই !

—থামো—উৎপলা বললো—তোমার ঠিকানা রেখেছো তো ? বেশ ! আমি গিয়ে সব শুনে আসবো একদিন। কিন্তু তুমি এত অধীর হোচ্চ কেন অবন্তী ?

—ভেবেছিলাম—বিশ্বে যেখানে যত প্রলয়ই ঘটুক না কেন, আমার স্বর্গ ঠিকই আছে। একদিন না একদিন, হয়তো শতজন্ম পরেও আমি সেই স্বর্গে পাবো আশ্রয়—আজ জানলাম, আমার স্বর্গ ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে—আমি নিরবলম্ব।

অবন্তীর চোখের জল উৎসের মত গড়িয়ে পড়ছে, আলোক দেখলো, বলল,

—তোমার স্বর্গ যদি সত্যিই তোমার হয় অবন্তী, তাহলে ভয় নাই ; বিশ্বের কিছুই ধ্বংস হয় না—কিন্তু একটা কথা বলবো ? খুব শক্ত কথা !

—বলো—তোমার যে-কোন আঘাত সইবার জন্য প্রস্তুত আমি!

—হয়তো প্রস্তুত, হয়তো নও, তবু যথাসাধ্য কোমল করেই বলছি—জীবনকে আর আত্মাকে আমি ঠিক বাক্য এবং তার অর্থের মতই যুক্ত দেখতে অভ্যস্থ। তোমার আত্মা যদি বাক্য হয় তাহলে তার অর্থ হবে তোমার জীবনটুকু! জিজ্ঞাসা করতে পারি কি অবন্তী, তোমার সেই জীবনকে তুমি কতখানি সৎ এবং সুন্দর করতে চেষ্টা করেছ? তোমার স্বর্গকে যদি তুমি চেন অবন্তী, তাহলে যত দুর্যোগ, যত দুর্বিপাকই আসুক, সেখানে পৌঁছুতে তোমার আটকাবে না, কিন্তু তোমার জীবনের গতি থাকা চাই, থাকা চাই দীপ্তি এবং ব্যাপ্তিও। অন্ধকারের আশ্রয় দীপ্তি-হীনতার আশ্রয়, গতিহীনতার আশ্রয়—ব্যাপ্তিহীনতার আশ্রয়।

অবন্তী চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, কোনো কথাই ও বলতে পারছে না। উৎপলাও যেন এই বাক্যস্রোতে মুহ্যমান হয়ে পড়েছে—তবু বললো,

—ওকে দীপ্তি, গতি আর ব্যাপ্তি লাভ করতে আমাদের সাহায্য করতে হবে আলোকবাবু।

—জীবনকে আপনি সাহায্য করতে পারেন, আত্মাকে পারেন না; যেমন বাক্য বা শব্দ স্বতঃ বিকশিত, ব্রহ্মস্বরূপ—তার অর্থটাই মানুষ সৃষ্টি করেছে এত দীর্ঘদিন ধরে। কিন্তু এমন শব্দ বহু আছে, যার অর্থ মানুষ আজো জানে না! —আলোক একটু হাসলো, বললো—চোখ মোছ অবন্তী, আমি যাব তোমাকে দেখতে কাল—উৎপলা দেবীও হয়তো সঙ্গে যেতে পারেন।

—এটা কিন্তু সাত্ত্বিক প্রীতি—উৎপলা হাসলো।

—না—অবন্তী দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করলো যেন এতক্ষণে—সাত্ত্বিকপ্রীতি নয়—পরার্থপরতা মাত্র। ওতে প্রেমের রসমাধুর্য্য থাকে না, থাকে ত্যাগের অহমিকা—যাই আমি!

অবন্তী ধীরে চলে গেল।

সুন্দরবনেরই অংশ ছিল যায়গাটা এক সময়, এখন ওখানে বন প্রায় নেই, অরণ্য কেটে ইংরাজ বসতী বসিয়েছে কাছাকাছি ডায়মণ্ডহারবারে। রেল ষ্টেশন—জাহাজের জেটি আর সৈন্যদের ছাউনিতে জায়গাটা জনবহুল। কিন্তু ওখান থেকে আরো মাইলখানেক দূরে ঠিক গঙ্গার উপরেই একটা বিরাট বনস্পতি, প্রাচীন শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে দীর্ঘকাল দাঁড়িয়ে আছে। ওর কাছাকাছি একটা ভাঙা বাড়ী—কোন এক সময় নাকি জনৈক সাহেবের কুঠি ছিল ওটা; ওখানে নাকি বহু কৃষকের নির্য্যাতন, বহু নারীর ধর্ষণ, বহু ধনিকের বিলাস-ব্যসন অবাধে চলতো,—ঐ ভাঙা দেওয়ালগুলোই তার সাক্ষী, আর সাক্ষী এই বনস্পতি।

ঐ গাছটার তলায় এসে আড্ডা পেতেছেন এক সাধু-বাবা। দীর্ঘ জটাজুট, বর্ণ গৌর কি কৃষ্ণ বুঝবার উপায় নাই, সর্ব্বাঙ্গে ভস্মানুলেপন—তবে চোখ দুটো খুবই বড়, উজ্জ্বল—নাকটা বেশ উন্নত, নাকের ডগায় একটা আঁচিল। সামনে ধুনি, তার পাশে গাঁজার কল্কে—একটা ঝোলায় কয়েকটা সাধুজনোচিত দ্রব্য,—যথা, রুদ্রাক্ষ, কোশাকুশি, পদ্মবীজ মালা, পাথরের শালগ্রাম ইত্যাদি। উনি কোন পন্থী সাধু—ধরবার উপায় নাই—হয়তো সব পন্থাই আশ্রয় করেছেন।

ভোর হবার আগেই উনি এসে বসেছেন এখানে। লোকালয় থেকে কিঞ্চিৎ দূরে হলেও লোক সমাগম হ'তে দেরী হোল না। আজ আবার

১৫ই আগষ্ট, ভারতের স্বাধীনতা লাভের মহাগৌরবময় দিন। স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত সব ছুটি। মেয়েরা গঙ্গা স্নান করতে গিয়েই শুনে এলেন—বড় জবর সাধুবাবা এসেছেন—কেউ-কেউবা দেখেও এলেন। খবরটা প্রচারিত হতে হতেই সাধুজীর সম্মুখে, ধারে পাশে লোক জমায়েৎ হতে লাগলো, সাধুজী ধ্যান মগ্ন—বাহ্যজ্ঞানহীন! লোকেরা কেউ হাত দেখাবে, কেউ তাবিজ-কবচ চাইবে, কেউবা সন্তানলাভের জন্য বংশ-কবচ প্রস্তুত করাবে—কেউ মামলা-মোকদ্দমার বিষয় জেনে নেবে, কিন্তু এ কি রকম সাধু! বসে আছেতো বসেই আছে; ওর ধ্যানই আর শেষ হয় না! লোকগুলো বিরক্ত হয়ে অনেকে চলে যাচ্ছে—কিন্তু আরো দ্বিগুন চতুর্গুন লোক আসছে। ভারতবর্ষ অবতারবাদের দেশ—সাধুগিরি এখানে চমৎকার ব্যবসায়, কিন্তু ইনি যে-রকম কাঠ হয়ে বসে আছেন, তাতে বোঝা যায়, ব্যবসায় ইনি করেন না; তাহলে কি সত্যিই সাধু ইনি? ভক্তি বেড়ে গেল লোকগুলোর।

অনেকটা বেলা হ'য়ে গেছে, প্রায় দুপুর, ভারতের স্বাধীনতার বিজয়োৎসব চলেছে প্রাসাদে, পর্ণকুটীরে—পথে, প্রান্তরে; মানুষ মানুষকে আলিঙ্গন করে আজ ভ্রাতৃত্ববোধে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে যেন। এই কদিন আগের ভেদ-বিভেদ, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, হত্যার রক্তলীলা—সব ভুলে আজ ভারতবাসী উৎসবের আনন্দে মেতেছে। র‍্যাডক্লিফ সাহেবের রোয়েদাদ আজও বের হয় নি—কে জানে, পশ্চিম বাংলায় কতখানা আর পূর্ব্ব পাকিস্তানে কতখানা পড়বে বাংলার পলিমাটি—কিন্তু রোয়েদাদ যাই হোক—মানুষ আজ ভ্রাতৃত্বে সমুজ্জল!

অতখানা বেলা পর্য্যন্ত এখানে দাঁড়িয়ে থাকা খুবই কষ্টকর, তবু ওরা অনেকেই রয়েছে—অনেকে অবশ্য প্রণাম করে চলে গেল—কেউ কেউ দুধ, ফল, আম, আলোচাল, ঘি-ও দিয়ে গেল ধুনির কাছে

নামিয়ে। ধুনিটা নিবে গেছে অনেকক্ষণ—কারণ কেউ তাতে কাঠকুট দিচ্ছে না। কয়েক টুকরো কাঠ অবশ্য কাছেই পড়ে আছে, কিন্তু বিন অনুমতিতে কে ছুঁতে যাবে ঐ ধুনি! লোকগুলো সব ফিরে যাবে কিনা—ভাবছে, ঠিক সেই সময় একটা ছোকরা—সাধুজীর চ্যালা হয়তো, এসেই একবার সকলকে দেখে নিল—তারপর ট্যাঁক থেকে দেশলাই বের করে ধুনির আগুনটা জালতে আরম্ভ করলো।

—আপলোক্ হিঁয়া ক্যা করতা হ্যায়? চলা যাইয়ে—ভাগিয়ে। হিঁয়া তো কুছ কাম নেই—ধুনি জালতে জালতে ধমক দিল চেলাটা!

—সাধুবাবাকো ধেয়ান কব টুটেগা? জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো।

—আব্ দের হ্যায়! দেখতা নেই—সমাধিমে বৈঠা হুয়া!

সমাধি! আরে বাপ্। লোকগুলোর চোখ ভক্তিতে কপালে উঠছে! কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে থাকা অনর্থক, তবু ওরা প্রশ্ন করলো আবার,—ওবেলা এলে দেখতে পাব সাধুজীকে?

—হুঁ-হুঁ—উল্টিবেলা আ যাইয়ে। আব যাও সব, আনন্দ্‌মে রহো!

চ্যালা আশীর্ব্বাদ করে ওদের বিদায় করতে চাইছে। কিন্তু সহজে কি ওরা যেতে চায়? শেষে চ্যালাটি ধমকই দিতে লাগালো এক রকম ভাঙা হিন্দী ভাষায়। ওরা চলে গেল! অতঃপর মাটির সরায় উপহার দেওয়া দুধটুকু চ্যালা ধুনির আগুনে বসিয়ে দিল—ভালোকরে চেয়ে চেয়ে দেখলো, গাছটার ডালপালার মধ্যেও কেউ লুকিয়ে আছে কি না—পরে ডাকলো,

—জি, সাধুজি?

সাধুজীর সাড়া জাগলো না। একি ব্যাপার! চ্যালাটা আবার ডাকলো—সাধুবাবা! শুনিয়ে—ও সাধুবাবা?—না সাড়া পাওয়া যাচ্ছেনা। তাহলে এখন করবে কি চ্যালাটি? ভারী বিব্রত বোধ করছে ও। ধুনির আগুনে একটা বিড়ি ধরিয়ে টানতে লাগলো বসে বসে। যারা বহু

দূরে দাঁড়িয়েও দেখছিল সাধুজী কি করেন এর পর, তারাও দেখলো সাধুজী পাথরের মূর্ত্তির মতই বসে আছেন—সত্যকার সাধু সিদ্ধপুরুষ!

ঘণ্টা খানেক পরে চোখ খুললেন সাধু ধীরে ধীরে—সামনে কলনাদিনী গঙ্গা—কত যুগযুগান্ত ধরে ভারতের সাংস্কৃতিক মহিমা বহন করে আসছেন; কত আনন্দ-বেদনার স্মৃতি ওঁর বুকে—কত উদয়-প্রভাত আর অস্তগোধূলি উনি দেখেছেন এই ভারতের স্বাধীনতার। আজকার স্বাধীনতার উদয়-প্রভাতও দেখলেন—ইংরাজের দান—মহাভারতের ব্যবচ্ছেদ,—মহামানবের আবির্ভাব!

প্রণাম করলেন সাধু হাত জোড় করে, তারপর চাইলেন চ্যালার পানে.

—কি খবর কিশোর?

—খবর সব ঠিক আছে সাধুজি—কিশোর মুখের বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল।

—চিঠিখানা তুমি দিয়েছ ঠিক যায়গাতে?

—জি হ্যাঁ! লেকিন ও মাইজী কোঠিমে নেহি থা, বহুৎ দেরসে আয়া—হাম্ বৈঠা থা দরওয়াজামে। ন বাজে কো বাদ উ আয়া—মাজী রোতে থে সাধুজী।

—রোতে থে? কাঁদছিল? কেন?—সাধুজির কণ্ঠস্বরে কিঞ্চিৎ আগ্রহ।

—উ হামি জানি না, হামি চিঠিঠো দিলো—ঠিকানা উন্‌হি পড়লেন, উসকে বাদ হামাকে ঘরমে ডাকলেন—হামি গেলুম—বৈঠ্‌নে বোললেন। উপরমে গিয়ে আধাঘণ্টা বাদ ফিরলেন, আউর হামকো বোললেন—'অত্তো দূর হামি একেলা ক্যায়েসে যাবে? লেকিন যাবে সাঁঝ তক্।

—তাহলে আসবে, বলেছে?

—জি হ্যাঁ—বলছেন, উন্‌হি আসবেন সাঁঝ বেলা। চিঠিকা জবাব্ কুছ নাই দিয়েছে। খালি হামকো পুঁছলো, সাধুজি ক্যা খায়েগা—কাঁহা শুতেগা—ব্যস!

—তুমি কি বললে?

—হামি কি বোলবে? হামি তো জানে না, আপ্ ক্যা খাতা হ্যায়!

—ঠিক আছে। তুমি কি এখন বাসায় চলে যেতে চাও কিশোর?

—নেহি। কুচ দরকার হামার নেহি! লেকিন আপ্ ক্যা খায়েগা?

—এই দুধ ফল মিষ্টি কিছু খাব—স্নানটা সেরে আসি।

সাধু উঠে গিয়ে গঙ্গায় নামলেন—কিশোর ধুনিটাতে কাঠ দিতে লাগলো। অনেক খাদ্যই জমা হয়েছে—দুজনের পক্ষে যথেষ্ট। সাধুজী স্নান করে পূজা শেষ করে নিবেদিত প্রসাদ কিঞ্চিত গ্রহণ করলেন, বাকি সব দিলেন কিশোরের হাতে ছেড়ে। কিশোর যথাসাধ্য খেল, বাকিগুলো বেঁধে রাখলো পকেট থেকে একখানা ছেঁড়া রুমাল বের করে। বলল,

—উস্ যন্তরমে কুছ বাৎ কহেগা সাধুজি?

—হ্যাঁ—সাধুজী আসনের তলায়—মাটিতে ঢাকা গর্ত্ত থেকে ছোট একটি যন্ত্র বের করে কথা বলতে লাগলেন—খুব সাংকেতিক কথা—কিশোর কিছুই বুঝতে পারছে না। সাধুর কথা শেষ হলে কিশোর প্রশ্ন করলো,

—ই বাত আপ্ কিসকো কহাতা সাধুজি?

—তুম নেহি সমঝেগা—সাধু জবাব দিলেন! কিশোরের আত্মসম্মানে ঘা লাগছে যেন; কিন্তু ইনি সাধু—মস্ত বড় সাধু—কিশোর সয়ে গেল। ওদিকে আবার লোক আসছে—দূর থেকেই দেখা যাচ্ছে! সাধুজী আবার ভাল হয়ে আসনে বসে ধ্যান আরম্ভ করলেন। কিশোর কি করবে, ভাবছে; লোকগুলো এসে পড়লো—কিশোরকেই শুধুলো ওরা,

—সাধুবাবা কখন উঠবেন ?

—হাম্ নেহি জানে—বলে কিশোর বিড়ি টানতে টানতে সরে গেল ওখান থেকে। গঙ্গা বাঁধানো হয়েছে পাথর দিয়ে, তারই উপর বসলো গিয়ে। এ রকম মৌনীবাবাকে দেখতে আসার কোনো মানে হয় না—লোকগুলো ভাবছে সব! ওরা ফিরেই যাবে, কিন্তু অকস্মাৎ সাধুবাবার চোখের পাতা নড়ে উঠলো।

—জয় সাধুজি কি জয়—জয়ধ্বনি করলো জনতা।

—জয় ভগবানজিকি—জয় গঙ্গাজি কি,— জয় ভারতমাতা কি জয়!

সাধুজি উচ্চ চীৎকার করে বললেন ওদের ধ্বনিটার পরেই !

সকলে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে ওঁর সঙ্গে আবার জয়ধ্বনি করলো। সাধু বললেন,

—আজ তামাম্ ভারত স্বাধীন হো গিয়া—বাচ্চালোক—তুম কাহে হিঁয়া খাড়া হ্যায় ? যাও, ঝাণ্ডা উঠাও,—মহাত্মাজিকো জয়গান গাহো—আউর ইয়ে স্বরাজকো বাস্তে নাচনা-গাওনাভি চালাও—হামারা পাশ কাহেকো আয়া ?

—চরণ দর্শনকে লিয়ে—জনৈক ভদ্রব্যক্তি উত্তর দিলেন।

—ই চরণমে চন্দন নেহি—আগ্ হ্যায়। যাও, বাচ্চালোক, হিয়া তুম্হারা কুছ কাম নেহি। তাবিজ কবচ হাম কুচ নেহি দেতে হেঁ—হাত দেখনে ভি নেহি স্বকৃতা—দীখ্ বা ভি নেহি দেঙ্গে!—যাও!

লোকগুলো পরস্পর মুখ-চাওয়া-চাওয়ী করছে। সাধুজি বলে কি ? কিন্তু সাধুজী আবার ধ্যানমগ্ন হলেন!—ধরতে হবে। সিদ্ধসাধু, সহজে কি আর দেবেন কিছু! ধরতে হবে কষে, জোর করে—হাতে পায়ে ধরতে হবে! সুতরাং কেউ ওরা গেল না ওখান থেকে! যারা এর পর এল, তারাও বসে গেল গোল হয়ে। মহা মুস্কিলের ব্যাপার। সন্ধ্যা হয়ে আসছে।

সাধুবাবা নিতান্তই নিরুপায় হয়ে উঠে পড়লেন—কিন্তু আসনের তলায় গুর্ত্তে আছে সেই যন্ত্রটী। বড়ই মুস্কিলে পড়ে গেছেন তিনি। আসনটা কেউ তুলে ফেললেই তো গেছেন। ভেবে একটা উপায় বের করলেন সাধুবাবা। লোকগুলোকে বললেন উচ্চকণ্ঠে—

মেরা পিয়ারে ভাইও,—

হাম্ সাধু—ভগবানজিকো আরাধনা করনেকোবাস্তে হিঁয়া নির্জনমে আয়া—হামারা ধ্যায়ান তুমলোক কাহেকো তোড়নে আয়া? দেখিয়ে—হাম্ ফিন্ কহতা, আপলোক নেই চলা যানেসে, হাম হিঁয়াসে চলা যায়েগা, —উসকো বাদ এহী গাছ গির যায়েগা—গঙ্গাজিমে বান আ যায়েগা, আউর বহুৎ খারাপভি হোনে লাগেগা—চলা যাইয়ে, জল্দী চলা যাইয়ে; হাঁয় সবকো থোড়া পরসাদ দেতা—সাধুজি একটা মিঠাই—ওরাই কে এনেছিলেন,—ভেঙে সকলকে বিতরণ করে দিলেন। বললেন,—কাল সবেরে সব আ-যাও, হাম রহেগা কি নেই, ঠিক নেই—রহেনেসে কুছ বাৎ কহেগা—।

লোকগুলো নিরুপায় হয়ে চলে গেল। কিন্তু গেল না দুজন। কে জানে ওরা পুলিশের লোক কি না! আজ দেশ স্বাধীন হয়েছে—আজো কি ইংরাজের গুপ্তচর আছে নাকি? না, ওরা বেড়াতে এসেছে—গঙ্গার ধারে গিয়ে বসলো। নওকিশোরও বসে আছে ওখানে!

—এ বাচ্চা, উ সাধু কোন্ হ্যায়, তুমি জানো?

—হাঁ, জি, উ তো বহুৎ ভারি সাধু হ্যায়। লেকিন কুছ কামকা নেহি! দিনভর ধ্যেয়ান, রাতভর ধ্যেয়ান—মাসভর ধ্যেয়ান, বরষভোর ধ্যেয়ান—উসকো খালি ধেয়ান চলতা হ্যায়। হামতো চ্যালা হ্যায় জি—ক্যা করে! দেখিয়ে—ভিখ্ মাঙনে যে যানে নেহি সেকা! উন্‌কো একেলা ছোড়কে তো জানে সেকেগা নেহি!

—সাধুজিকো আশ্‌রম্‌ কাঁহা ?—অন্য লোকটি শুধুলো।

—আরে ! আশ্‌রমকা বাত মত্‌ পুছিয়ে ! পাঁন্‌ সাত্‌ বরষ যেই ঘুমতে হেঁ উনকো সাথ্‌—এক জাঘামে দোরোজ কভি নেহি রহা ! আজ দিল্লী তো কাল বোম্বাই !

—গাড়ীকো কেরায়া ?

—কেরায়া কোন্‌ দেতা হ্যায় বাবুজি ! গাড়ীমে উঠতে হেঁ আউর চলতে হেঁ। কাঁহা মব উতর দিয়া, তো উতর গিয়া, আউর বৈঠ গিয়া ধেয়ানমে—হাসলো কিশোর।

—তুম কিয়া ধেয়ান-ওয়ান কুছ শিখা ?

—থোড়া-বহুৎ !—কিশোর কথাটা বলেই মুখের একটা শব্দ করলো !

—সাধুজি গাঁজা কাহে নেই পীতা হ্যায় ? পীয়েগা নেই ?

—নেহি !—কিশোর জবাব দিয়েই ওদের মুখপানে চাইলো, বললো, —হামি থোড়া পীতা কভি কভি ! পীয়েগা ?

—বনাও না এক ছিলিম !

—হিঁয়া নেহি—থোড়া দূর যানে পড়েগা—সাধুজী দেখনে সে বহুৎ গুঁসা হোগা !

—উ তো ধেয়ান করতা হ্যায় !

—হুঁ—লেকিন কৈ বখ্‌ত আঁখ মিলনে সে মালুম পড় যায়গা !

—তব চলো !—ওরা উঠে দাঁড়ালো !

—চলিয়ে। কিশোরও উঠে গাঁজার কলকেটা আনতে গেল ধুনির কাছ থেকে। গিয়ে চুচুপি বললো—শালালোককো থোড়া ধুর লিয়ে যাচ্ছি, সাধুবাবা, আব্‌ যন্তর মন্তর ঠিক কর লিজিয়ে ! জল্‌দি হিঁয়াসে চলা যাইয়ে ! ই আদ্‌মি আচ্ছা নেহি !

কলকেটা নিয়ে কিশোর চলতে লাগলো ভাঙা বাড়ীটার দিকে। ওরাও আসছে সঙ্গে। একজন শুধুলো—গাঁজা খায় না তো কল্কে রাখে কেন রে?

—মহাদেওকো ভোগ লাগানেকে লিয়ে!

—সাধু প্রসাদ পায় না?

—নেহি! পরসাদ হাম্ খাতা হ্যায়।

—গাঁজা খায় না—কি রকম সাধু?—লোকটি অবজ্ঞাভরে বলল। কিশোর বললো,

—উ তো ভগবানজিকো নেশামে বুঁদ হ্যায় হরবখত্। গাঁজামেঁ ক্যা হোগা?

লোক দুটো আর কিছু শুধুলো না, চলতে লাগলো। কিশোরই বললো,—আপ্ লোক ই জঙ্গলমে কাহে আয়া? গাঁজা পিনেকো লিয়ে জরুর নেহি।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, গাঁজা পিনেকো—সজোরে বললো দুজনেই!

—নেহি জি: আপ্লোক টিক্‌টিকি আছে, উ হামি সমঝেছে। লেকিন বাত ইয়ে হ্যায় কি, যো মরদকো বাচ্চা হোগা উ দেশোয়ালী আদমীকো পিছুমে টিক্‌টিকি কভি নেই বনেগা। আপলোক মরদ্‌কা বাচ্চা নেহি হ্যায়—জেনানাকা বাচ্চা। আজ তো আপলোককো বাপ্ ইংরাজ ভাগলো—আব্ ক্যা করেগা? আব্‌হি টিকটিকিকো কাম চালাতে হেঁ?

লোক দুটো রাগে উত্তেজিত হয়ে উঠছে, কিন্তু কিশোর একটু তফাতেই ছিল, বললো—হাম্ আগাড়ি দেখ্ লিয়া, তুম্‌হারা পাশ রিভলভার নেহি। খালি হাতমে টিক্‌টিকি হামরা কাম্ কর্ সেকেগা? যাইয়ে—জাল্তি দিক করনেসে আচ্ছা হোগা নেই।

—কিশোর ছুটে চলে গেল বনের দিকে! লোক দুটো খানিক ছুটলো পিছুপিছু—ধরতে পারলো না, ফিরে এসে দেখলো, সাধু নাই।

উৎপলা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দেখলো অবন্তীর চলে যাওয়া; প্রায় মিনিট-খানেক তারপরেও চুপ করে রইলো উৎপলা; অতঃপর প্রশ্ন করলো,—ও যে আপনাকে বরাবর ভালোবাসে, এটা তো আপনার জানাই ছিল আলোক-বাবু,—তবু ওকে এতখানা আঘাত দিলেন আজকার আনন্দের দিনে?

—কোনো বিবাহিতা নারী অপর পুরুষকে ভালোবাসবে, এ চিন্তা আমার আদর্শবোধের বাইরের বস্তু—দেবি; মেনে নিলাম, মানুষের জীবনে নানা জটিলতা আসে, তার সামঞ্জস্য করে পৃথিবীতে বাঁচতে হয়। কিন্তু মানুষ যেখানে দেবত্বে অভিষিক্ত, সেখানেই তার আত্মার স্বর্গ—আর সেখানেই সে প্রেমের মন্দারকুসুম ফুটাবার অধিকারী—আলোক আস্তে বলল।

—মন্দারকুসুম কল্পনার বস্তু আলোকবাবু, মাটির ধুলোতে ওকে খুঁজতে যায় নির্ব্বোধের দল; মানুষের প্রেম মানুষের সুখ-দুঃখ-আঘাতের অনুভূতি নিয়ে। সেখানে জাগে সংঘাত, আসে বিচ্ছিন্নতা, কিন্তু তা'বলে কি সেটা প্রেম নয়?

—প্রেমের ছায়া; প্রেম যখন সত্যি আসে তখন এই মাটির পৃথিবীই কল্পনার স্বর্গে পরিণত হয়। মানবীয় প্রেমকেই স্বর্গীয় করবার সাধনা এই মানব-জীবনের, অন্যথায় সে প্রেম কামেরই নামান্তর! সেটা পাশবিক এবং অমানুষিক।

—মানুষকে কি আপনি দেবতাই ভাবেন আলোকবাবু? মানুষের মতন পশু বোধ হয় আর দ্বিতীয় নেই! বাঘ-সিংহ যা করতে সক্ষম নয়, মানুষ তা অনায়াসে করতে পারে।

—পরে, যতক্ষণ তার মধ্যে মনুষ্যত্বের জাগরণ না হয়। এই জাগরণের জন্যই প্রয়োজন মহত্তোমহীয়ান্ আদর্শের—পৃথিবীতে এই মানুষের মধ্যেই আমরা যুগে যুগে তাকে পেয়ে আসছি বুদ্ধ-খৃষ্ট-চৈতন্যের মধ্যে—আলোক হাসলো একটু—জননীর স্নেহ, পিতার পালন-প্রচেষ্টা,—ভ্রাতা-ভগ্নীর বন্ধুত্ব সখীত্বকে অবলম্বন করে মানুষ শুধু স্বজনীবৃত্তি আর শারীর-শক্তিতেই বড় হয় না! মনোরাজ্যের বিরাটত্বে আর বৈচিত্রেও বড় হয়—আপন পরিবারের গণ্ডীর গর্ব্ব থেকে সে তখন আপন গ্রামের, আপন সমাজের এবং আপন দেশের গৌরব হবার যোগ্য হতে পারে—পশুর সে শক্তি নাই। পশুর সে শক্তি না-থাকার মূলে রয়েছে তার মনোজগতে মহৎ কোনো আদর্শের অভাব। মানুষের জগতে এই আদর্শই মানুষকে মানুষ হবার পথে চালাচ্ছে চিরদিন!

উৎপলা অল্পক্ষণ চুপ করে রইল, ওর চোখের দৃষ্টিতে কেমন যেন আচ্ছন্নতা—মানুষ পশুর থেকেও নৃশংস হতে পারে—জানেন আলোক-বাবু? আপন আত্মজ সন্তানকে গলা টিপে মারতেও কুণ্ঠিত হয় না, এমন মানুষ আছে—জানেন?

—জানি—আলোকের কণ্ঠ সহজ-গম্ভীর, কিন্তু স্নেহসিক্ত; ধীরে ধীরে বললো সে—সন্তানকে হত্যা করার মূলে তার মাতৃস্নেহের অভাব নয় দেবি, আদর্শবোধেরও অভাব নয়—তার মূলে থাকে সামাজিক অনুশাসনের ভীতি; মিথ্যা মর্য্যাদা-বোধের অহঙ্কার—কিম্বা আর্থিক অনটনের দুর্ভাগ্য কে জানতে পারে, আপন সন্তানকে হত্যা-করা হাত দুখানি তার জীবনব্যাপী হাহাকারে কাঁপছে? কে দেখতে পায় সেই অভাগী মাতার অন্তরের অশ্রু বর্ষার আকাশের মত মেদুর?—আলোক চেয়ে দেখলো উৎপলার চোখের পানে—কালো সুন্দর চোখ দুটো যেন জলে চক্‌চক্ করছে ওর! আলোক আস্তে বললো,—মানুষ দেবত্বেরই উত্তরাধিকারী উৎপলা দেবি—,

দানব তাকে আশ্রয় করতে পারে—কিন্তু মানবদেহ দানবের আবাসভূমি নয়—সে দেবভূমি।

উৎপলা অকস্মাৎ উঠে জানালার কাছে দাঁড়ালো গিয়ে; কি যেন দেখতে গেল। কিন্তু আলোক বুঝেছে, নিজকে সামলাতে উঠে গেল উৎপলা; আলোক জানে, কোথায় ওর ব্যথা,—কেন ওর এই আকস্মিক উদ্বেলন! কিন্তু আলোক ঠিক করে রেখেছে,—এই পৃথিবীর একমাত্র সাক্ষীস্বরূপ সে-ই উৎপলার সেই দুর্যোগ রাত্রির দুর্ঘটনার—তাকে একথা কোনো দিন জানাবে না আলোক।

—উ ঝাঁন্‌দা উঁচা লহে হামালা—আ-আ···গাইছে অপর্ণার ছেলেটা। অপর্ণার ছেলে? কার ছেলে, তা জানে আলোক—একমাত্র আলোকই জানে। আর জানে এই বিশ্বের যিনি কর্ত্রী—জানে অগণিত নক্ষত্র-খচিত নীলাকাশ—জানে ধরণীর ধূলিকণা—জানে ধ্বংস আর সৃষ্টির রুদ্ররূপী মহাকাল!

উৎপলা ফিরে এলো জানালা থেকে—হাতের রুমালে মুখ মুছে বলল আবার—মানুষের উপর আপনার দরদ তো অসীম আলোকবাবু—তবু অবন্তীকে কেন আঘাত করলেন? এই আদর্শবোধের মূল কোথায়?

—ওকে ভালবাসি উৎপলা দেবি—ওর আত্মার কল্যাণই কামনা করি আমি। ওর দেহ নিয়ে পাশবিক বিলাস করবার মত কামনার উগ্রতা আমার নেই। ওর বিবাহিত জীবনে ঐশ্বর্য্য বা বঞ্চনা যাই থাক—ওর আত্মা হোক নিষ্কলুষ, উন্নত,আদর্শদীপ্ত।

—জীবন কলুষিত হলেও আত্মা কি উন্নত থাকতে পারে আলোকবাবু? আপনিই তো বললেন, বাক্য আর অর্থের মতই জীবন আর আত্মা আঙ্গাঙ্গীযুক্ত!

—কলুষ বর্জন করা সম্ভব দোষ,—বাক্যের একাধিক অর্থ থাকা বিচিত্র নয়। শুদ্ধার্থই গ্রহনীয়—জীবনকে শুধু পার্থিবসত্তার আশ্রয়ে না দেখে আপার্থিব আলোকের অর্থে দেখাই সত্য দর্শন। কলুষ সে দৃষ্টিতে নিষ্কলুষ! পাপ এবং পুণ্যের অতীত সে দৃষ্টি—কিন্তু বড় বেশী দার্শনিক কথা বলছি আমরা! কাজ রয়েছে উৎপলা দেবি?

—থাক কাজ! আজ ছুটির দিন—যুগান্ত পরে এলো ভারতের স্বাধীনতা—চলুন, আপনাকে আমার বাড়ী যেতে হবে। কোনো দিন তো যান নি—নতুন বাড়ীটা দেখলেনই না!

—আমার না গেলে হয় না?—আলোক কুণ্ঠিত হাস্যে বললো কথাটা!

—না—যেতেই হবে; তারই জন্য আমি এলাম, আপনাকে নিয়ে যেতে।—উৎপলা বেশ জোর দিয়েই কথাটা বলে একটু থামলো—পরে আবার আস্তে বলল,—আপনি বড় বেশি নির্লিপ্ত আলোকবাবু! কে জানে কেন এমন উদাস আপনি! এখানে আপনি এসেছিলেন অপর্ণার আশ্রয় ঠিক করবার জন্যই—এ সত্য আমি জানি—আমার এই নারী-হিতৈষণার ঝুঁকিটাকে কি আপনি সমর্থন করেন না মনে-প্রাণে?

—অসমর্থন করলে আমি একমুহূর্তও এখানে থাকতাম না দেবি; অপর্ণার আশ্রয়ের আশ্বাসেও না—পৃথিবীর কোনোকিছুর জন্যেই না—আলোক বললো!

—সেই বিশ্বাসেই কথাটা বললাম—এতো বেশি সংস্কৃতির দীপ্তি আপনার চোখে-মুখে, সর্ব্বাঙ্গে যে কোনো কথা শুধুতে ভয় হয়—পাছে আঘাত করে বসি!

—সংস্কৃতি সনাতন দেবি—শাশ্বত সত্যবস্তু! কোনো আঘাতই তাকে নস্যাৎ করতে পারে না, অবশ্য যদি সেই সাংস্কৃতিক সত্তাটি সত্যের

উপলব্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু আমি এখানে কর্মচারীমাত্র, আমার কাছে যে-কোনো প্রশ্ন করার আপনার অধিকার আছে।

—আমি তা মনে করি না আলোকবাবু—আপনাকে কর্মচারী মনে করবার ধৃষ্টতা আমাদের ম্যানেজিং কমিটির অনেকেরই আছে—আমার নেই। কিন্তু সে কথা থাক—আমি শুনেছি, আপনি এখান থেকে শীঘ্রি চলে যেতে চান—কেন বলবেন ?

—এ কাজ খুবই মহৎ কাজ হতে পারে উৎপলা দেবি—কিন্তু এ কাজ আমার নয়। আমার আত্ম-সত্তাকে আমি একটা ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ রেখে মৃত্যু বরণ করতে চাই না! তাছাড়া, এই প্রতিষ্ঠানে তিন বৎসর কাজ করে আমার বিশ্বাস জন্মেছে যে মহৎ কাজের পরিকল্পনা করা যত সহজ—তাকে কার্য্যে পরিণত করা তত সহজ নয়, বিশেষতঃ যেখানে মানুষের যূথবদ্ধ শক্তি সেই পরিকল্পনাকে পরিচালিত করে—প্রেমে নয়, প্রয়োজনে!

—প্রয়োজনে? ঠিক বুঝলাম না আলোকবাবু—মানুষের যূথবদ্ধ শক্তির কি কোনোই মূল্য নেই ?

উৎপলার কণ্ঠে বিস্ময়, বিস্ময় তার উৎসুক চোখে; ব্যগ্র হয়ে রয়েছে উত্তরের জন্য!

—প্রয়োজনে!—আলোক ধীরে বললো—মানুষের লোভ, কাম, ক্রোধ, ঈর্ষা, বিদ্বেষের পাশব প্রয়োজনটাই এই রকম সংগঠন শক্তির অন্তরালে সক্রীয় থাকে সব সময়; ব্যক্তির আদর্শবোধকে ছাপিয়ে, জেগে উঠে প্রভুত্ব-প্রিয়তার অহঙ্কার, বিদ্বেষের অগ্নি, কামনার দাবানল—তখন সেইটা মেটাবার প্রয়োজনই বড় হয়ে ওঠে!

—তা হলে সমাজে? রাষ্ট্রে—?

—হ্যাঁ, সর্ব্বত্র! বর্ত্তমান জগৎ আদর্শহীন জগৎ। মানুষের ধর্ম্মবোধ লোপ পেয়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ! ধর্ম্ম বলতে এখানে মানবত্বের আদর্শকেই

বলছি আমি—যে ধর্ম্ম দেহকে আশ্রয় করে' দেহাতীত বস্তুর সন্ধান করে, সেই ধর্ম্মের কথাই বলছি—আলোক হাসলো—তাকে বাদ দিয়ে যে যূথবদ্ধতার সংগঠন তার মধ্যে পশু-শক্তিই প্রকট হয়—ব্যক্তির আদর্শ-বোধ সেখানে উপহাসাস্পদ হয়ে ওঠে! অথচ ঐ আদর্শবাদের বক্তৃতা দিয়েই, বড় বড় বাণী ছেড়েই সে সাধারণ মানুষের মনে স্থায়ী আসন লাভ করতে চায়—কৃতকার্য্যও হয়!

উৎপলা কথাটার তাৎপর্য্য ঠিকমত বুঝতে পারছে না। আলোক বলল—মানবমন আদর্শের সন্ধান করে আসছে চিরদিনই, অথচ দানবমন তার আজন্মের সঙ্গী। এই সঙ্গীকে বাদ দিয়ে চলার মত পুরুষকার তাকে অর্জন করতে হবে, কিন্তু—আলোক একটু থামলো। উৎপলা চেয়ে আছে তার মুখের দিকে।

—কিন্তু, প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির সংহতি দ্বারা শ্রেয়ঃ এবং হেয়, কল্যাণকর এবং বিনাশকর উভয় শক্তিরই বিকাশ সম্ভব—এটা ইতিহাসের সাক্ষ্য! যে কোনো প্রতিষ্ঠানের পিছনে সত্যদৃষ্টি, ন্যায়নিষ্ঠা আর আদর্শবোধে বিশ্বাস থাকা অত্যন্ত দরকার, অথচ তারই অভাব হয় একান্তভাবে। কারণ বিবেক এবং ব্যসন দুটোই আছে মানুষের প্রকৃতিতে—বিবেককে অতিক্রম করে ব্যসনের লোভ বড় হয়ে ওঠে আদর্শবোধের অভাবে—কিন্তু কথাগুলো বড় বেশি ভারি হয়ে উঠছে দেবি—এ আলোচনা থাক!

—থাক—আমি বুঝেছি, আপনি আমাদের ছেড়ে যাবেন। অনেক আশা নিয়ে আমি এই আশ্রম গড়েছিলাম আলোকবাবু—কিন্তু সত্যিই কিছু কাজ হচ্ছে না; উপরন্তু অনেক অন্যায় হয়ে যাচ্ছে। এ আশ্রম অকস্মাৎ ভেঙে দিয়ে এতগুলি নিরাশ্রয়া মেয়েকে আমি পথে বের করে দিতে পারিনে—উৎপলার কণ্ঠের স্বর বেদনাতুর—আবেগ-কম্পিত। আলোক লক্ষ্য করলো, আস্তে বললো,

—ভারতের স্বাধীনতা যদি সত্য হয়, তাহলে ভারত আবার তার আদর্শকে নিজের অন্তর-তলের অতল থেকে টেনে তুলবে—তখন হয়তো সত্য হবে আপনার এই কাজ!

—ভারতের স্বাধীনতা কি সত্য হবে কোনো দিন আলোকবাবু?

—জানিনা—আলোক নিশ্বাস ফেললো একটা—রাজনৈতিক স্বাধীনতার থেকে আমি নৈতিক স্বাধীনতাকে অনেক বেশি বড় বলে মনে করি—কিন্তু আজকার :নীতিহীনতা—দুর্নীতির অভিযান মানুষকে পশু থেকে দানবে, দানব থেকেও নীচে পিশাচে পরিণত করেছে। দানবীয় শক্তির মধ্যেও কিছু পৌরুষের গর্ব্ব থাকে। পিশাচের মধ্যে থাকে ছদ্ম বেশের পারিপাট্য, মেকী বুলির ঝঙ্কার আর গুপ্তঘাতের নৃশংসতা!

মনটা ঝিমিয়ে পড়ছে উৎপলার। কিন্তু সে আলোককে নিতে এসেছে!

—চলুন—আপনাকে যেতে হবে! আমার বাড়ীতে আজ সকলকে খাওয়াবো আমি!

—আমাদের সমিতির মেম্বারগণ আমার যাওয়াটাকে ভালোচোখে দেখবেন না দেবি। হয়তো ঐ জন্য আপনাকে কদর্য্য ইঙ্গিতের মুখোমুখি হতে হবে। আমি জানি, এটা আপনার আদেশ নয়, অনুরোধ; তবু আমি আপনারই মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করছি, আমায় নিয়ে যেতে চাইবেন না।

—এর মূলে কোনো সত্য নেই আলোকবাবু।

—আছে; তাদের অর্থ, আভিজাত্য, আত্মম্ভরিতা। বর্ত্তমান জগতে ঐ গুলোই সত্য হয়ে উঠেছে দেবি—সূর্য্যের অতিবেগুনী রশ্মি বাদ দিয়ে আজকার মানুষ 'আলট্রাভায়োলেট রে' তৈরী করে লেবরেটরীতে। সে ভাবে না তাঁর কথা, অনাদিকাল থেকে অক্লান্তভাবে যিনি দিয়ে আসছেন জীবনীশক্তি,—তিনি শুধু 'আলট্রাভায়োলেট রে'রই উৎস নন, আজকার

মানুষকে এই গৌরবের আসনে আনবার মূলেও তিনিই! তিনি না থাকলে মানুষ বহুকাল আগেই লুপ্ত হয়ে যেত! কিন্তু আপনি এবার যান—দেরী হয়ে যাচ্ছে!

উৎপলা উঠলো; মুখের রেখায় ওর দুঃখের চিহ্ন পরিস্ফুট; কিন্তু জানে, একজন বেতনভোগী কর্ম্মচারীকে তার কমিটির অনারারী মেম্বারগণ কতখানি অবজ্ঞার চোখে দেখেন! অথচ উপায় নাই উৎপলার। যে সঙ্ঘশক্তির সাহায্যে সে একটা বড় কাজ—মানবতার কাজ করবার পরিকল্পনা করেছিল—তাকে কোনো ব্যক্তিগত শক্তিতে চালানো অসম্ভব—অথচ সঙ্ঘশক্তির গৃধ্নুতা প্রতিমুহূর্ত্তে তাকে পঙ্কিল করে তুলছে! এমনই হয়—অন্ততঃ এদেশে, যেখানে যে-কোনো মহৎ কাজের পেছনের প্রেরণা থাকে নিজকে প্রতিষ্ঠা করা! কিন্তু এই দেশেই ছিল স্বার্থত্যাগের জলন্ত উদাহরণ—আত্মভোলা মহেশ্বরের অসংখ্য আবির্ভাব ঘটেছে এই দেশেই! কালরূপী রুদ্র তাকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে এনেছেন পশ্চিমী সভ্যতার সংগঠন-শক্তির ঐশ্বর্য্য! শুধু ঐশ্বর্য্যই—শুধু রাজসিকবৃত্তি—তামসিক প্রভাবও ওর মধ্যে কম নেই কিছু! ওর সাত্ত্বিক গুণময়ত্ব বিনষ্ট হয়ে গেছে আত্মপরায়ণ পশ্চিমী সভ্যতার প্রাখর্য্যে!

—আচ্ছা—যাই আমি!—উৎপলার স্বর করুণ, ম্লান!

—দুঃখ করবেন না! যে কাজ আরম্ভ করেছেন, তাকে শেষ করবার চেষ্টা অক্ষয় করে রাখুন মনের মধ্যে; সঙ্কল্পশুদ্ধি থেকেই লাভ হয় সিদ্ধি! আপনার শুদ্ধ সংকল্পকে অটুট রাখুন—এর পর যা করবার, সে কাজ ঐশী শক্তির—ঈশ্বরের। তার জন্য নিজকে দায়ী করা নিতান্ত মূঢ়তা!—আলোক ধীরে বললো কথাগুলি!

উৎপলা যেতে যেতে আবার ফিরে এসে বললো—আমার জীবনের কিছুই কোনো দিন আপনাকে বলিনি—হয়তো আপনি আমাকে খুবই

মহীয়সী শুদ্ধ-শান্ত-পবিত্র মেয়ে ভাবেন! কিন্তু না, আলোকবাবু, তা নই!

—আপনার আত্মা শুদ্ধ-শান্ত-পবিত্র! বলবার প্রয়োজন নেই দেবি; আত্মা যদি শুদ্ধ থাকে, তাহলে জীবনের ভুল-ভ্রান্তি স্খলন-পতনের চরম সার্থকতা ঘটে আত্মারই উন্নতিতে। জগতের সব ভালো আর সব মন্দর অতীত এই আত্মা, বিবর্ত্তনের পথেই তিনি যাত্রা করেন বিশ্বরাজের চরণতলের সান্নিধ্যে!

উৎপলা আর কিছু না বলে চলে এল—বাইরে এসে গাড়ীতে উঠলো; তারপর গাড়ী থেকেই বললো—কাল বিকালে অবন্তীকে দেখতে যাব—তৈরী থাকবেন!

—যে আজ্ঞে!—আলোক দেরাজ থেকে একখানা বই টেনে নিয়ে পড়তে বসলো!

আজ কোনো কাজ নেই, আশ্রমের সবাই গেছে উৎপলার বাড়ী; এখানে শুধু আছে দুজন দারোয়ান—আর আলোকের রান্না করতে অপর্ণা, সঙ্গে তার সেই ছেলেটা। অপর্ণা ইচ্ছে করেই গেল না। সে গেলে কে তার দাদাবাবুকে রেঁধে খাওয়াবে, সেই চিন্তাতেই গেল না সে ওখানে। আলোক ওকে ডাক দিয়ে বললো—বেশি কিছু রাঁধিসনে অপু—ঝোলভাত কর!

—তুমি উসব ভাবছো কেনে দাদাবাবু, কি রাঁধবো আমি বুঝবো—বলে অপর্ণা বেশ তিরস্কারই করলো আলোককে। ওর অধিকারে হস্তক্ষেপ ও বরদাস্ত করবে না। কিন্তু অপর্ণা হঠাৎ স্বর নামিয়ে বলল,

—কিশোর সেই রসগোল্লা খেয়ে যাবার পর আর আসেনি দাদাবাবু!

—আছে কোথাও। ঝুমনী—রামধনিয়া, ওরা সব কোথায়?

—কে জানে দাদাবাবু; ঝুমনী তো আজকাল বড় বেবাগা হয়ে উঠেছে। কোথায় যে কখন যায়—কার সঙ্গে কি করে, কে জানে!

আলোক ও-কথার কিছু জবাব না দিয়ে বলল—যা, রান্না কর গিয়ে। খেয়েই আমি একটু বেরুবো!

অপর্ণা চলে গেল; আলোক বই নিয়ে বসলো। প্রথম পাতাটা মাত্র শেষ হয়েছে—এলেন মিঃ মাকু—বললেন,

—আপনি যাননি যে এখনো? ওখানে ম্যানেজমেণ্ট দেখবে কে?

—কোথায়? আলোক সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলো—তার সঙ্গে হাত তুলে নমস্কারও করলো।

—কোথায় মানে? উৎপলা দেবীর বাড়ীতে!

—ম্যানেজম্যাণ্ট তিনি করবেন, তাঁর লোকরা করবেন। আমার তো সেখানে কোন ডিউটি নেই।

—ওঃ—আচ্ছা,—নিমন্ত্রণ তো আছে—চলুন!

—আমি যেতে পারবো না, সে কথা তাঁকে জানিয়েছি,—

—কেন, কেন? চলুন—আমার গাড়ীতে আসুন!

—মাফ করবেন—আমি যেতে পারবো না।

—কেন মশাই! আপনি না গেলে কি চলে? আসুন!

উনি হেসেই যেন হুকুম করছেন আলোকের উপর।

—বারবার এক কথা আমি কম বলি মিঃ মাকু—আমার যাওয়া সম্ভব নয়—নমস্কার!—আলোক বই-এ মন দিল।

মাকু মশাই বেশ চটেই নিজের গাড়ীতে গিয়ে উঠলেন। সামান্য একজন বেতনভুক কর্ম্মচারী—তার আবার এতোখানা আস্পর্দ্ধা—কম নয়! কিন্তু এই স্পর্দ্ধার মূলে আছে ওর উপর উৎপলার স্নেহ আর সহানুভূতি—এটাও মাকুর জানা! কেন উৎপলা ওকে স্নেহ করে—কেন? আর কেন! ছোকরা দেখতে-শুনতে ভালো—আর উৎপলা মেয়েটিও তো বেশ ভালো মেয়ে নয়! যুদ্ধের বাজারে কি কাণ্ডই না করেছে ও! কিন্তু তা বলে আলোকের মত একটা অতি নগণ্য পথের ভিখিরীকে উৎপলা ভালোবাসবে—অসহ্য! এ কিছুতেই বরদাস্ত করা যাবে না! কিন্তু উপায় কি? কি করে ওকে জব্দ করা যায়! ছোকরা কাজ করতে পারে অসম্ভব—অতিমানবের মত। কত টাকা যে ও এই আশ্রমের জন্য তুলেছে—কত হাজার এ্যাপিল লিখে দেশে বিদেশে পাঠিয়েছে—কত বদান্য ব্যক্তির দানে ভরে তুলেছে আশ্রমের তহবিল, মিঃ মাকু তা ভালই জানেন! বরাবরই তিনি যুক্ত আছেন এই আশ্রমের সঙ্গে—কিন্তু সে-সব কাজ করা তো ওর কর্ত্তব্য; ও তার জন্যই মাইনে পায়—তা বলে প্রেম করবে নাকি উৎপলার সঙ্গে!

আর কারো সঙ্গে হলেও বা কথা ছিল, একেবারে খোদ উৎপলা আশ্রমের-কর্ত্রী—কেন্দ্রের অধিষ্ঠাত্রী—একেবারে তারই সঙ্গে ঢলাঢলি! কিন্তু কেন ও আজ এলো না উৎপলার বাড়ী? উৎপলা ওকে নিশ্চয় নিমন্ত্রণ করেছে—নিশ্চয়ই করেছে! ও কেন এলো না? মিঃ মাকু ভেবে ঠিক করতে পারছেন না! তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহিত স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ীতে তিনি বড় বেশি বিব্রত হয়ে পড়েন—তাই বাইরের কাজেই ঘোরেন বেশি সময়। কাজ অর্থে এই রকম সব সমাজ-হিতকর, বিশেষ করে নারীমঙ্গলকর প্রতিষ্ঠানেই তিনি যুক্ত, কোথাও সেক্রেটারী, কোথাও জয়েন্ট সেক্রেটারী, কোথাও মেম্বার। ইংরাজী আদর্শে প্রতিষ্ঠিত সংঘবদ্ধ

সমাজের বহু বিচিত্র পদ—তার মর্য্যাদাও বিভিন্ন; পৈত্রিক পয়সার খাতিরে এবং বর্ত্তমান ব্ল্যাকমারকেটের কল্যাণে সহরের প্রায় সব প্রতিষ্ঠানেই কোনো না কোনো পদে তিনি আছেন। তাঁকে খোঁজবার দরকার হলে আপনি যে-কোনো একটা দৈনিক কাগজ খুলে দেখুন কোন্ সাধারণ মানব হিতৈষী প্রতিষ্ঠানে আজ কমিটির মিটিং বা সোস্যাল পার্টি কিম্বা কোনো বরেণ্য ব্যক্তির গলায় মাল্যদান করে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপনের ব্যবস্থা আছে। সেখানে গেলেই দেখতে পাবেন মিঃ মাকু পাঞ্জাবীর উপর চাদর ঝুলিয়ে সেখানকার মাইনে করা লোকগুলোর উপর জুলুম চালাচ্ছেন। আপনাকে দেখেই বলবেন—'আসুন স্যার বড় ব্যস্ত, দেখতেই তো পাচ্ছেন!' তার পরেই তিনি ব্যস্ত হয়ে কয়েকজন কর্ম্মচারীকে ধমক দিয়ে তাঁর প্রতাপ প্রতিপত্তি বুঝিয়ে দেবেন আপনাকে!

মিঃ মাকু সাহেব যাচ্ছেন—অন্য একটা রাস্তা থেকে মিঃ গায়েনের গাড়ী এসে তাঁর গাড়ীর পিছু নিল। উনিও যাচ্ছেন নিশ্চয় উৎপলার বাড়ী! মিঃ মাকু নিজের ড্রাইভারকে গাড়ী থামাতে বলে নেমে গিয়ে উঠলেন মিঃ গায়েনের গাড়ীতে। মিঃ গায়েন প্রফেসর ছিলেন, এখন 'রিটায়ার্ড-ম্যান'—প্রৌঢ় ভদ্রলোক মিঃ গায়েন নিজের হাতে গড়ীর দরজা খুলে তুলে নিলেন মিঃ মাকুকে। বললেন,

—এখনো সময় আছে, কি বলেন মিঃ ম্যাক্কু?

—হ্যাঁ—যথেষ্ট?

প্রায় মিনিট দুই উভয়েই চুপচাপ; হঠাৎ মিঃ মাকু বলে উঠলেন,

—মাইনে করা লোকের পদ 'সেক্রেটারী' হওয়ার কি আবশ্যক! 'হেডক্লার্ক' বলেই তো হয়।

—কার কথা বলছেন ? আলোকবাবুর ?—মিঃ গায়েন কথাটা বুঝেও প্রশ্ন করলেন।

—হ্যাঁ—লোকটার অহঙ্কার আর বরদাস্ত করা যাচ্ছে না! চেহারাটা ভালো আর ইংরাজিটা ভালই লিখতে পারে—এই দেমাকে ওর মাটিতে পা পড়ে না!

—বাংলাও খুব ভাল লেখে। আবার সংস্কৃতও ভালো জানে, কিন্তু দেমাক তার জন্য নয়—শিবের মাথার সাপ গড়ুড়কে গ্রাহ্য করে না! হাঃ হাঃ হাঃ!—উচ্চ হাসি হাসলেন মিঃ গায়েন। ওঁর হাসিটা বেশ উচ্চই; শুনলে মনে হবে প্রাণখোলা হাসি, কিন্তু ঐ হাসির তলায় আছে অতল অন্ধকার—সে সত্য জানে যারা ওঁর সংস্পর্শে এসেছে।

—শিব নয়, সাপ এখানে গৌরীর মাথায়, অর্থাৎ স্ত্রীজাতীয় ব্যক্তির মাথায় চড়ে নাচছে; কারণটা কি বলতে পারেন? উৎপলার মতন সুন্দরী, সুশিক্ষিতা সোসাইটি গার্ল ওকে কেন এতটা পছন্দ করে? শেষটায় ঢলাঢলি করবে না কি, কিম্বা কচ্চে?

—কারণটা খুবই স্বচ্ছ মিঃ ম্যাক্‌কু, ছোকরা যুবক, সুন্দর, সুশিক্ষিত, কর্ম্মঠ, আর চতুর—ওদিকে উৎপলা পূর্ণাঙ্গী যুবতী, কুমারী, সুন্দরী, ধনবতী, বিদ্যাবতী, আর,—আর বাকিটা না বলাই ভালো, আপনিও জানেন, আমিও জানি; এরকম হবেই! ওকে এখানে এ্যাপয়েন্ট করাই ভুল হয়েছিল; কিন্তু তখন আমি কমিটিতে আসিনি—এখন ওকে উপড়ে ফেলতে গেলে উৎপলারূপিণীর পদ্মিনীটিকেও উপাড়তে হয়।

—সে অসম্ভব; উৎপলাই আশ্রমের প্রাণ যদিও জমি, বাড়ী এবং টাকা অন্যের, আর চাঁদাতেই চলে আশ্রম, তবু উৎপলাকে প্রধানা সম্পাদিকার আসন থেকে টলান যায় না।

—নিশ্চয় না—তবে উৎপলার সঙ্গে আলোকের অবৈধ সম্পর্কের মিথ্যা কথাটা কানাঘুষায় প্রকাশ করে ওদের কান পর্যন্ত পৌঁছাতে পারলে উৎপলা নিজেই ওকে তাড়িয়ে দেবে।

—না—উৎপলা নিশ্চয় কানাঘুষা শুনেছে—মিঃ মাকু জোর দিয়ে বললেন—আমার স্ত্রীই সেদিন বলছিলেন—'তুমি ওখানে আর যেও না বাপু; কি সব কেলেঙ্কারী হয় তোমাদের আশ্রমে!'—কথাটা বাড়ীতে এসেও তিনি শুনেছেন, আর উৎপলা নিত্যদিন এখানে এসে ওকথা আজো শোনে নি—এমন বিশ্বাস করবার কোনো কারণ নেই!

—হয়তো শুনেছে—মিঃ গায়েন বললেন—শুনেও ওকে যদি না তাড়ায় উৎপলা, তাহলে বোঝা যাচ্ছে—ওকে আর তাড়ানো যাবে না—এখন অন্য উপায় দেখতে হবে।

—কি? মিঃ মাকু অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে উঠলেন উপায়টা শুনবার জন্য!

—জানেন তো, বিকাশের সঙ্গে উৎপলার খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল একদিন। বিকাশ চৌধুরী—কিছুদিন কমিউনিষ্ট হয়ে মজুরদের সঙ্গে মিশে লালঝাণ্ডা উড়ালো; তারপর সোস্যালিষ্ট হয়ে কি যেন একটা দলে যোগ দিল—এখন আবার পুরো দেশ সেবক হয়ে বিশেষরকম ব্যক্তি হয়ে উঠেছে—খুব সম্ভব আরো বড় হবার আশা করে। বাড়ী গাড়ী তো করেছে অনেকদিনই, এখন একটা ব্যাঙ্ক খুলেছে আর হাজার খানেক বিঘে জমি কলকাতার ধারে পাশে কিনে নগরপত্তন আরম্ভ করেছে দেশের বাস্তুহারাদের জন্য—মানে, কোটিপতি হয়ে উঠেছে এর মধ্যে। ওকেই এনে কমিটির কোনো একটা বিশেষ পদে বসাতে হবে!

—তাতে আমরা 'গেইন' করবো কি? তারই ছায়াতে আমরা সকলেই পড়ে যাব যে।

—না—মিঃ গায়েন দৃঢ়স্বরে বললেন—যে ঘরে একটা প্রদীপ জ্বলছে, সেই ঘরে আরো উজ্জ্বল অন্য প্রদীপ জ্বেলে দিলে আগের প্রদীপটা নিষ্প্রভ হয়ে যায়—কিন্তু ঘরের আসবাবের তাতে খোলতাই বাড়ে।

—আমরা তাহলে আসবাব ?—মিঃ মাকুর কণ্ঠস্বরে দুঃখের অভিব্যক্তি।

—আপনি কি এই বয়সেও আসবাব না হয়ে উৎপলার আপনজন হতে চাইছেন নাকি ?

মিঃ গায়েনের কণ্ঠস্বর শ্লেষের রসে তিক্ত, কিন্তু অনেকসময় মানুষ তিক্ত রসও উপভোগ করে, নিমপাতা, পলতাপাতা ভেজে খায়। মিঃ মাকু বললেন,

—বয়স মাত্র ছত্রিশ ; উৎপলারই বা কম কি ? তবে আমি ওরকম কিছু আশা করছি না মিঃ গায়েন—আমার এমন রূপগুণ কিছু নাই।—মিঃ মাকুর কথায় লজ্জার জড়িমার সঙ্গে বিনয়ের অভিনয় সুস্পষ্ট। মিঃ গায়েন হাসলেন ; তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে বললেন,

—বিকাশের সঙ্গে উৎপলার নৈকট্য ঘটাতে পারলেই আলোক নিবে যাবে। বুঝলেন না—আর যাই হোক, আলোক গরীব—ওর ভিটে-মাটি কিছু নেই।

—কিন্তু উৎপলা স্বয়ং ধনী—যুদ্ধের সময় অনেক টাকাই জমিয়েছে সে !

—তা হোক মিঃ ম্যাক্কু, সে টাকা কলসীর জল, খরচ করলে কদিন টিকবে ? আর জানেন, হাই-সোসাইটির কোনো মেয়েই ইচ্ছে করে দারিদ্র্য বরণ করতে চায় না ; বিশেষ উৎপলার মত বেশি বয়সের মেয়েরা।—কিন্তু, এবার চুপ করুন।

গাড়ী উৎপলার বাড়ীর গেটে ঢুকলো। বাড়ীর নাম 'উৎপলকানন'। নামটা আলোকই রেখে দিয়েছিল যখন বাড়ী কেনা হয়—কিন্তু নিজে

আলোক কোনো দিন এবাড়ীতে আসেনি; বাড়ীখানা খুব বড় নয়, তবে খুবই সুন্দর, এবং ওর চারপাশের জমি অনেকখানি—ফুলবাগান, ছোট ঝিল, আউ-বীথি, লন ইত্যাদি আধুনিক কালের রুচিসম্মত বস্তু সবই আছে! মিঃ গায়েনের গাড়ী এসে দাঁড়ালো গাড়ীবারান্দায়। ওঁরা নেমে হলঘরে ঢুকে দেখলেন, কেউ নেই। একটা চাকর জানালো যে সকলেই পিছনের লনে গেছেন পতাকা তুলবার জন্য! ওঁরাও চললেন কথা কইতে কইতে! কথাটা এই রকম;—

—আপনিই প্রপোজ করবেন—'বিকাশকে আমাদের কমিটিতে নেওয়া দরকার—আমাদের আগামী কমিটি মিটিং-এ ওকে মেম্বার করে নিয়ে উচ্চ কোনো পদে নিযুক্ত করা হোক—কারণ, ওর যথেষ্ট বড় হবার সম্ভাবনা রয়েছে—ওকে পেলে বড়লোকের সাহায্য পাওয়া সহজ হবে আমাদের…' কেমন?—মিঃ গায়েন বললেন মিঃ ম্যাকুকে।

—বেশ, আমি প্রস্তাব করবো, আপনি এবং আরো দু'একজন সমর্থন করবেন!

ওদিক থেকে আসছিলেন মিঃ সরকার—"সরকার" উপাধি, অর্থের আভিজাত্য এবং বর্ত্তমান দিনের সাম্য আন্দোলন ওঁকে উচ্চ আভিজাত্য প্রদান করেছে। মিঃ ম্যাকু এবং মিঃ গায়েন ওঁকে কাছে ডেকে পরামর্শটা শুনিয়ে দিলেন। ঠিক সেই সময় এসে জুটলেন মিঃ মণ্ডল। কিছুদিন থেকেই ইনি তাঁর সমাজের পক্ষ নিয়ে আন্দোলন সুরু করে সরকারের আইনসভায় স্থান লাভ করেছেন। ওঁকেও শোনানো হোল সব। পরামর্শ ঠিক হয়ে গেল। কিন্তু আজ এখানে কোনো কমিটি-মিটিং হচ্ছে না; উৎপলা তাঁদের নিমন্ত্রণ করেছে পান-ভোজনের জন্যই। স্বাধীনতালাভ, উৎপলার গৃহপ্রবেশ এবং পতাকা উত্তোলনের উৎসব এক সঙ্গেই হচ্ছে। তবে ভারত যখন স্বাধীন

হোল, তখন আশ্রমের কর্ম্মপ্রণালী—কর্ম্মীসঙ্ঘ ইত্যাদি বিবেচনা করবার জন্য শীঘ্রই কমিটির মিটিং ডাকা হবে। আলোকনাথ বেতনভোগী কর্ম্মচারী—ওর পদের নামকরণ করতে হবে 'হেড-ক্লার্ক'—তার বেশি নয়। এরকম প্রতিষ্ঠানে বেতনভোগী কর্ম্মচারীর মূল্য কি? এখানকার অর্থ মানুষের বদান্যতার বৃত্তি থেকে সংগৃহীত ভিক্ষালব্ধ অর্থ—সে-টাকায় যে-লোক বেতনের ভাগ বসায়, তাকে আবার মানুষ বলা যায় নাকি! আলোকনাথ একশ' টাকা মাইনে পায়—এই একশোটা টাকায় আশ্রমের কত ভাল কাজ হতে পারে। ওঁরা কমিটির অনারারী মেম্বার—নিজেদের অর্থ-সামর্থ্য দিয়ে খাটছেন এই আশ্রমের জন্য—কত মাথা ঘামাচ্ছেন এর উন্নতির জন্য—গাড়ীর পেট্রল পুড়িয়ে যে আশ্রমে যান, তার তেলের দামটুকু পর্য্যন্ত নেন না ওঁরা। কতখানি ত্যাগ যে ওঁরা করছেন এই আশ্রমের হিতার্থে তা কেউ ভাবে কি? আরো চার জন কেরাণী আছে ওখানে—ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট্ যথাক্রমে তাদের বেতন—এ ছাড়া দুটো দারোয়ান, ঝি অপর্ণা—তার ছেলেটা, আর একজন মেট্রণ। ওরা সবাই বেতনভোগী। শিক্ষয়িত্রী আছেন পাঁচজন, সবাই মেয়ে; কিন্তু তাঁরা নারী—মায়ের জাত, তাঁদের সম্বন্ধে আইন আলাদা হবে নিশ্চয়ই।

—বিকাশ বাবুকে ট্রেজারার করবার প্রস্তাবটা আমিই করবো—মণ্ডল সমর্থন কোরো হে!—সরকার বললেন।

—হ্যাঁ—তাতে উৎপলার সঙ্গে বিকাশের ঘন ঘন সাক্ষাতের ব্যবস্থাও হবে!—বললেন মণ্ডল।

হাসলেন সকলেই! একটু দূরে বড় আমগাছটার ছায়ায় বসে রয়েছে আশ্রমের মেয়েরা—শিক্ষয়িত্রীগণও আছেন—এঁরাও এসে দাঁড়ালেন ওখানেই। শিক্ষয়িত্রীদের মধ্যে মিস্ শকুন্তলা সেন রূপসীশ্রেষ্ঠা এবং বিদুষীও। মিস্ মল্লিকা রায়ও রূপসী তবে শিক্ষায় ন্যূন, কিন্তু ককেট্রিতে

উচ্চ স্তরের ; অন্য দুজন শিক্ষয়িত্রী বিধবা—বয়স চল্লিশের মধ্যে। এরা ছাড়া মেট্রণ মিসেস চৌধুরী আছেন—সুলতা চৌধুরী ; আশ্রমের সকলের মাসিমা—বয়স প্রায় পঁয়তাল্লিশ—বেশভূষা ত্রিশের মত—আর কথা বলতে পারেন চমৎকার ভঙ্গীতে। মেজাজ নরম-গরম ; সময় সময় রুক্ষ হয়ে উঠে !

মিঃ মাকু এসেই নমস্কার করলেন এবং বললেন মিস্ সেনকে উদ্দেশ করে,—

—আপনার দাদার সঙ্গে কাল দেখা হোল মিস্ সেন—আপনার খবর শুধোচ্ছিলেন !

—ওঃ, ধন্যবাদ ! কৈ, আপনার স্ত্রীকে যে আনলেন না ?

—না—সে বাড়ীতেই স্বাধীনতার উৎসব করবে ! —মিঃ মাকু বললেন অনুচ্চ কণ্ঠে !

—একা একা উৎসব কি রকম ? মিস্ মল্লিকা রায় হেসে বললো—নাকি আসবেন আর কেউ তাঁর সঙ্গে যোগ দিতে ?

—না, একা নয়, পাড়ার কয়েকটি মেয়েকে নিয়েই ওরা সব পতাকা তুলবে—পাড়াতে যে 'মেঘদূত-ক্লাব' হয়েছে, আমার স্ত্রীই ওটার ফাউণ্ডার প্রেসিডেন্ট কি না—যারেন একদিন, দেখে আসবেন। এই গত আষাঢ়ে ওঁরা 'মেঘদূত' উৎসব করেছিলেন।

—'মেঘদূত' অভিনয় করেছিলেন ?—মিস্ শকুন্তলা শুধুলো।

—হ্যাঁ—না, ঠিক অভিনয় নয়, নৃত্যনাট্য গোছের। উৎপলা দেবী গিয়েছিলেন সেদিন !

—কৈ, আমাদের তো নিমন্ত্রণ করেন নি ?—মিস্ মল্লিকা রায় তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললো—বেশ মশাই—আমরা একেবারে বাদ পড়ে গেলাম ! যাহা !

—না—না, আপনারা বাদ পড়বেন কেন ?—মিঃ মাকু সামলাচ্ছেন—, সে কি একটা কথা হোল! সেদিনকার উৎসবটা হঠাৎ হোল—কার্ড ছাপাবার সময় পাওয়া যায়নি,! আর জানেন তো, আজকাল কোনো সোস্যাল ফাংশন করা কত কঠিন—রেশন কার্ড দেখিয়ে লোককে ঢুকতে দিতে হয়—পঞ্চাশ জনের বেশি খাওয়াবার নিয়ম নেই।

—আপনি তো খাওয়াচ্ছিলেন না—নৃত্যনাট্য দেখাতেন—মিস্ মল্লিকা বললো শ্লেষের স্বরে!

—কিঞ্চিৎ জলযোগের ব্যবস্থাও ছিল—আচ্ছা, আচ্ছা, আগামী রাখীবন্ধন উৎসবে আপনারা অনুগ্রহ করে যাবেন—ওদিনও অভিনয় হবে "বর্ষামঙ্গল!"

উৎপলা অভ্যর্থনা করতে এলো ওঁদের—নমস্কার জানিয়ে বললো,

—আপনারা এখানে দাঁড়িয়ে আছেন, আমি ভাবছি এলেন না।

—আরে বলেন কি—আজকার দিনে না এলে চলে ?—মিঃ গায়েন বললেন!

—যুগান্ত পরে ভারতের স্বাধীনতার উৎসব; আজ না এসে পারি! মিঃ মণ্ডল বললেন।

—দুই শতাব্দী পরে বলুন—মিঃ সরকার সংশোধন করলেন মিঃ মণ্ডলকে। মিঃ মণ্ডল চটছেন তাঁর কথাটাকে ভুল প্রমাণ করার জন্য, কিন্তু রিটায়ার্ড পণ্ডিত মিঃ গায়েন বললেন,

—ঠিক বলতে গেলে প্রায় বারশো বছর পরে—মুসলমান আমল থেকে ভারত পরাধীন।

—না—মিঃ গায়েন—মিঃ মাকু কিছু না বলে থাকতে পারছেন না, কিন্তু বিদ্যা ওঁর বড়ই কম,—তবু বলেই ফেললেন,

—ইণ্ডিয়া ইন্‌ডিপেন্‌ডেন্ট হয়েছে ঠিক ব্যাটল্ অব্ প্লাসী থেকে!

এরা সকলে হেসে উঠলেন কথাটা শুনে; [illegible]
বুঝেই মাকু চেঁচিয়ে উঠলেন—আই-মিন্-ডিপেন্‌ডেন্ট-ডিপেন্‌ডেন্ট্—ও, এক্সকিউস মি—এক্স্…

উৎপলা কথাটা চলতে দিল না। ওঁদের ডেকে নিয়ে চললো। একটি মেয়ে ছাপা কয়েকটা কাগজ বিতরণ করছিল—এখানকার উৎসবের তালিকা, তার সঙ্গে জাতীয় সঙ্গীত এবং উৎপলার নিজের দেওয়া সুরের স্বরলিপি ছাপা আছে ওতে!

মিঃ মাকুর মেজাজ আগেই বিগড়ে গিয়েছিল ওদের ব্যঙ্গ হাসির জন্য। মেয়েটিকে বললেন,

—দিন তো একখানা ফনোগ্রাফ!

সবাই মুখ টিপে হাসছেন।

—আহা—কি বলছি! গ্রামোফোন—ওহো না…

—প্রোগ্রাম—প্রোগ্রাম—প্রোগ্রাম—চেচিয়ে উঠলেন মিঃ মাকু ছোট ছেলের খেলনা পাওয়ার আনন্দে! কি আশ্চর্য্য! 'প্রোগ্রাম' কথাটা কিছুতেই মনে পড়ছিল না ওঁর। নিজের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছেন।

উৎপলা বলল—আসুন মিঃ ম্যাক্‌কু! আপনাদের জন্য আলাদা প্রোগ্রাম রাখা আছে!

অবন্তী মানসিক ব্যথাটা কোনো রকমে সহ্য করে গাড়ীতে উঠেছিল, কিন্তু গাড়ীতে বসে অন্তরের অন্তস্তল থেকে যেন হাহাকার উঠতে লাগলো! বুকখানা চেপে ধরলো অবন্তী। প্রেমের দার্শনিক ব্যাখ্যা শুনবার জন্য সে আলোকের কাছে যায়নি—তার ধারণা ছিল, তার অন্তর-বধূ এমন একটি

লোকের আত্মার সঙ্গে গাঁঠছড়া বাঁধা আছে, যেখানে তার আসন চিরদিনই অবিনশ্বর। আজ সেই অবিনশ্বরতার অচল পর্ব্বত ধ্বসে গেছে!

কানায় কানায় জল ছাপিয়ে উঠছিল চোখে ওর, কিন্তু অবন্তী শুধু সুশিক্ষিতা নয়, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী। পথচলতি রাস্তায় গাড়ীর মধ্যে বসে নিজেকে এমন অসহায়ভাবে কান্নার কোলে সঁপে দেওয়ার দৃশ্য পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই—অবন্তী নিজেকে যথাসাধ্য স্থির করে বাড়ী এসে পৌছাল—কিন্তু বিধাতা আজ তার জন্য কঠোর ব্যবস্থা করে রেখেছেন!

বাড়ী এসেই চিঠি পেল অবন্তী নওকিশোরের কাছ থেকে। চিঠিটা নিশ্চয়ই সিদ্ধেশ্বর লিখেছে, এই আশায় এবং আশঙ্কায় অবন্তী উপরে গিয়ে নিজের ঘরে খিল দিল—তারপর পড়লো চিঠিখানা,—

কল্যাণীয়াসু,

দুই বছরের উপর হয়ে গেল, আমাদের সিদ্ধেশ্বর তোমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করবার স্বীকৃতি দিয়েছে! এক বৎসরের মধ্যেই তুমি তার যোগ্যা সহধর্ম্মিণীরূপে তার অনুগামিনী হবে, এই কথা ছিল, কিন্তু প্রতিশ্রুতির বৎসরান্তে তোমার যোগ্যতা অর্জিত হয় নি—তাই আরো এক বৎসর সময় তোমাকে দেওয়া হয়েছিল। গত রথযাত্রার দিন সে-সময় অতীত হয়েছে! সিধুর তরফ থেকে এবং আমাদের সঙ্ঘের তরফ থেকে আমি আজ জানতে এসেছি—সর্ব্বরিক্ত হয়ে নিজেকে স্বাধীনতার বেদীমূলে উৎসর্গ করতে তুমি প্রস্তুত আছ কি না! তোমার উত্তর আমি তোমার মুখ থেকেই শুনতে চাই—চিঠিতে নয়। আমি ডায়মণ্ডহারবারের গঙ্গাতীর ধরে পূর্ব্বদিকে পুরোনো বাড়ীটার কাছাকাছি বড় গাছতলায় আসন করে অপেক্ষা করবো, তুমি স্বয়ং এসে আমাকে তোমার সম্মতি জানাবে।

সিধু এখান থেকে দূরে আছে—ভাল আছে। কল্যাণাশিস গ্রহণ কর—ইতি—

আশীর্ব্বাদক—কর্ণবিজয় সেন।

অবন্তী আশা করেছিল সিধুর চিঠি—পেল কর্ণবিজয়ের চিঠি। ইনি সিধুদের সঙ্ঘের পরিচালক—অবন্তী এঁর নাম শুনেছিল সিধুর মুখে, গতবার যখন সিধু তাকে নিতে এসেছিল। সেদিন ছিল অবন্তীর কাশী থেকে কলকাতায় ফিরবার দিন। অবন্তীর বাবা বহু অর্থব্যয়ে এই দুর্মূল্যের বাজারেও তাকে বাড়ী তৈরী করে আলাদা থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। কলকাতায় এসে নতুন বাড়ীতে উঠবার কথা; কিন্তু সিধু এসে বলেছিল,—

—কোটি-কোটি ভাইবোন গৃহহারা—আমাদের গৃহপ্রবেশের অধিকার নেই। ওসব ছেড়ে তুমি চলো আমার সঙ্গে যদি অবশ্য আমার পত্নীত্ব তুমি গ্রহণ করেছ বলে মনে কর!—মানুষের নির্মম দুঃখের অবসান না ঘটলে মমতামাখা গৃহজীবন আমাদের সহ্য হবে না অবন্তী; আমরা ঘর-ছাড়া, লক্ষ্মীছাড়া।

—আমি অতখানা ত্যাগ করবার মত নিজকে এখনো প্রস্তুত করতে পারি নি সিধুদা।

অবন্তী বলেছিল—কেন বলেছিল, তা জানে অবন্তী। বলিয়েছিল ওর বাবা, ওর দাদা—কিন্তু অবন্তীই বলেছিল কথাটা; ইচ্ছে না থাকলে সে নিশ্চয় ও-কথা বলতো না কারো প্ররোচনায়; যে প্রয়োজনের তাগিদে অবন্তী স্বীকার করেছিল সিধুকে স্বামী হিসাবে সে প্রয়োজনের অবসান ঘটেছে—তার সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার কয়েক ঘণ্টা পরেই মারা যায়!

মারা যাবে, একথা যদি জানতো অবন্তী, তাহলে সিধুকে স্বামী স্বীকার করবার কল্পনাও সে করতো না! কিন্তু মানুষ ভবিষ্যৎ জানবার অধিকারী নয়। তবুও কাশীর কলঙ্ক কাশীতেই ধুয়ে-মুছে—পরিষ্কার হয়ে এসেছে অবন্তী, পবিত্রও হয়েছে বলে অন্য সকলে মনে করলেও অবন্তীর কোথায়

যেন বাধে! ওর মা—সেই মহীয়সী মানবী-রূপিণী দেবী সেদিন উপদেশ দিয়েছিলেন,

—যাকে স্বামী বলে স্বীকার করেছিস অবন্তী, তার ধর্ম্মই তোর ধর্ম্ম—, তার সঙ্গে গিয়ে গৃহজীবন যদি নাই পাস্—অরণ্যচারিণী সীতার মত সুখের জীবন পাবিই!

কিন্তু সীতার জীবন মোটেই সুখের জীবন হতে পারে নি—অবন্তী ভেবেছিল, সিধু স্বামী আছে—থাক, তার সঙ্গে কোথায় রণে-বনে-বিজনে বেড়াবে অবন্তী? এতো তরুণ জীবনে অতখানা কৃচ্ছ্রসাধনা সম্ভব নয় তার পক্ষে। তারও চেয়ে বড় কথা—অবন্তী এই কয় বছরে বিলাস-জীবনে অত্যন্ত বেশি রকম অভ্যস্থ হয়ে গেছে—মাথার বালিশ একটু শক্ত হলেই সে ঘুমুতে পারে না—বিছানায় শুয়ে ভোরবেলা চা না পেলে সে ঘুমের জড়তা কাটাতে পারে না—খালি পায়ে পাঁচ মিনিটের পথ চলতে পারে না। ভোগ এবং বিলাসের প্রচুর উপকরণ তার আয়ত্তে—এই সব ছেড়ে সিধুর সঙ্গে বনে জঙ্গলে ঘুরে স্বদেশী করে বেড়াবে—এতখানা আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত হতে পারেনি সে সেদিন এবং হয়তো আজও পারে নি!

প্রেমের প্রভাবে মানুষ সুদুঃসহ দুঃখ-বেদনা সইতে পারে, সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে পথে বেরুতে পারে—কিন্তু সিধুর সঙ্গে অবন্তীর যোগ তো প্রেমের পথে নয়, কামের পথেও নয়—সে যোগ প্রয়োজনের পথে! অবন্তীর ইংরাজি শিক্ষা, আচারের অ-নৈষ্ঠিকতা, আর অন্তরের ভোগস্পৃহা তাকে এই চিন্তাই করালো, তবু অবন্তীর সংস্কৃত মনে যে অগাধ শ্রদ্ধা রয়ে গেছে সিধুর ঔদার্য্যের মহিমার প্রতি, সেটা আজো আছে তেমনি অবিচল—; মানুষের রক্তে এই শ্রদ্ধার অর্ঘ্য অনস্বীকার্য্য, অনতিক্রমণীয়।

কিন্তু শ্রদ্ধা প্রেম নয়—শ্রদ্ধা, স্নেহ-ভালবাসা যে কোনো ব্যক্তিকে যত খুশী দেওয়া যেতে পারে—প্রেম দেওয়া যায় মাত্র একজনকে, সে অন্তরের অন্তরতম, আত্মায় আত্মীয়—অনন্ত জীবনের অদ্বিতীয় সহচর!—কে সে? কোথায় সে? অবন্তী ভেবেছিল সেই দিন—ওর সর্বেন্দ্রিয় থেকে উত্তর এসেছিল—'আলোকনাথ'।

কিন্তু আজ?—অবন্তী বালিসটা বুকে চেপে ধরলো, চোখের জলে ভিজে গেল ওর গণ্ডদেশ। কতক্ষণ এমনিভাবে পড়েছিল অবন্তী, কে জানে, হঠাৎ ওর মনে পড়লো, কর্ণবিজয়ের লোকটাকে জবাব দিয়ে বিদায় করতে হবে। কি বলবে, ঠিক করতে পারছিলো না অবন্তী প্রথমটা, তারপর ঠিক করলো, গৃহসুখ তার অদৃষ্টে নাই—কর্ণবিজয়ের সঙ্গে সে আজ গৃহত্যাগ করে যাবে সিধুর কাছেই। সিধু সন্ন্যাসী—হয়তো ফেরারী—হয়তো আরো ভয়ানক কিছু—তবু সিধু তার স্বামী—স্বামীই! বিবাহিত না হলেও অবন্তী স্বীকার করেছে সিধুকে স্বামী বলে—তার কাছে যেতে অবন্তীর কোথাও বাধা নেই! সিধু নিজে নিতে এলে খুবই ভাল হোত, কিন্তু তা না হোক—অবন্তী তার গুরুর সঙ্গেই গৃহত্যাগ করবে। ভারত স্বাধীন হয়ে গেল—সিধুর দল যদি সরকারের কাছে অপরাধী থাকেই, তাতেও আর কিছু এসে যাবে না; সে সরকার তো নাই আর এখন। আজ স্বাধীন-ভারতে স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হোল! অবন্তী সিধুকে ফিরিয়ে আনবে, গৃহজীবনে অভ্যস্থ করবে—এবং আলোকনাথকে দেখিয়ে দেবে—অবন্তী অন্ধকারেও বেঁচে থাকতে পারে! হোক সে জীবন প্রেম-হীন—আলোক হীন—আনন্দহীন! অবন্তী নেমে কিশোরকে বললো—সে যাবে!

কিন্তু "যাবে" কথাটা বলতেও অবন্তীর গলার স্বর আটকেছিল দুতিন-বার। একা সে কিভাবে যাবে—পথের দূরত্ব—সন্ধ্যা—রাত্রি ইত্যাদির মহড়া দিয়েও শেষটায় জানিয়ে দিল, সে যাবে। তার ঐ অসংলগ্নতার মূলে

ছিল তার না-যাবার ইচ্ছা, কিম্বা যাবার উগ্রতা—জানেন মাত্র মানুষের অন্তর্যামী!

কিশোর চলে যাবার পর অবন্তী অনেকক্ষণ চুপকরে দাঁড়িয়ে রইল চন্দ্রমল্লিকার টবটার কাছে। অনেকগুলো ফুল ফুটে রয়েছে গাছটায়, সুন্দর সোনারবরণ ফুল—সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ বস্তু—না-না-না,সৃষ্টির শ্রেষ্ঠবস্তু মানুষের অন্তর,—ফুলের থেকে সুন্দর—ফুলের থেকেও সুগন্ধী—কিন্তু অনেক সুন্দর ফুলের মধ্যেও বিষ থাকে—মানুষের অন্তরেও থাকে—যেমন আলোকের অন্তরে। অবন্তীর মনটা আলোকের বিরুদ্ধে উদ্যত অস্ত্র-ঝঙ্কার শুনাচ্ছে—; বিষ থাকে; বিষ আবার ঔষধ হয়—মধু থেকেও মূল্যবান ওষুধ নাকি বিষেই তৈরী হয়—বিষই অমৃত স্বরূপ,—তাহলে আলোকের অন্তরের বিষ কি অমৃতময় ঔষধের ক্রিয়াই করবে অবন্তীর মনে?—শাণিত অস্ত্রগুলো সুগন্ধী ফুলে রূপান্তরিত হচ্ছে।—আলোক সব সময়েই আলোক, দীপরূপে, দাবানলরূপে—বহ্নিরূপে, বজ্ররূপেও আলোক দাহন করে কাতরতা, দান করে জ্যোতির্ময়তা, দীপ্ত করে বিশ্বপ্রাণ—অবন্তীর দু'চোখে দুইবিন্দু জল টলমল করতে লাগলো!

আর্তস্বর অবরুদ্ধ ওর বক্ষের পিঞ্জরে, অবন্তী আবার গিয়ে বিছানায় লুটালো,—'আলোকদা, তোমার বধূত্বের যোগ্যতা আমি বহুদিন হারিয়েছি; কিন্তু তোমার অন্তর থেকে আমি নির্ব্বাসিতা—এ সত্য আমি অনুভব করালাম আজই।' অবন্তীর উপাধান অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠতে লাগলো! বহুদিন ও কাঁদে নি—এমন কি জীবনের কঠিনতম বিপর্য্যয়কে ও হাসিমুখে অগ্রাহ্য করে চলেছিল—নৃত্যে—সঙ্গীতে, সাবলীলতায়—সখা-সাহচর্য্যে। দেহগত ভোগ আর মনোগত কামনার উগ্রতাকে অতিমাত্রায় জলন্ত রেখে অস্বীকার করে এসেছে সে তার আত্মার চৈতন্য-স্বত্বাকে—আজ সেই চৈতন্য শুধু জাগ্রতই হোল না, জলন্ত, দাহকরী। জীবনের সমস্ত

পার্থিবতাকে যেন জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিতে চায়—অপার্থিব আর অনুভূত এক দেহাতীত স্বত্বা তাতে দৃশ্যমান হয়ে উঠছে, যাকে ধরা যায় না—ছোঁয়া যায় না—যেন ছায়ার জ্যোতি অথবা জ্যোতির ছায়া!

কিন্তু বেলা হয়ে গেছে অনেক—আয়া স্নাহারের জন্য অপেক্ষা করে করে শেষটায় সাহস করে ঢুকলো ওর শয্যাগৃহে! আস্তে ডাক দিল,

—হুজুর—বহুৎ বেলা হো গিয়া হুজুর!—নাহানেকো চলিয়ে!

—যাতা হ্যায়—তুম্ যাও!—অবন্তী উত্তর দিয়ে পাশ ফিরল! স্নাহারের ইচ্ছা ওর এতোটুকু নেই—কিছু যে ওর হয়েছে, এসত্য চাকর-বাকরদের জানাবার মত মনের শিক্ষা নয় ওর—আয়া চলে যাবার পর উঠে বেরুলো। চোখমুখ ধুয়ে নিল জলে—তারপর স্নান করে খেয়ে নিল যা-হোক কিছু!

এবার ছুটি—এখন আর কেউ ডাকতে আসবে না! অবন্তী নিশ্চিন্ত হয়ে কিছুক্ষণ ভাবতে পারে। কিন্তু ভেবেই বা কি হবে। আলোকের চিন্তা আর না করে অবন্তী বরং সিদ্ধেশ্বরের কাছে যাবার জন্যই প্রস্তুত হোক্!

প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজন কি এখন আর? কিছু টাকা হাতে নিয়ে যাওয়া দরকার—হাতে নগদ টাকা বেশি নাই; আজ ছুটি, ব্যাঙ্ক বন্ধ। হোকগে—যা আছে তাই নিয়েই চলে যাবে অবন্তী, শুধু মা'কে একটা খবর দেওয়া দরকার। ফোন নাই অবন্তীর বাড়ীতে। কিন্তু পাশেই ডাক্তার নবেন্দু গুহের বাড়ীতে ফোন রয়েছে। অবন্তী বেরুলো ডাক্তারের বাড়ীতে ফোন করবার জন্য।

—আসুন, আসুন মিস্ ·····কি খবর? ডাক্তার সাগ্রহে আহ্বান জানালো।

—একটা ফোন করতে চাই!

—স্বচ্ছন্দে—ডাক্তার সাদরে এগিয়ে দিল ফোনের যন্ত্রটা ওর দিকে!

অবন্তী মিস্ কি মিসেস্ কারো জানা নেই এ পাড়ায়। শাঁখা, নোয়ার রেওয়াজ তো অনেকদিনই উঠেছে এ পাড়ায়, অবন্তী সীমন্তে সিন্দুরও পরে না! সে এখানকার পরিচিত মেয়েদের বলেছে যে সে বাগদত্তা—তার স্বামী বিপ্লব-আন্দোলনে যোগ দিয়ে ফেরার, হয়ত জেলে আছে—বাপের বাড়ীতে সে থাকলে ইংরাজের রুদ্ররোষ বাপের উপরেও পড়তে পারে—এই জন্যই ঝি-চাকর নিয়ে আলাদা বাড়ীতে থাকে! প্রায়ই ওর মা এখানে এসে থাকেন; অবন্তীর একা থাকার দোষটা তাতেই ঢাকা পড়ে যায়। অবন্তী কুমারী রূপেই পরিচিতা। কাজেই এখানকার সকলেই ওকে 'মিস্' বলে—'অবন্তী দেবীও' বলে কেউ কেউ বিশেষ পরিচিত। ডাক্তার ততটা পরিচিত নয়। অবন্তী ফোন করলো,

—হালো—মা—কর্ণবিজয়বাবু, ওঁর গুরু, আমাকে ডেকেছেন দেখা করবার জন্য; আমি যাব মা—দেরী করে তোমাকে চিঠি লিখে খবর দেব!

—কোথায় আছেন তিনি?—মা প্রশ্ন করলেন অপর প্রান্ত থেকে।

—ঠিকানা দিয়ে পাঠিয়েছেন আমায়।—অবন্তী ডাক্তারের সামনে আর বেশী বলতে চায় না—আমি ফিরে তোমার কাছে গিয়ে সব বলবো!

—আচ্ছা, যা তুই! যদি পারিস তো ওকে ফিরিয়ে আনবি—আর না যদি আসে তাহলে থেকে যাবি ওখানেই!—মা আদেশ করলেন!

—আচ্ছা, সে যেমন বুঝবো করবো!—অবন্তী ফোন রেখে দিল!

ডাক্তার অপেক্ষা করছিল। অবন্তীর রূপৈশ্বর্য্যের উপর দৃষ্টি ওর লোলুপ।

—এবার দেশ স্বাধীন হয়ে গেল—বন্দীরা সব মুক্তি পেয়ে যাবে—আর যারা ফেরারী হয়ে আছেন, তাঁরাও আত্মপ্রকাশ করবেন; কি বলেন?

—কি জানি!—অবন্তী আস্তে উত্তর দিল! ডাক্তার আবার প্রশ্ন করলো,

—সুভাষবাবুও ফিরবেন নিশ্চয়! আপনার কি মনে হয়?

—কি করে জানবো!—অবন্তীর কণ্ঠে কোথাও আবেগ বা উৎকণ্ঠা নেই। নিরাশ হয়ে ডাক্তার আবার বললো—আপনার কার সঙ্গে বিয়ে হবার ঠিক হয়ে আছে? তিনি কি চিঠিপত্র দিয়েছেন কিছু?

—না—তাঁদের গুরুদেবের সঙ্গেই দেখা করতে যাব আমি আজ!

—কতদিন আপনি তাঁর অপেক্ষায় আছেন অবন্তী দেবি? আশ্চর্য্য প্রেমের নিষ্ঠা আপনার—আপনারাই দেবী—নারীর এই নিষ্ঠাই দেবীত্ব!

উত্তরে অবন্তী মৃদু হাসলো—হাসির ধন্যবাদ! আস্তে বললো,

—একটু ব্যস্ত আছি ডাক্তার গুহ; এখন যাই—নমস্কার!

বাড়ী এসে সামান্য খানকয়েক জামা-কাপড় আর শ'খানেক টাকা নিয়ে অবন্তী বেরুলো তার গাড়ীতে! বহুদূর পথ—সন্ধ্যার পূর্ব্বে পৌঁছাতে পারলে হয়! গাড়ীর মধ্যে অবন্তী কোনো চিন্তাই করছে না—না আনন্দের, না বিরক্তির। সারা মনখানা অবসাদে আচ্ছন্ন। কোথায় ও যাচ্ছে? কেন যাচ্ছে? কার সন্ধানে? সে ওর কে? কবে তাকে ভাল বাসলো অবন্তী? নাঃ—এ সব ভাববে না অবন্তী। দেশ স্বাধীন হয়েছে; সিধুকে ফিরিয়ে এনে অবন্তী এবার সংসার পাতবে—সুখের সংসার না হোক—স্বামী-পুত্রের সংসার তো পাত্‌তে পারবে সে! কিন্তু সিধু নিজেই কেন ফিরে এলো না—কেন তাকে ডেকে পাঠালো? এখনো কি বিপ্লবের কাজ চালাতে চায় নাকি ওরা? আশ্চর্য্য! অবন্তী ভেবেই পাচ্ছে না, কেন কর্ণবিজয়ের দল এখনো লুকিয়ে রয়েছে। আজ দেশ স্বাধীন—আজ সকলে মুক্ত—তবু কেন ওরা লুকিয়ে?

গোধূলি বেলায় গাড়ী পৌঁছালো এমন একটা যায়গায়, যার পরে আর গাড়ী যাবে না! অবন্তী নেমে একাই চলে গেল নির্দ্দিষ্ট গাছটার দিকে! গিয়ে দেখে, কেউ নাই। তবে কি মিথ্যা সংবাদ! অবন্তী অপেক্ষা করলো প্রায় পনর মিনিট। নাঃ, কেউ এলো না! ফিরলো অবন্তী। দুঃখে ভেঙে পড়বার কথা ওর, কিন্তু মানুষের মন আশ্চর্য্য বস্তুতে গড়া। ওর আনন্দই জাগছে অন্তরে—মুক্তির আনন্দ!

মৃত্যুকে জয় করবার সাধনা করেছিলেন আর্য্য ঋষি,—বর্ত্তমান যুগের আর্য্যবংশধর জীবনকে জয় করবার সাধনায় হতাশ্বাস; জীবন আজ জীর্ণ হয়ে গেছে অন্ন-বস্ত্র-আশ্রয়ের অভাবে শুধু নয়, জীবনকে ধরে রাখে যে ধর্ম্ম, যে মনোধর্ম্ম এবং মানবধর্ম্ম তারই অভাবে ঋষিবংশধরের জীবন আজ জীর্ণ, জরাগ্রস্থ, যন্ত্রনাময়! এই জরা, এই যন্ত্রণা দীর্ঘকাল স্থায়ী ব্যাধির মত তাদের বোধশক্তিকে আড়ষ্ট করে দিয়েছে—তার তীক্ষ্ণতাকে ভোঁতা করে তুলেছে, —তারপরেও যেটুকু আছে, সেটা সহ্যশক্তি—তাই সয়েই যাচ্ছে এরা—অপরের দেওয়া অপমান আর অত্যাচার সইতে সইতে নিজেরাও করছে অপরের উপর সেইরকম দুর্ব্যবহার; শেষটায় এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে মানবধর্ম্ম এবং মনোধর্ম্ম না-থাকটাই যেন মানুষের আদর্শ হয়ে উঠেছে। মানুষ আজ মনুষ্যত্বকে বাদ দিয়ে যে মানব-সমাজ-গোষ্ঠি গঠন করে চলেছে তার শেষ পরিণতি কি? এবং কোথায় হবে সেই পরিণতি? ভারতেই? না—না—না!

কর্ণবিজয় নিজের কথার নিজেই প্রতিবাদ করলেন সজোরে! ভারতের মানুষের এই নীতিহীনতা—এই স্ব'প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ঋষিভূমি ভারতের সর্ব্ব-নিকৃষ্ট কলঙ্ক। এই ভারত তার স্বাত্বিকতায়, তার ন্যায়নিষ্ঠায়,

তার জীবনবেদের অপূর্ব্ব গরীমায় বিশ্বের শ্রেষ্ঠ স্থান ছিল এবং আজও থাকবে—ভারতের মানুষ নিশ্চয় অ-ভারতীয় হবে না! সহস্র বৎসরের পরাধীনতার গ্লানি আজ ধুয়ে গেছে—শতাব্দিকালের বিজাতীয় আচার-পদ্ধতির আত্মনাশা প্রবৃত্তিও ধীরে-ধীরে ঘুচে যাবে—আবার ভারতীয় সাধনার মূর্ত্ত জীবন-বেদমন্ত্র ধ্বনিত হয়ে উঠবে প্রতি ভারতীয়ের অন্তরে—, প্রতি মানুষের আত্মচেতনায় জাগবে, "সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্ম"—সমস্তই ব্রহ্ম স্বরূপ। এই ঐক্যের সাধনাই ভারতীয় সাধনা—ভারতের সাধনা; সর্ব্বজীবে, সকল বস্তুতে ঐ পরম চৈতন্যকে স্বীকার—প্রেমের বন্ধনের মধ্যে তাদের নৈকট্যলাভ—সকলকে আপনার আত্মার একান্ত আত্মীয়রূপে অনুভব করবার শক্তি—ঐটাই ভারতীয় সাধনা! এ সাম্যের সাধনা নয়, —ঐক্যের সাধনা। আত্মকেন্দ্রিক, আত্মসুখপরায়ণ বর্ত্তমান মানব-জগৎ আজ অপরের অন্তরের সংবেদনশীলতা অনুভব করতে অক্ষম হচ্ছে—অপরকে তার বাহ্যপ্রয়োজনীয় বস্তুর মতই মনে করতে শিখেছে—তাই জাগছে তার অন্তরে নিষ্ঠুরতা, ক্রূরতা, গ্রসিষ্ণু মনোবৃত্তি। অপরের অধিকার অপহরণ করতে সে দ্বিধা করে না—কারণ তাতে তার অভাব পূরণ হবার সম্ভাবনা—অপরের জীবন হত্যা করতে তার হাত কাঁপে না—কারণ তাতে তার জীবনে কিঞ্চিৎ নিশ্চিন্ততা লাভ হতে পারে—কিন্তু আর্য্য-প্রজ্ঞা এর বিপরিত কথাই বলেছেন,

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু, যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ॥

জলে, অগ্নিতে নিখিল বিশ্বভুবনে যে দেবতা অনুপ্রবিষ্ট হয়ে রয়েছেন—আমাতে তোমাতে এবং অন্যেতেও যিনি বিরাজিত—তাঁকে বারবার প্রণাম! একেই বলে ঐক্য!

একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ
সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ॥

তিনিই সর্ব্বব্যাপী—সকল সৃষ্ট বস্তুর অন্তরাত্মা—কর্ম্মপ্রেরণার দাতা, চৈতন্যময় নিখিল প্রপঞ্চের সাক্ষী—নিঃসঙ্গ এবং মানুষের আরোপিত সকল গুণরহিত! এইটাই ঐক্যের ভিত্তি—একে বাদ দিয়ে যা-কিছু মনুষ্যসমাজে সমষ্টিগত ভাবে করা হচ্ছে, তা ঠিক ভিত্তি বাদ দিয়ে প্রাসাদ নির্ম্মাণের মতই নিরবলম্ব! এইজন্যই দীর্ঘ পঁচিশ বছরের বিপুল শিক্ষার পরেও, প্রচারের অনন্ত আড়ম্বরের মধ্যেও অহিংসার উদাত্তবাণীর অমিত শক্তিকে অস্বীকার করে মানুষ মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় নৃশংস হয়ে ওঠে—হত্যার কলঙ্কে রক্তাপ্লুত করে দেয় রাজপথ-প্রাসাদ-মন্দির কুটির-কারাগার! —এতেই বোঝা যায়—মানবকল্যাণকর প্রচেষ্টার, প্রতিষ্ঠানের বা প্রচারের পেছনে এই সত্যপ্রত্যয় নেই!—এ প্রত্যয় শুধু ধী দ্বারা অর্জিত হয় না—শুধু বুদ্ধি-বৃত্তিতে একে বোঝা যায় না—অন্তরের নিবিড় অনুভূতির আবেগেও একে ঠিকমত প্রতিষ্ঠা করা যায় না—কারণ দেহ এবং মনের অসংখ্য বৃত্তি এর বিপক্ষে—মানুষের সাধারণ জিঘাংসা-বৃত্তিই এর বিরুদ্ধে, লোভ-কাম-দ্বেষ এর প্রতিকূলে।

তাই গীতা বলেছেন—

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥
আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমোমতঃ॥

এর থেকে বেশি সাম্যবোধ বা সাম্যবাদ পৃথিবীর কোনো জাতি কি আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে ?—কর্ণবিজয় সুদীর্ঘ নিশ্বাস মোচন করলেন। বুকখানা ব্যথাতুর হয়ে উঠছে—কিন্তু আজ ভারত থেকে ইংরাজ বিদায় নিল! দুঃখের আর কারণ নেই। অবিলম্বে হয়তো এই ভারত আবার বিশ্বের গুরুর আসন গ্রহণ করবে—কিন্তু সে কবে ? কেমন করে ? কার সাধনায় ? এই নৈতিক মেরুদণ্ডহীন প্রভুত্বপরায়ণ, আত্মসুখসর্ব্বস্ব মানব-মণ্ডলীর মধ্যে কে সেই মহাজন ?

চিন্তা করতে করতে চলছিলেন কর্ণবিজয়। জঙ্গলটা শেষ হোল ; গভীর অরণ্য পার হয়ে এলেন তিনি—পথ পরিচিত, তাই অসুবিধা ঘটে নি। কিন্তু শ্বাপদের ভীতি সর্ব্বত্র এ দেশে ; অবশ্য শ্বাপদের মুখে প্রাণ দেবার মত দুর্ব্বল নন উনি—সশস্ত্র এবং সাহসী তিনি চিরদিনই! অরণ্য পার হয়ে এসে পৌঁছালেন নদীতীরে! এখানে একটি কুটীর ; অভ্যন্তরে আলো জ্বলছিল ; উনি আস্তে ডাক দিলেন,

—নির্ম্মলা!

একটি বিধবা যুবতী দরজা খুলে দিল! বয়স বাইশ তেইশ—বর্ণ গৌর—মুখশ্রীও মন্দ নয়—আভরণহীনা এবং আত্মসমাহিতা! দরজা খুলে শুধুলো,

—কোনো বিপদ হয় নি তো দাদা ?

—বিপদই মানুষকে সম্পন্ন আর শক্তিশালী করে নির্ম্মলা! বিপদে পড়েই এতখানা পথ এই রাত্রির অন্ধকারেও অবাধে চলে এলাম। উনি হাসলেন কথা বলতে বলতে!

—শক্তিশালী হয়তো করে বিপদ, কিন্তু সম্পন্নও করে কি ?—নির্ম্মলা প্রশ্ন করলো।

—হ্যাঁ, করে। মানুষ জন্তুর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য পাথরের অস্ত্রে সম্পন্ন হয়েছিল—উদরের জ্বালায় বিপদ এড়াতে কৃষিজাত

শস্যে সম্পন্ন হয়েছিল; পারলৌকিক বিপদ এড়াবার জন্য যাগ-যোগের বিভূতিতে ঐশ্বর্য্যবান হয়েছিল। বিপদ আছে বলেই মানুষ সম্পন্ন হয়—জার্ম্মাণীর যুদ্ধ-বিপদ থেকে আত্মরক্ষার জন্যই আমেরিকা এ্যাটোম্ বোম্ আবিষ্কার করে সম্পন্ন হোল—আবার রাশিয়া নিজকে সম্পন্ন করে তুলছে ঐ একই বিপদের ভয়ে। বিপদের ভয়েই মানুষ সম্পন্ন হয়, সঞ্চয় করে, শক্তি সংগ্রহ করে। কিন্তু যাক সে কথা—ভারতের স্বাধীনতা-উৎসব দেখে এলাম মহানগরী কলিকাতায়। উঃ, কি বিরাট সমারোহ! কি উচ্ছ্বাস-সমুদ্র!

—কিন্তু এই স্বাধীনতা কি সত্যিই গণ-স্বাধীনতা?—নির্ম্মলা প্রশ্ন করলো আস্তে! কর্ণবিজয়ের জন্য কিঞ্চিৎ দুধ গরম করছিল সে উনুনে খবরের কাগজ জেলে! কর্ণবিজয় ওর প্রশ্নটার উত্তর অনেকক্ষণ দিলেন না, তারপর ধীরে ধীরে বললেন,

—গণ শব্দটা আধুনিক নয়—অত্যন্ত প্রাচীন—অতিশয় স্থূল—আর অতি মাত্রায় দীর্ঘসূত্রী! ওর দেহ বিরাট কিন্তু মস্তিষ্ক তদনুপাতে ক্ষুদ্র—কান প্রকাণ্ড কিন্তু চোখ নিতান্ত ছোট—ও শুধু শোনে, দেখে কম; ওর বিরাট দেহ—নাড়াচাড়া করতে সময় লাগে অনেক—ওর মুখ বড় হলেও উদর পূরণ করে খেতে ওর বাধা ওর লম্বা নাসিকা—যাকে শুঁড় বলা হয়। এই ঘ্রাণেন্দ্রিয় দিয়েই ও হাতের কাজ চালায়—মাথায় কাজও চালায়, অর্থাৎ শোনা আর শোঁকা সব কিছুই সত্য বলে ভেবে নেয়—এই স্থূল, মন্থর জীবটির মাথাটা কেটে এনে ওদের ঈশ অর্থাৎ রাজার মাথায় বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, যার নাম গণ+ঈশ=গণেশ!

নির্ম্মলা হাসছে ওঁর কথাগুলো শুনতে শুনতে; কিন্তু কর্ণবিজয় বলে চললেন,

—গণশক্তির এই দেবতাটি যতখানি স্থূল, ততখানি মন্থর আর তেমনি দীর্ঘসূত্রী। ব্যাসদেবের পুঁথী লিখতে এসে তিনি বললেন—তিনি কোন

সময়ই থামবেন না—অবিশ্রাম লিখে যাবেন—অবশ্য অর্থ বুঝে তবে লিখবেন। কূটবুদ্ধি ব্যাসদেব এমন এমন শ্লোক বলতে লাগলেন যা বুঝতে ব্যাচারা গণেশের যথেষ্ট সময় যেতে লাগলো—গণের রাজা হলে কি হবে, মাথাটা তো হাতীর—ওদিকে ব্যাসদেব কূটনীতির শ্রেষ্ঠ—রাজনীতির রাজা,—ধর্ম্মনীতির বেত্তা!

—কী আপনি বলতে চাইছেন দাদা?—নির্ম্মলা দুধের বাটিটা দিয়ে প্রশ্ন করলো।

—বর্ত্তমান গণজীবনকে দিয়ে মহাভারত লিখিয়ে নেবার জন্য বহু ব্যাসদেব আবির্ভূত হয়েছেন—বেগারে কাজ করিয়ে নেন তাঁরা গণেশকে দিয়ে—আর যখন গণেশ বুঝবার জন্যে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে থাকে, তখন তাঁরা কূটতম শ্লোক ঝেড়ে বলেন—'বোঝ বাপধন, কি বললাম, বোঝ এবন!'

—কিন্তু আমি শুধোচ্ছিলাম—এ স্বাধীনতা গণ-স্বাধীনতা হবে কি না!

—গণ কোনোদিন স্বাধীন হয় না নির্ম্মলা দিদি—গণ চিরদিনই পরাধীন! নিজের দেহ নিয়ে নড়তেই যার ছ'মাস, নিজের ছোট চোখের দৃষ্টি দিয়ে দেখে' বনের কয়েকটা ঝোপঝাড়কেই যে পৃথিবী ভেবে রেখেছে, তার আবার স্বাধীনতা কোথায়? গণ অসাধারণ শক্তিমান, কিন্তু হলে কি হবে—সে শক্তি অপরের অঙ্কুশ-আঘাত না পেকে কার্য্যকরী হয় না। ব্যাসদেব না লেখালে গণেশ লেখে না—কাজেই ব্যাসদেবই স্বাধীন হন, গণ কখনো হয় না! সে গোঁ ধরে, গোঁয়ার্ত্তুমি করে—ব্যাসদেব অঙ্কুশ মেরে দাবিয়ে দেন বা কূটবুদ্ধির শ্লোকে ভুলিয়ে রাখেন তাকে পশুশালার কৃত্রিম অরণ্যের মধ্যে—অনেক সময় হয়তো উচ্ছৃঙ্খল হবার সুযোগ দেন—তারপর গণশক্তি নিজেদের মধ্যেই কাটাকাটি করে ঠাণ্ডা মেরে যায়; ব্যাসদেবরা তখন সম্রাট হয়ে বসেন!

এই আলঙ্কারিক কথা নির্ম্মলা কতটা বুঝলো কে জানে ; বলল,

—সিধুদার বৌ-এর সঙ্গে দেখে হোল দাদা ? কেমন মেয়েটি ?

—না—দেখা হয় নি—দুধের বাটিটা নামাতে নামাতে কর্ণবিজয় বললেন !

—কেন ? আপনি যান নি ওখানে ?

—যাবার উপায় নেই। আমার নামে তিনটে বডি-ওয়ারেন্ট্। ইংরাজ গেল কিন্তু ইংরাজের বদলে যাঁরা রইলেন—তাঁদের আইন কি হবে, এখনো জানা যায় নি ! আমার মনে হচ্ছে, সেই ইংরাজের আইনই চলবে ; আইনকর্ত্তারা যতদিন না বুঝবেন যে আইনের জন্য মানুষ নয়, মানুষের জন্যই আইন—ততদিন পৃথিবীর কারাগার পূর্ণ থাকবে অনেক নিরপরাধ মানুষের দ্বারা।

—না দাদা—এ আপনি কি বলছেন ?—নির্ম্মলার কণ্ঠে বিস্ময় !

—রুদ্ররূপী মহাকাল প্রমাণ করছেন নির্ম্মলা—মানুষের জগতে শান্তি, সাম্য, সুখ আসতে এখনো বহু বিলম্ব—হয়তো কোনো দিনই তা আসবে না।

—কেন দাদা ? মানুষ কি কোনদিনই শান্তির অধিকারী হবে না ?

—মানুষের গোষ্ঠিগত জীবনে যেমনটি ঘটলে বৈষম্য বা বিরোধ না জাগতে পারে—তার বহু অন্তরায় মানুষই সৃষ্টি করেছে নিজে—তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে, মানুষের জাতীয় চেতনার আত্মম্ভরিতা,—ভোগের অপ্রচুরতার মধ্যে ব্যক্তিগত ভোগের বাহুল্য ; আপন দেশ বা সংস্কার-সংস্কৃতির রক্ষণের জন্য অত্যধিক উগ্রতা ; আর সকলের উপর রয়েছে মানুষের গ্রসিষ্ণু মনোবৃত্তি ; অপরকে গ্রাস করে নিজকে পুষ্ট করার অভিপ্রায় ! মানুষের এই বৃত্তিগুলো আরণ্যক শ্বাপদবৃত্তিরই তুল্য—অর্থনীতি, রাজনীতি আর ধর্ম্মনীতির মধ্যেও মানুষ তার এই বৃত্তিকেই পরিচালিত করছে। এর বিরুদ্ধেও একদল

মানুষের মনোবৃত্তি উদ্যত রয়েছে মানবধর্ম্মের অনুশীলনের লক্ষ্যে, কিন্তু, যুযুৎসু মনোবৃত্তিই যে উগ্র আর ব্যাপক হয়ে উঠছে, সেটা অস্বীকার করার উপায় নাই। আর এই ধ্বংসকরী-স্বভাবের আনুকূল্য করছে মানুষেরই মনীষা আর বিজ্ঞান। আজ ভারতবর্ষের পরাধীনতা থেকে মুক্তি এবং তারই সঙ্গে ভারতের দ্বিধা বিভক্ত হওয়া—এই স্বাতন্ত্র্যবোধের এবং বৃত্তিরই বিকাশমাত্র। এই যেখানটায় আমরা বসে আছি, এ যায়গাটা পাকিস্তানে কিম্বা পশ্চিমবঙ্গে পড়বে আজ আমরা জানি না—কিন্তু এটা জানি যে বাংলা আর এক নয়, দুই—আসাম বিচ্ছিন্ন, হয়তো, বাঙ্গালার কাছে পরদেশ হয়ে উঠবে অচিরে—উড়িষ্যারও সেই অবস্থা! এই মনোবৃত্তির মধ্যে সাম্য বা ঐক্য খুঁজতে গেলে একান্তই নিরাশ হতে হয়—কিন্তু রাত হয়েছে নির্ম্মলা, তুমি শোও গিয়ে।

—হ্যাঁ, যাই; আপনার বিছানা পেতে রেখেছি দাদা, একটু বিশ্রাম করুন!

—তুমি কি ঠিক ভেবেছিলে, আমি আজই ফিরবো?

—হ্যাঁ—আপনি তো বলেই গেছলেন যে অবন্তী দেবীকেও সঙ্গে আনতে পারেন!

—না—সে হয়তো আসবে আমার সঙ্গে দেখা করতে, আমিই বিশেষ কারণে অপেক্ষা করতে পারলাম না তার জন্য! তার কাছে আবার আমায় যেতে হবে নির্ম্মলা—নইলে সিধুর কর্ত্তব্যের ত্রুটি হয়ে যায়!

—সিধুদা কি এখন ফিরতে পারবেন না?

—না—তার উপর ওখানকার সংঘের সব ভার রয়েছে। ধর্ম্মনীতির ভেতর দিয়ে ঐক্যের প্রতিষ্ঠাই আমাদের সংঘের উদ্দেশ্য হবে এবার থেকে। দেশ এখন স্বাধীন হোল—আমাদের কাজ বেড়ে গেছে বিস্তর!

—আমাদের সংঘের এই উদ্দেশ্য তো কারো বিরুদ্ধে যাচ্ছে না দাদা?

—সে উদ্দেশ্যের লক্ষ্যপথে আমরা তো এখনো চলিনি বোনটি! আমরা সর্ব্বাগ্রে চেয়েছিলাম স্বাধীনতা—সেটা এলো—যেমন করেই হোক, এল। যিনি আনলেন তাঁকে নমস্কার—কিন্তু যাঁরা রাখবেন এই স্বাধীনতার বিজয়-মুকুটকে তাঁদের এখনো চিনি না আমরা! কে জানে তাঁরা গণতন্ত্রবাদী কিম্বা ধনতন্ত্রবাদী অথবা অধ্যাত্মতন্ত্রবাদী হবেন—আত্মতন্ত্রবাদীও তো হতে পারেন!—হাসলেন একটু কর্ণবিজয়,—বললেন,—দুর্নীতির বন্যাস্রোত, হিংসার দাবানল—ব্যাভিচারের নরকাগ্নি আজ আক্রমণ করেছে ভারতকে—রাজনৈতিক স্বাধীনতার চেয়ে নৈতিক স্বাধীনতার আজ বেশি প্রয়োজন; কিন্তু রাজনীতির সাহায্য ছাড়াও নৈতিক জীবনকে উচ্চমার্গে পরিচালন করতে পারতেন এই ভারতের যে ঋষিগণ, তাঁদের বাণী আজ উপহাসাস্পদ,—উপেক্ষিত। তাকে আবার জাগাবার কাজ মঞ্চে চড়ে বক্তৃতার বিলাসে বা করতালীর কর্ণ-বধিরকরা আওয়াজে হবে না—সে কাজ বীর্য্যবানের আত্মমহিমার কাজ, আত্মদানের কাজ—আত্মচেতনায় সকলকে উদ্বুদ্ধ করার কাজ—কিন্তু কোথায় সেই মানুষ আজ সারা দেশে? পদাধিকার আর প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্বে-বিরোধে তারা বিদ্বেষী শুধু নয়, বিপথগামী। কর্ণবিজয়ের কণ্ঠস্বর উত্তেজিত কারুণ্যে উচ্চ হতে হতে থেমে গেল, বললেন,

—যাও শোও গে। জীবনের কালরুদ্র জেগে আছেন—সৃষ্টির পর ধ্বংস আর ধ্বংসের পর নবসৃষ্টি তাঁরই কাজ—তিনিই করবেন!

—কর্ণবিজয় শুলেন বিছানায়।

নিজের জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘরটায় ঘুমুচ্ছে আলোকনাথ; রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে—আলোকের ভোরে ওঠা অভ্যাস, কিন্তু গত রাত্রে নানা চিন্তায়

ঘুম আসতে দেরী হয়েছিল—নইলে ও হয়তো এতক্ষণে উঠতো—ঘুমটা ভাঙছে! কিন্তু তখনো তন্দ্রাঘোরে স্বপ্ন দেখছে আলোকনাথ। ভৈরবী-রূপিণী এক নারী ওর সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলছেন—এ তুই কি করছিস্ আলোক! এই কি তোর কাজ? একটা আশ্রমের আওতায় কয়েকটা নিরাশ্রয়া নারীকে যৎকিঞ্চিৎ লেখাপড়া শেখানো, আর তার সঙ্গে কিছু শেলাই-বোনা—সারা মহাভারতের কি উপকার হবে এতে? একাজ ভালো কাজ হতে পারে—কিন্তু একাজ সাধারণ শিক্ষয়িত্রীর কাজ; নিজকে নিশ্চিহ্ন করে কি তুই এই কাজেই আত্মবিসর্জ্জন করবি?

—না-মা-না—আমি এখান থেকে শীগ্রি চলে যাবো!—আলোক উত্তর দিল!

—তোর কাজ মহত্তর, বৃহত্তর—জীবনের রুদ্রকে কালের কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখবার জন্যই তুই জন্মেছিস্ আলোক—আলোকের মত সর্ব্বব্যাপী হয়ে সর্ব্বত্র দর্শনই তোর জীবনবেদ হওয়া চাই—আশীর্ব্বাদ করি, তমো থেকে জ্যোতিতে তোর যাত্রা শুভ হোক—সম্পূর্ণ হোক।

—বাবুজী—এ বাবুজী—উঠিয়ে—এ বাবুজী!

ঘুমটা ভেঙে গেল আলোকের। সুন্দর স্বপ্নটা দেখছিল আলোক, অকস্মাৎ ঘুমভাঙার ধাক্কায় স্বপ্নের আনন্দানুভূতি বাধা পেল—বিরক্তিতে ভরে উঠলো মন—কিন্তু আলোক উঠলো! তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজা খুলে বললো,

—কিশোর! কি ব্যাপার! ছুটে আসছো নাকি?

—হঁ বাবুজী—কিশোর ঘরে ঢুকে হাঁপাতে লাগলো; বসে পড়লো ঘরের মেঝেতে!

—কোথায় ছিলে তুমি কাল? সেই সন্ন্যাসীর সঙ্গেই গিয়েছিলে নাকি?

—জি হ্যাঁ—লেকিন টিকটিকি-লোক উনকো পিছু লিলো। হামি বাঁচা দিলো। জঙ্গলমে ঢুকলো—ঘুর ঘুর পথ ধরকে চলে এলো—বেহালাকো সহরমে আ-গেল রাত বারো-সাড়ে বারো মে—উসকে বাদ··· কিশোর থেমে গেল!

—কি হোল তারপর? —আলোকের কণ্ঠে ব্যগ্র প্রশ্ন!

—হোবে কি বাবুজি—শুনিয়ে; বেহালাকো একতরফ্ মিলিটারী মকান্ বানিয়েছিল না? ওহি তরফ্ বহুৎ মকান্ খালি আছে। হামি সেই মকান্‌মে ঢুকলো—দেখলো, আরে বাবুজি, বহুৎ খারাপ চিজ দেখলো··· কিশোর আবার থেমে রইল কিছুক্ষণ।

—কি দেখলে?

—দেখলো, একঠো লেড়কীকো, আঠার-বিশ উমের, তিনঠো আদমী পাকাড় লে আয়া। একঠো মকান্‌মে ঘুঁষ গেল—হামি সব দেখছে। উ জেনানা বহুৎ চিল্লাচিল্লি করছে। হামি একঠো ডাণ্ডা লে'কর গেলো, আউর মারলো দো ডাণ্ডা একঠো আদমীকো। উ তো পড় গিয়া-- আউর দো আদমী ভাগ্‌লো—লেকিন হামি উ জেনানাকো লিয়ে বহুৎ মুস্কিলমে গিরলো—উনকো পঁহুছানেকো হাম্ যাতা রহা—উস বখত্ উ ভাগনেবালা দুনো আদমী ফিন্ আ-গিয়া ডাণ্ডা লে কর! হামি জেনানাকো পৌঁছা দিয়া উন্‌কো ঘরমে ঠিক ঠিক—লেকিন হামি যব্ ঘুমনে লাগা, ওহি দুনো গুণ্ডাশালা হামকো মারনে আয়া—হাম দৌড় লাগায়া—দেখিয়ে বাবুজি, মাঠ, জঙ্গল, রাস্তা কুছ্ নেহি দেখা, দৌড় লাগায়া, যব্ চৌরঙ্গীমে আয়াথে—উস্ বখৎ দু'নো পুলিশ হামকো পাকাড়নে আয়া—মৎলব হ্যয় কি হাম চোট্টা হ্যায়! হাম গল্লিমে ঘুষ গিয়া—উন্‌লোকভি ঢুড়নে লাগা—বহুৎ ফিকির করকে হাম এত্তা দূর আ-গিয়া—আউর কোন্ শালা হামকো পাকড়ে গা!—কিশোর থামলো।

আলোকনাথ বুঝলো ব্যাপারটা কিছু কিছু! এ রকম অনেক ঘটছে; অসংখ্য! বিশাল মহাসমুদ্রের বুদবুদ কে গুণে শেষ করতে পারে? কে জানে কবে আবার নারীর প্রতি সম্মানবোধ মানুষকে মহান্ করবে! কিশোর অত্যন্ত ক্লান্ত, আর কোনো কথা না কয়ে সে ওখানেই শুয়ে পড়লো—আঃ! বলে একটা শব্দ করলো মাত্র! আলোক দেখলো, ওকে এখন আর ওঠানো যাবে না। সে বেরিয়ে গেল হাতমুখ ধোবার জন্য। ভাবতে লাগলো, যদি পুলিশ কিশোরের পেছনে এতদূর অবধি ধাওয়া করে তাহলে আশ্রমের ঝামেলা বাড়তে পারে, কিন্তু সে সম্ভাবনা কম—কারণ, কিশোরের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে কোনো অভিযোগ পুলিশের কর্ণগোচর হয় নি; এবং কোথাও চুরি ও' সে করেনি—তবে বেহালার ওদিকে যেখানে সে লোকটাকে মেরে এসেছে—সে লোকটা কেমন আছে, কে জানে? সম্ভবতঃ মারা যায় নি, আহত হয়েছে—ভাবতে ভাবতে হাতমুখ ধুলো আলোক; এবার তার কাজের তালিকা দেখে নেবার পালা—কিন্তু গতকাল ছুটি ছিল, আজও তার জের চলেছে; কাজ বিশেষ কিছু নেই। শুধু হুকুম হয়েছে তার উপর যেন আগামী শনিবার ম্যানেজিং কমিটির বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা হয়। কেন এই জরুরী অধিবেশন ডাকা হবে—তাও জানানো হয়েছে, 'স্বাধীন ভারতে এই আশ্রমের কার্য্যাবলী কি ভাবে চলবে, তারই আলোচনা করা হবে মিটিংএ, অবশ্য তার পূর্ব্বে ভারতের এবং বাংলার নবনিযুক্ত লাট ছোটলাটদের এবং মন্ত্রীদের অভিনন্দন জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে! আলোক একখানা ড্রাফ্‌ট লিখে টাইপরাইটারে টাইপ করলো অনেকগুলো চিঠি—খামে মুড়ে ওগুলো পাঠাবে এসে অফিসের কেরানী—আলোক যতটা সম্ভব কাজ এগিয়ে দিচ্ছে—কিন্তু মনে পড়লো, আজ ছুটি—কেরানীরা হয়তো আসবে না—নিজেই খামের উপর ঠিকানা লিখতে লাগলো আলোক। অনেক চিঠি, প্রায় শ'খানেক!

ঠিকানা লিখতে নটা বেজে গেল, কিশোর ঘুমুচ্ছে—হঠাৎ উঠে বসলো—বললো—কেৎনা টাইম বাবুজি ?

—ন'টা—তোমার কোনো ভয় নাই কিশোর—ওঠো ! এখানে কেউ আসবে না !

—ভয় ক্যা হ্যায় বাবুজি !—হাম কিসিকো ডরতা নেহি !—বলে কিশোর উঠে বসলো।

আলোক একটু হাসলো ওর মুখের পানে চেয়ে ; সত্যি ওর ভয়ডর নেই। জীবনে ও রুদ্রকে জাগিয়ে রেখেছে সর্ব্বক্ষণ। অন্ন-বস্ত্র-আশ্রয়ের অভাব পর্য্যন্ত ও কোনোদিন অনুভব করে না—পিতৃ-মাতৃ পরিচয়ের আবশ্যকতা বোধ করে না—ও জানে, ও স্বয়ম্ভু ! হয়তো অযোনি-সম্ভব ! মানুষের জগতের মহিমময় রূপ ওর চোখে কমই পড়েছে—মৃত্যু-পঙ্কিল, ক্ষুধাদীর্ণ—কামাসক্ত মনুষ্যজগতের সঙ্গেই ওর পরিচয় বেশি ! কিন্তু সে-পরিচয় ওর মানুষ-মনকে মলিন করতে পারেনি—এইটাই অতিবড় আশ্চর্য্য ! রুমনী-ঝুমনীর জন্য ও খাদ্য সংগ্রহ করে—অপর্ণার আশ্রয় সন্ধান করে দেয়, মরণাস্ত-আহবের মধ্যেও অন্যের জীবনরক্ষার সাধনায় ও চেষ্টিত,—আততায়ীর হাত থেকে বিপন্না নারীকে বাঁচাবার জন্য ও যায় সর্ব্বাগ্রে এগিয়ে—কে ও ? কোন্ শুদ্ধ পবিত্র রক্তে দেহের-মনের এই মহতো-মহীয়ান বৃত্তির গঠন ? আর্য্যরক্তে—আলোক নিজেই উত্তর দিল নিজের কথাটার—চেয়ে দেখলো, কিশোর হাতমুখ ধুতে গেছে কলতলায়। কোনো শিক্ষা পায় নি, কোনো সংস্কারের মধ্যে ও মানুষ হয় নি, কোনো স্নেহের কোলে লালিত হয় নি—তবু ওর অন্তরে আছে শিক্ষিত বৃত্তি—মার্জ্জিত সংস্কার—অন্যের প্রতি অগাধ মমত্ববোধ। এটা কি ওর বংশানুক্রমিক রক্তধারার প্রভাব—কিম্বা মানুষের স্বতঃ বিকশিত মনের মার্জ্জিত রূপ ! কিন্তু মার্জ্জনা তো কেউ করেনি ওর মনের রূপকে ? মানুষ কি তাহলে স্বতঃই

মার্জিত-মনের প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মায় ? তা যদি হয়, তাহলে গত কয়েক মাসের রক্তপ্লাবন কেন ঘটলো—কেন ঘটছে পৃথিবীর বুকে যুদ্ধের অনিবার্য্য ধ্বংসলীলা ?—তার মূলে আছে মানুষের মনের কৃত্রিম মার্জনার প্রভাব—জাতিগত অহঙ্কার, ধর্ম্মগত বিভেদ—প্রদেশগত বিদ্বেষ—অর্থগত অ-সাম্য, আত্মগত ঔদ্ধত্য। পৃথিবীর সব মানুষই যদি সকল মানুষকে শুধু নিজের মত মানুষ ভাবতে পারতো তাহলে মানুষের সঙ্গে মানুষের এই বিরোধ-বিদ্বেষ নিশ্চয় জাগতো না পৃথিবীতে—কিন্তু না—তা হবার নয়। যুদ্ধ নাকি জগতের স্থিতিশীলতার জন্য একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যাপার !—এই শ্বাপদ-প্রবৃত্তির সুমার্জিত সভ্য প্রকাশ জাতীয়তাবোধ—নিজকে উচ্চতর সভ্যতার অধিকারীবোধ। নিজের জাতির বীরত্বাভিমান—বৈজ্ঞানিক বা শিল্পপ্রতিভার গৌরব—চারিত্রিক মহত্ব—প্রভৃতিতে অহঙ্কারী নয়—এমন জাতি নেই বললেই হয়। বর্ণগৌরব, অঙ্গ-সৌন্দর্য্য, সাহসিকতা—নিজের জন্মভূমির সম্পদ আর সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে অবহিত আর অহঙ্কারী নয়—এমন মানুষও কম। এই সকলের একত্র মিলনে সংগঠিত হয় জাতীয়তাবোধ—আর তার ফলেই জন্মে অপর জাতিকে হেয় প্রতিপন্ন করার আকাঙ্ক্ষা। সাম্রাজ্য-বাদ পৃথিবী থেকে হয়তো এবার বিদায় নেবে—কিন্তু এই জাতীয়তাবাদের নিষ্করুণ শাসন-শোষন থেকে মানুষের মুক্তির উপায় কোথায় ?—আলোক অন্যমনস্কভাবে বাইরে তাকালো !

কিশোর স্নান করে একফালি কাপড় কোমরে জড়িয়ে ওর ছেঁড়া কাপড়খানা শুকুতে দিচ্ছে ! বিবস্ত্র মানবত্বের সুসভ্য অভিব্যক্তি ! আলোক হাসলো—বড়বড় চিন্তা,—বড়বড় বক্তৃতা—জোরালো শ্লোগ্যান বিস্তর শোনা গেছে এই বছর কুড়ি-পঁচিশ ধরে—আলোক জন্মাবধি শুনে এলো। আজ স্বাধীন ভারতের মৃত্তিকায় উড়ছে চক্রচিহ্নিত ভারত-পতাকা ! নেতাগণ অকুণ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করছেন—অবিলম্বে কৃষক-প্রজা-মজদুররাজ স্থাপিত

হবে। আর দেরী নাই ভাই সব, শাসন-শোষণের নৃসংশ বর্ব্বরতার অবসান ঘটলো। হয়তো ঘটলো—কিন্তু গত কালের গুণ্ডাদের হাতে নির্য্যাতীতা নারীর আর্ত্তনাদ ঘুচবে কি কৃষক-প্রজা-মজদুর রাজের ছত্র-ছায়ায়? অযোনিসম্ভব-অপাপবিদ্ধ ঐ বালক কিশোরের আভিজাত্য কি প্রতিষ্ঠিত হবে ঐ কৃষক-প্রজা রাজ্যে। অভাগী অপর্ণার আনন্দ-দুলাল ঐ নিষ্পাপ শিশু-জীবনের জীবন কি জন-মানসে জাতীয় অংশ বলে গণ্য হবে কোনদিন? মানুষ ব্যক্তিগতভাবে যতখানি স্বার্থপর, জাতিগতভাবে ততখানিই—এখানে সাম্য কোথায়? কোথায় সমাজতন্ত্র?

—বাবুজি—হামি আজ বাহির হোবে না—এই জাঘা খাবে—বাবুজি, হুকুম দিজিয়ে।

—খাবে—অপর্ণাকে বলো গিয়ে তোমার রান্নার চাল নেবার জন্য—আলোক বললো!

চাল রেশনের—এমনিতেই কম পড়ে যায়—আতিথ্য করা অসম্ভব। কিন্তু কিশোর আত্মীয় আলোকের। কিশোরকে ও জীবনের সুকঠিন মুহূর্ত্তে পেয়েছিল—আবার হয়তো আসছে তার জীবনে সেই দিন যখন সেও ঐ কিশোরের মতই পথে পথে ঘুরবে! এ চাকরী ছাড়তেই হবে তাকে।

হঠাৎ ভোরে দেখা স্বপ্নটা মনে পড়ে গেল—ভৈরবীরূপিণী মা তার, আলোকেরই মা—জননী তিনি; তিনিই বলছিলেন কথাগুলো—হ্যাঁ তিনিই। আলোকের মানসনেত্রে জেগে উঠলো ভৈরবীর ছবিখানি আবার—মা! এখানে—এই সুখের নীড়ে বাস করবার জন্য—কতকগুলি নারীর সাহচর্য্য করে সময় কাটাবার জন্য, কয়েকটা নগণ্যা বালিকার ককেট্রি আর ফ্লার্ট শুনবার জন্য আলোকের জীবনকে পৃথিবীতে রেখে যাননি তিনি। উৎপলার স্নেহ-মমতা—আগ্রহ-আত্মীয়তা ওকে গোটা তিনটে বছর আটকে

রেখেছে এখানে—আর নয়—এবার যেতে হবে পথে—যে পথ ওর অমরলোকের রাজ্যে যাবার রাজপথ—আলোক নিশ্চিন্ত মনে হাসলো! একখানা পদত্যাগপত্র টাইপ করে সই করে খামে ভরলো—উৎপলার কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে। পদত্যাগের কোনো কারণ সে লিখলো না, শুধু লিখলো—"জীবনের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার আশায় সে পদত্যাগ করছে—তাকে কর্ম্ম থেকে অবসর দিলে কৃতার্থ হবে।" সে জানে, অন্য কেউ দুঃখিত হবে না—হবে উৎপলা। কিন্তু কেন? উৎপলার এ দুর্ব্বলতা কেন তার প্রতি?

নারীমন! দেবাঃ ন জানন্তি!—আলোকের মুখে রহস্যময়তা জাগলো। উৎপলা—ধনবতী, বিদ্যাবতী, অভিজাতা উৎপলা। অভিজাতা? নাঃ, ওর আভিজাত্য শুষ্ক হয়ে গেছে—চূর্ণ হয়ে গেছে; কিন্তু তাতে কিএসে যায়? কত নারী ওর পরেও সগৌরবে অভিজাতকুলের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত রয়েছে। কাঞ্চন-কৌলিন্য—রূপৈশ্বর্য্য—বিদ্যালঙ্কার ওকে ঢেকে রাখতে পারবে চিরদিনই; তবু কেন উৎপলা তাকে এতোখানা নিবিড়ভাবে আশ্রয় করতে চায়? না—ওটা অন্য কিছু নয়—আলোকের উপর সহানুভূতি এবং —আলোক ভাবতে লাগলো—হয়তো কাজ আদায় করে নেবার একটা কৌশল! শেষেরটাই হওয়া বেশি সম্ভব। ওদের যেমন ভালোবাসা—পূজারীদের পাঁঠা পোষা—কাটবার জন্যই পাঁঠাকে ঘাস খাইয়ে মোটা করা হয়—কিন্তু উৎপলার প্রতি অবিচার করছে না তো আলোক? হ্যাঁ—অবিচারই করছে। গত কাল যখন অবন্তী জানাচ্ছিল আলোককে তার অন্তরের আবেগ—তখন তো উৎপলা তাকে স্নেহ শ্রদ্ধার চোখে দেখেই সমর্থন করছিল। প্রতিদ্বন্দ্বিতার চোখে তো দেখে নি? এ মন কোন্ শ্রেণীর মন? এ কি সাধারণ নারীমন, নাকি অসাধারণ মহামানবীর মন!—আলোক চিন্তিত হলেও ঐ কথার সূত্রে অবন্তীর কথাটা মনে এল!

যেতে হবে তার কাছে ; উৎপলাও যাবে বলেছে। তাকে নিয়ে না গেলেই ভাল হয়—কে জানে, কে কোথায় আবার কি ভাববে। আলোক ফোন করলো উৎপলাকে। উৎপলা ফোনে সাড়া দিতেই সে বলল,

—আমি চাইনা যে আপনি আমার সঙ্গে অবন্তীকে দেখতে গিয়ে আবার নতুন কোনো কলঙ্ক অর্জন করবেন—আমি একাই যাব।

—আপনার এই ভীরুতার মূলে আছে আমার জন্য দরদ নয় আলোক বাবু—আমাকে একান্তভাবে অসহায় করে তুলবার চেষ্টা—উৎপলার স্বর কঠোর !

—সে কি ?—আলোক অবাক হয়ে যাচ্ছে কথাটা শুনে।

—হ্যাঁ—আমার বয়স অনেক হোল, আপনার সমবয়সীই হব প্রায়—আর জীবনের অভিজ্ঞতাও আমার কম নয় ; সেই থেকেই বুঝতে পারছি, আপনি চান, আমার সঙ্গে আপনার কলঙ্কটা আরো ব্যাপক হোয়ে উঠুক, এবং বিকটাকার হোক !

—আমাকে আপনি এই রকম হীন মনে করেন !—আলোক প্রতিবাদ করতে চাইছে !

—করি ; অন্ততঃ এখন থেকে করবো ! আপনার সঙ্গে কোথাও যাওয়া আমার পক্ষে আজই নতুন নয়—এবং যে প্রয়োজনে যাচ্ছি, সেটাও অভূতপূর্ব্ব নয়—একটি মেয়েকে সাহায্য করবার জন্যই যেতে হচ্ছে ! দুর্ভাগ্যক্রমে আপনি সেই মেয়েটির সঙ্গে পরিচিত—কিন্তু আপনার পরিচয় ওর সঙ্গে না থাকলেও আমি যেতাম—অবস্থা বুঝে ওর জন্য ব্যবস্থাও করতাম এবং তাই করতে যাচ্ছি !

—ওর কোনো ব্যবস্থা করতে হবে না উৎপলা দেবী, ও ধনীকন্যা, বিবাহিতা—কবে ও আমাকে ভালোবেসেছিল খেলাচ্ছলে, তা মনে না

করাই ভালো। আমি যেতে চাইছি, ওকে বুঝিয়ে বলে আসবো, স্বামীর প্রতি সে যেন নিষ্ঠা রাখে।

—সে কাজটা আমিও করতে পারি—কিন্তু আমি আপনার মত আদর্শবাদী আহাম্মুক নই—মানুষ হিসাবে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা 'loyalty to humanity' আবার জীবনবাদ। মানুষের জীবনের বাস্তবতা আর পাপকে আমি স্বীকার করি; কিন্তু সেই পাপের অনুষ্ঠানকারীর জীবনের যাতনাকে আমি আরো বড় চোখে, আরো সহানুভূতির চোখে দেখতে শিখেছি। কোনো আধ্যাত্মিক তত্ত্বের জন্য নয়, অন্তরের স্বতঃবিকশিত কারুণ্যের বসুধারায় তাকে আমি স্নান করিয়ে দিতে চাই! আমি যাব; আপনি অপেক্ষা করবেন—ফোন ছেড়ে দিল উৎপলা।

আলোক ফোন হাতেই বসে রইল মিনিটখানেক। অপর্ণা এসে ডাকলো—দাদাবাবু, খাবে না! —আলোক উঠে গেল!

অবন্তী অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরে শুয়ে পড়েছিল, ঘুম ভাঙলো পরদিন বেলা ন'টার পর। খুব ঘুমিয়েছে অবন্তী। কে জানে, কেন সে অত ঘুমিয়েছে! মনটা অতিমাত্রায় ক্লান্ত হয়েছিল বলে নাকি? কিম্বা সিধুর সঙ্গে দেখা না-হওয়ার নিশ্চিন্ততায়—অথবা আলোকের জীবন থেকে চ্যুত হয়ে পড়ার বেদনায়—কে জানে! ভাবতে পারলো না অবন্তী কিছুই ঘুমভাঙার পর; কয়েক সেকেণ্ড পরে মনে পড়লো,—নিদারুণ উদ্বেগ নিয়ে সে কাল বহু দূর পথ গিয়েছিল—বহু রাত্রে ফিরে শুয়েছিল—তার পর ঘুমিয়ে গেছে!

উঠে স্নান করতে গেল অবন্তী; চা-জলখাবার তৈরী করছে ওর খানসামা—মেমসাবের উঠতে দেরী প্রায়ই হয়, সে জানে—তাই আজও

বিশেষ কিছু মনে করে নি। কিন্তু অবন্তী স্নানঘরে ঢুকেও রুদ্ধগলায় বললো—তাড়াতাড়ি চা দাও, বেরুতে হবে!

কোথায় বেরুবে অবন্তী? কার কাছে যাবে? ও নিজেই জানে না। কিন্তু মনে পড়লো, মা'কে খবরটা দেওয়া দরকার। ফোন করে দিলেই হবে ঐ ডাক্তারের বাড়ীতে গিয়ে; কিন্তু ডাক্তারটাকে অবন্তী ভাল চোখে দেখে না। কেমন যেন গায়ে পড়া ভাব ওর! লোকটা শিক্ষিত, সুন্দর, মার্জ্জিতরুচি—কিন্তু ঐ রকম। কি মনে করে ও? অবন্তীর যেন কেউ নেই—না স্বামী না-বা সতীত্ব! আশ্চর্য্য! কিন্তু স্বামী আছে নাকি অবন্তীর? সতীত্বও আছে? প্রশ্নটা আগুনের মত জ্বলে উঠলো অকস্মাৎ অন্তরের গোপন গুহায়! তারপরই অন্ধকার হয়ে গেল গুহাটা—কিছুই দেখা যায় না—নিচ্ছিদ্র তমিস্রা!

স্বামী—সতীত্ব—সীমন্ত-প্রান্তের জলন্ত সিন্দুরাগ্নি, যার আলোকশিখায় জীবনের পথ পরিষ্কার ভাবে দেখা যায়—মরণের স্বর্গ মহিমোজ্জ্বল হয়ে উঠে, অবন্তী সে-বস্তু বহুদিন হারিয়েছে।—হারিয়েছে, কিন্তু সিধুকে পেলে সে আবার স্বামী পেতে পারে, সতীও সাজতে পারে—সিন্দুরও পরতে পারে; সিধুর সঙ্গে দেখা না হওয়াটা তার সৌভাগ্য সূচিত করছে, না কি দুর্ভাগ্য জানাচ্ছে? কিন্তু এখন আর উপায় নাই, সিধু অন্তর্দ্ধান করেছে—আর কি আসবে? না—আসার প্রয়োজন নাই তার! অবন্তী তাকে পেলে যা পাবে—তার সবগুলোই মেকী! মেকী সতীত্ব—নিষ্ঠা বা প্রেম তার নেই সিধুর উপর; মেকী স্বামীত্ব, সিধুকে সে ভালবাসতে পারবে না; মেকী সিন্দুর—সে সিধুর বিবাহিতা পত্নী নয়—সিধুর ফিরে না আসাই ভাল তার জীবনে আর!

আলোক চলে গেল—নিবে গেল অবন্তীর জীবন থেকে—এখন অন্ধকার—হাঁ, অন্ধকার! অনিবার্য্য, অন্তহীন—অবিনশ্বর অন্ধকার!

আলোকের উৎসরূপী সূর্য্যও একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে—থাকবে অন্ধকার—চিরতমিস্রা, শাশ্বত—অক্ষয়-অব্যয়-তমোরাজ্য !

গায়ে আরো বেশি করে জল ঢাললো অবন্তী চোখ বুজে ! অন্ধকার ! —শীতল, শান্ত অন্ধকার—মায়ের কালো চুলের মত, মৃত্যুর কালো ডানার মত,—না—অতল জলতলের কালো পঙ্কের মত অন্ধকার—শীতল, কোমল, ক্লান্ত—ক্লেদাক্ত—কিন্তু ঐ পঙ্কই ধারণ করে পঙ্কজকে আপনার সবটুকু স্নেহরস দিয়ে—সে-পঙ্কজ চেয়ে থাকে অনন্ত দূরের আকাশের সূর্য্যের পানে, —আলোকের উৎসের পানে। পঙ্কের মৃত্যুশীতলতা পঙ্কজের জীবনানন্দে স্পন্দিত হয়—অবন্তীরও হতে পারে !

স্নান শেষ করে অবন্তী চা-পান করলো ; তারপর আয়নায় মুখখানা আর একবার দেখে নিয়ে বেরুলো ডাক্তারের বাড়ীর উদ্দেশে। ডাক্তার বসেই ছিলো ; অবন্তীকে দেখেই উচ্ছ্বাসময় কণ্ঠে আহ্বান জানালো,

—আসুন অবন্তী দেবী ! কি খবর ? কাল দেখা হয়েছিল ?

—না—অবন্তী গম্ভীর গলায় জবাব দিয়ে বললো—একটা ফোন করতে পারি ?

—স্বচ্ছন্দে !—ডাক্তার অনুমতি দিয়ে কৃতার্থ হচ্ছে ! অবন্তীর দেহসজ্জা কিঞ্চিৎ ঘোরালো—মুখের দীপ্তি গত কালের থেকে উজ্জ্বল। ডাক্তার আশান্বিত হয়ে উঠছে ! স্নানসিক্ত চুলগুলো দেখছে চেয়ে চেয়ে !

—হ্যালো মা—অবন্তী লাইন পেয়ে ডাক দিল—বললো—দেখা হোল না মা !

—কেন ?—গিয়েছিলি তো তুই ?

—হ্যাঁ—কিন্তু উনি চলে গিয়েছিলেন তার আগেই। আমার যে-সময় যাবার কথা, তার আগেই গিয়েছিলাম।—অবন্তী যেন কৈফিয়ৎ দিচ্ছে মা'কে !

—ভারী ভাবনার কথা বাছা; দেখা হলে তবু যা-হোক একটা ব্যবস্থা হোত!

—আর শোন মা—অবন্তী ও কথা বাদ দিয়ে বললো—আলোকদা কলকাতাতেই আছে!

—কোথায় রে—কোথায় আছে আলোক? তোর কাছে এসেছিল?

—না—হঠাৎ খবর পেলাম!—দেখা হওয়ার কথাটা গোপন করলো অবন্তী।

—দেখা করে আমার কাছে আসতে বল তাকে!

—না, মা;—বলে আর কোনো লাভ হবে না মা। —অবন্তীর কণ্ঠ অকস্মাৎ অত্যন্ত করুণ শোনাচ্ছে!—আচ্ছা মা, আমি বিকালে তোমার ওখানে যাব।

ফোন রেখে দিল অবন্তী অকস্মাৎ। ডাক্তার ওর মুখের দিকে চেয়ে। বলল,—আপনার বাগদত্ত বরের গুরুদেবের সঙ্গে তো দেখা করতে গিয়েছিলেন—তিনি কি সাধু-সন্ন্যাসী নাকি? সংসার ছাড়া মানুষ? তিনিই বুঝি বিয়ের ঠিক করবেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ!

—আপনার হবু-স্বামীর নাম কি আলোকবাবু?

অবন্তী আধ মিনিটখানেক বিস্মিত চোখ মেলে চেয়ে রইল, হাসলো মৃদু, বললো,

—কেন, বলুন তো?

—না, অন্য কিছু না—'আলোক' শব্দটা বলার সঙ্গে সঙ্গে আপনার মুখ-চোখের ভাব আমি লক্ষ্য করছিলাম—আমি মনস্তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করি কি না—হাসলো ডাক্তার।

অবন্তী চুপ করে রইল, কোনো উত্তরই ও দিতে পারছে না। কে তার স্বামী, আলোক না সিদ্ধেশ্বর? কোন্‌টা ওর অন্তরের সত্য কথা? ডাক্তার লক্ষ্য করে বললো হেসে,

—বুঝেছি! মানুষের মুখ দেখে মন চেনা যায়—আলোকবাবু যদি কলকাতাতেই আছেন, তাহলে দেখা করতে বাধা কি আপনার? কোথায় তিনি? জেলের বাইরে?

ডাক্তারের মনস্তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে একেবারে নিরাশ হয়ে গেল অবন্তী। বলল,

—বিয়ের আগে বরের সঙ্গে বারবার দেখা করাটা আমাদের সমাজে চলে না ডাঃ গুহ! আমার স্বামীর নাম আলোকও হতে পারে, অন্ধকারও হতে পারে। অর্থাৎ যতক্ষণ বিয়ে না হচ্ছে ততক্ষণ স্বামীর নাম ঠিক করে বলা সম্ভব নয়! তবে আমার মা-বাবা যাঁর সঙ্গে বিয়ে ঠিক করে রেখেছিলেন বহুদিন আগে, তাঁর নাম আলোক!

—ছাট্‌স্ ইট্! —ঐটাই আমি জানতে চাইছিলাম!—অবশ্য আপনার পারিবারিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার জন্য মাফ্ চাইছি; তবে আমি গবেষক, আমার সাহায্য করার জন্য ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

—থাক্—ধন্যবাদের কি আর হয়েছে! অবন্তী ছোট্ট একটু হাসি উপহার দিয়ে উঠে যাচ্ছে। ডাক্তার চায় না যে অবন্তী এত শীঘ্র চলে যায়। বলল,

—বসুন না! বাড়ীতে কি জরুরী কোনো কাজ আছে?

—কিছু না! অ-কাজ আছে বিস্তর! যেমন ধরুন, বসে বসে ভাবা, ডিটেক্‌টিভ্ বই পড়া—শুয়ে ঘুমোনো—হাসলো অবন্তী!

—তাহলে গল্প করাটাও অ-কাজের মধ্যে পড়ে—বসুন!

ডাক্তার বেশ স্বচ্ছন্দেই আবেদন জানালো! অবন্তীরও ইচ্ছার অভাব নেই! কি সে করবে বাড়ী গিয়ে? শুধু চিন্তা। দূর করো! বসলো অবন্তী আবার ডাক্তারের সুমুখের চেয়ারটায়। বলল,

—কাজ, অ-কাজ আর কু-কাজ—এই তিনের তফাৎ কি বলুন্ তো?

—জটিল প্রশ্ন—ডাক্তার হাসিতে ভর্ত্তি হয়ে উঠলো—কাজ, অর্থাৎ যেমন ডাক্তারী—প্রফেসারী—ওকালতি,—অ-কাজ, যেমন ঘুমোনো, নভেল পড়া—পাশা খেলা,—কু-কাজ—যেমন·····ডাক্তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো।

—যেমন কোনো চলনসই সুন্দর মেয়েকে পেলেই তাকে সামনে বসিয়ে গল্প করা!

হেসে উঠলো অবন্তী কথাটা বলেই! ডাক্তারও হাসছে। বললো,

—ওটা অকাজের মধ্যে পড়তে পারে—কু-কাজ নয় নিশ্চয়। অপরাধ বিজ্ঞানে বলে—

—থাক—অপরাধ-বিজ্ঞানকে টানবেন না; চোর-ছ্যাচড়দের সঙ্গে আপনাকে একাসনে বসাতে ইচ্ছে নেই আমার—ঐটাকেই কু-কাজ বলে মেনে নিন!

প্রসঙ্গটা এগিয়ে আসছে ডাক্তারের সুবিধার দিকেই; অবন্তীর মুখের মৃদু হাসি ডাক্তারের অপরাধটাকেও হয়তো উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখতে পারে; ডাক্তার অকস্মাৎ দুঃসাহসী হয়ে উঠলো অত্যন্ত—অবন্তী কি আহ্বান জানাচ্ছে ওকে?

—এতো ছোটো কু-কাজ করতে আমি অভ্যস্ত নই—আর একটু বড়, আরো মানবধর্ম্মী বা জীবধর্ম্মী··· ডাক্তার হঠাৎ মুখখানা এগিয়ে আনলো, হাতটা বাড়ালো,·····

সত্যকই ছিল অবন্তী। মুহূর্তমধ্যে চেয়ার থেকে উঠে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল,

—মানুষের মুখ-চোখ দেখে মনস্তত্ত্ব বোঝা অত সোজা নয় ডাক্তার ওহ—সে শক্তি সূক্ষ্ম-বিশ্লেষণকারী স্থিতধী ব্যক্তির; আপনি তো দেখছি বর্বর যুগকেও অতিক্রম করতে পারেন নি—আচ্ছা, নমস্কার!—অবন্তী বেরিয়ে গেল।

কঠিন আঘাত করে গেল ডাক্তারকে। কেন করলো? কী এমন দরকার ছিল অবন্তীর তরফে? অবন্তী ফোন সেরে অনেক আগেই চলে আসতে পারতো; ওকে অতখানা এগিয়ে আসবার মত প্রশ্রয় দেবার মূলে অবন্তীর মনের কোন্ ক্ষুব্ধতা?—কোন্ জ্বালা?—কোন্ বিষ?—অবন্তী নিজেই প্রশ্ন করলো নিজকে। অনর্থক শত্রু বাড়ালো অবন্তী! শত্রু,—হ্যাঁ, শত্রুই! ঐ ডাক্তার সম্বন্ধে কিছু-কিঞ্চিৎ কথা শুনেছে অবন্তী। ও রোজগার করে গভীর রাত্রের অন্ধকারে। যে-শিশু মৃত্তিকায় আসবার জন্য জননী-জঠরে আশ্রয় নিয়েছে, ও তাকে আবার যমদ্বারে পাঠিয়ে দেবার কাজে সিদ্ধহস্ত! ওর নৈতিক চেতনা এতই কম যে দুখানা নোটের মূল্যেই ও একটা মানুষের জীবন অপহরণ করতে পারে। কিন্তু ও অতিশয় সাবধানী—যুদ্ধের আমল থেকে এ পর্যন্ত অনেক অর্থই রোজগার করে এল—অথচ ওর বাইরের বদান্যতায় ওকে মহানুভবই মনে করে সকলে!

কিন্তু ও যাই হোক—অবন্তীর কিছুই যায়-আসে না। অবন্তী ওর কাছ থেকে ভদ্রভাবেই চলে আসতে পারতো; ওকে লুব্ধ করা ঠিক হোল না। কিন্তু এটা বেশ মজার খেলা। কিছুদিন পূর্বে ঐ খেলায় খুবই অভ্যস্ত ছিল অবন্তী! খেলাটা ওর ভালই জানা আছে। ডাক্তার তো তুচ্ছ, ওর চৌদ্দ পুরুষকে পর্যন্ত ঘোল খাইয়ে দিতে পারে অবন্তী; পারলো না শুধু একজনকে—সে আলোক! কবি লিখেছেন:—

"সব লাঞ্ছনা ক্ষমা করে নারী,

বুকে সহে তার সকল তাপ—

অসম্মানেরে করে না সে ক্ষমা,

অপমানে শুধু করে না মাপ্ !"

কিন্তু আলোক তো কোথাও কখনো অসম্মান করেনি অবন্তীকে! তবু কেন অবন্তীর এই ক্ষোভ, এই জ্বালা, এই বিষ! অবন্তী কি মানবিক ঔদার্য্যেও ছোট হয়ে গেছে? ক্রুর সর্পিণী হয়ে উঠেছে? না—অবন্তী এমন অন্যায় আর করবে না।

কিন্তু কি করবে অবন্তী? আলোকের অন্তর থেকে সে উচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সিধুরও সাক্ষাৎ মিললো না। সংসারের পথ তাকে বিপথে যাবারই সংকেত দিচ্ছে সব সময়,—যাবার সহচরেরও অভাব হবে না—ঐতো ডাক্তারই তার প্রধান সহচর হতে পারে একজন! যাবে—অবন্তী বিপথেই চলে যাবে!

আকাশের দিকে চাইলো অবন্তী, অনন্ত মহাকাশ; স্থির—শান্ত নীলিমা—মরণের মত শান্ত—মমতার মত গভীর! ওখান থেকেই নাকি জীবনকণা স্ফুরিত হয় আলোকের অনুতে অনুতে—যব-ব্রীহি-তৃণের অঙ্গে অঙ্গে, জীব-রক্তের বিন্দুতে বিন্দুতে! কবে, কোণ এক সুদূর অতীতে সেও জীবাঙ্কুররূপে স্ফুরিত হয়েছিল ঐ নীলাকাশ থেকেই। সেদিন ছিলনা সেই অঙ্কুরে কোনো পাপ—কোনো গ্লানি—আর আজ!

অজয়কূলের বুনোকুল খাওয়ার দিন মনে পড়লো অবন্তীর। মনে পড়ছে, পরণের কাপড় খুলে হাঁটুজলে মাছধরা—ঝিরঝিরে জলে উলঙ্গ হয়ে সাঁতার কাটা। সেদিন সে শুধু অপাপবিদ্ধা কুমারী ছিল না—ছিল আনন্দময়ী কন্যকা—অন্তরঙ্গ একাত্মাত্মা সখী—অন্তরতমা প্রেয়সী;—না। অবন্তী ত্বরিতে নিজকে সম্বরণ করে নিল। আলোকের

প্রেয়সী হবার সৌভাগ্য অবন্তীর কোনোদিন হয় নি—হবেও না! সাঙ্গিক প্রীতির শরক্ষেপে আলোক সে সম্বন্ধ চূর্ণ করে দিয়েছে—অবন্তীর চোখ-দুটো জ্বালা করে উঠলো! হাত দিয়ে রগড়ে নিল একবার! বাগান থেকে ঘরে উঠে এল। দূরে কৃত্রিম হ্রদের জলটায় ঢেউ উঠছে! বাতাস বইছে বাইরে। মেঘ করেছে, বৃষ্টিও হতে পারে! ঐ তো অত সুন্দর আকাশটা কেমন ঘোলাটে হয়ে উঠলো অকস্মাৎ। ও এখন না-শান্ত. না-বা মমতাময়। বজ্রগর্জন ছাড়ছে, বৃষ্টির শরক্ষেপনও আরম্ভ করেছে—এই তো জীবন, এই তো মানুষেরই জীবন! একটু আগের কুমার আকাশ, কিশোর আকাশ অকস্মাৎ গুরুপত্নীলোভী ইন্দ্রের মত ইন্দ্রিয়পরায়ণ হয়ে উঠলো! পৃথিবীর গর্ভাধানে সে এখন অবহিত হয়েছে। তার বৃষ্টিবিন্দুর কণায় কণায় জীবনের ভ্রূণাঙ্কুর, যৌবনের তেজ—বিলাসের উচ্ছৃঙ্খলতা!

অবন্তী চোখ ফিরিয়ে নিল মাটির দিকে! কাঁপছে তার ছোটবাগানের ছোট ফুলগাছ—কাঁপছে দূরের বৃক্ষশ্রেণী—রোমাঞ্চিত হচ্ছে ধরিত্রীর শষ্পশ্যামলাভা—সুখে, সুরতোৎসবের সলজ্জ আনন্দে! কুমারী ধরিত্রীর কুসুম-বাসর চলছে! আর অবন্তীর?

জীবনের ভুল জীবনের পাপ হয়ে দেখা দিয়েই ক্ষান্ত হয় না—প্রায়শ্চিত্তটাও করিয়ে নেয় ভালো করে! কিন্তু না, অবন্তী এইসব কথা ভেবে আর মনকে ক্লান্ত করতে চায় না। অবন্তী পুরোদস্তুর বাস্তব-বাদী হয়ে পড়বে। যেমন হয়েছিল বছর দুই-তিন আগে, যুদ্ধের আমলে! পাপ কি? পুণ্যই বা কিসের? মানুষ জৈব প্রয়োজন নিয়েই জীব হয়ে জন্মেছে। সে প্রয়োজন তাকে মেটাতেই হবে—ক্ষুধার খাদ্য তার একান্ত দরকার! কামনার পূর্ত্তি-প্রচেষ্টা তার অস্তিত্বের সাক্ষর! পাপ কোথায়? এর পরের যে মানসিকতা—হৃদয়ানুভূতি, স্নেহ, প্রেম, দয়া, ক্ষমা, তিতীক্ষা—দূর করো! ওগুলো মানুষের মধ্যে কতকগুলো দুর্ব্বল, ভীরু, আদর্শবাদী মানুষের

সৃষ্ট কাল্পনিক বিষযন্ত্র! তাঁরা নিজে মহামানব হবার মানসে ঐসব কথা সৃষ্টি করে মানুষের মনকে অনর্থক গ্লানি আর লোভে পূর্ণ করে তুলেছেন! পুণ্যের লোভ, আর পাপের গ্লানি!—দূর করো!

অবন্তী ঝেড়ে ফেললো সব যেন মন থেকে। উঠে দাঁড়ালো। বৃষ্টি তখনো চলছে। খেতে বসলো অবন্তী। খেল ভালই, তারপর এসে শুলো—ঘুমুলো। কোনো স্বপ্ন ওকে ব্যাহত করলো না—আহতও করলো না। বেশ ঘুমুলো অবন্তী! উঠে দেখলো, বৃষ্টি থেমে গেছে; আকাশ পরিস্কার। হঠাৎ আয়া এসে জানালো—হুজুর, উৎপলা দেবী আর আলোক বাবু এসেছেন!

—আসছি, বসতে বলো!

অবন্তী স্বাভাবিক ভাবেই বলল। নীচে যাবার জন্য কাপড় বদলাচ্ছে।

মুখের ভাবটা যথাসম্ভব পরিবর্ত্তিত করে ফেললো অবন্তী নীচে নামতে নামতে! তার অন্তরের গোপন চিন্তার অভিব্যক্তি বাইরে প্রকাশ করতে চায় না সে; নিজকে সুস্থির এবং শান্ত করে এসে বললো,

—নমস্কার উৎপলা দেবী; আমার সৌভাগ্য যে আপনি এসেছেন!

—তোমার সৌভাগ্যই আমি কামনা করি অবন্তী। বয়সে তুমি আমার থেকে নিশ্চয়ই ছোট—আশা করি 'তুমি' বলার জন্য কিছু মনে করবে না!

—'তুমি' বললে আত্মীয়তাই বাড়ে—দিদি—কিছু মনে করবার মত ইংরাজিয়ানা আমার নেই! আসুন, ওদিককার লনে গিয়ে বসা যাক। এসো আলোকদা!

সবাই গিয়ে বসলো ঘাসঢাকা ছোট্ট জমিটুকুতে! অবন্তী প্রায় প্রত্যহ এখানে বসে চা খায় বিকালে! সামনের রাস্তা দিয়ে হাজার লোক—নর এবং নারী—হাওয়া খেতে যায় লেকের ধারে; গাড়ীতে বসে, শাড়ীতে ঝলমলে হয়ে যায় কেউ—কেউ যায় পায়ে হেঁটে, পাশের সঙ্গীর সঙ্গে প্রেমালাপ করতে করতে—কেউ যায় একলা উদাস ভাবে—অবন্তী এখানে বসে বসে দেখে আর চা খায়। লনটুকু এমন কিছু মনোরম নয় ওর, তবু সহরের বুকে ঐটুকু সবুজ ঘাসের পান্না সুন্দর লাগে!

আলোক একটু গম্ভীর হয়েই রয়েছে; কোনো কথা এ পর্য্যন্ত বলে নি ও। উৎপলা প্রশ্ন করে যথাসম্ভব জেনে নিল অবন্তীর ভূত-জীবনের ইতিহাস। কিন্তু কলকাতায় এসে মামাতো বোন রাগিণীর সাহচর্য্যে রাত্রি-বিহারের কথাটা বলতে অবন্তী ঠিকমত সক্ষম হোল না—শুধু বললো—জনৈক বিশ্বাসঘাতকের দ্বারা প্রতারিত হয়েছিল সে—তারপর সে নেমে যায় অসতীত্বের নিম্নতম স্তরে! সিধু তাকে সেদিন বাঁচিয়ে দিয়েছিল তার গর্ভস্থ সন্তানের জনক হবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে!

—সে সন্তান কোথায় তোমার অবন্তী?—উৎপলা প্রশ্ন করলো।

—সে এই পৃথিবীর আলো মাত্র কয়েকঘণ্টার জন্য দেখেছিল। সত্যের আলো সে সহ্য করতে পারলো না—আঁধারে তলিয়ে গেল!

আগেরদিন আলোকের সঙ্গে আলাপের সূত্র ধরেই অবন্তী যেন ওকথাটা বললো আলোককে আঘাত করবার ইচ্ছায় না-হলেও আপনাকে আত্মস্থা করবার জন্য।

—তার জন্মের মধ্যে কোথাও অসত্য ছিল না অবন্তী—সে ঠিক স্বাভাবিক ভাবেই আনন্দের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিল—আলোক বললো এতক্ষণে কথাটা।

—আলোকদা!—অবন্তী যেন ক্রন্দন-ধ্বনি জাগিয়ে তুলছে!

—শোন অবন্তী—অ-সত্য এবং অন্ধকার যদি কোথাও থাকে তো সে তোমার নিজের জীবনে অ-সত্যকে আশ্রয় করার মধ্যে! জবালার মত তুমি যদি বলতে পারতে, "বহু পরিচর্য্যা করে পেয়েছিনু তোরে"—তাহলে নিশ্চয় তোমার সেই সত্যকাম ব্রহ্মবিদ্যালাভের অধিকারী হতে পারতো! তুমি তা কর নি, করতে পারনি—তোমার এই দুর্ব্বলতা, এই অ-সত্যকে আশ্রয় করার পাপ এর জন্য দায়ী।

—আলোকদা—আমি তার মৃত্যুর জন্য কিছুমাত্র দায়ী নই। আমি ভাল করে চোখ মেলে তাকে দেখবার আগেই সে চলে গেল! সে থাকলে হয়তো আমি জবালার মতই তাকে...

—মিথ্যে কথা বলোনা অবন্তী—তুমি তা পারতে না! পারবে না জেনেই তুমি সিধুকে আশ্রয় করেছিলে। আবার যাকে বিপদের দিনে আশ্রয় করলে, ঐকান্তিক নিষ্ঠায় তাকে স্বীকারও করতে পারলে না তোমার পরবর্ত্তী জীবনে। অবন্তী, তুমি শুধু নিজে নেমে গিয়েই ক্ষান্ত হওনি—নিজের অসত্যের বোঝা চাপিয়ে তুমি অপরকেও নামাতে চেয়েছ। সিধুকে ওভাবে স্বীকার কেন করলে তুমি অবন্তী?

—আমার বাঁচবার উপায় ছিল না আলোকদা!—অবন্তীর চোখের উপচানো জল শুকিয়ে উঠছে!

—মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বাঁচার চাইতে মরে যাওয়া অনেক বেশি রমনীয় অবন্তী! অনেক বেশি তার মহিমা।

আলোক কথাটা বলে আকাশের পানে তাকালো। গাঢ় নীল আকাশ অপরাহ্নের আভায় উজ্জ্বল-মধুর। অনন্ত মহাশূন্যের ওপারে কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু আছে। ঐ নীল সমুদ্রের ওপারে আছে সত্যের সাম্রাজ্য—শ্মশানের বৈরাগ্য—সাধনার উপলব্ধি! আলোকের দৃষ্টিতে সীমাহীনতার আস্বাদ জাগছে।

উৎপলা নিজের কথাটাই ভাবছিল এতক্ষণ! কবে কোন অতীত দিনে ওরও জীবনে নেমেছিল অভিশাপ—না—না—অভিশাপ কেন হবে? আশীর্ব্বাদও নয়—সে একটা স্বপ্ন—শুধু স্বপ্নই! উৎপলা নিজকে সম্বরণ করে ক্ষীণ হাসলো; বললো,

—মানুষকে বাঁচতে হয় আলোক বাবু—সবসময় তার মধ্যে রমনীয়তা না থাকতে পারে, তেমনি মৃত্যুর মধ্যেও সব-সময় রমনীয়তা থাকে না! অবন্তী যদি মরতো অর্থাৎ ওর ভদ্র জীবনের অবসান ঘটতো, তাহলে ওকে আরো অনেক অতলে তলিয়ে যেতে হোত—কে ওকে বাঁচাতো তখন?

—সত্য-ই ওকে বাঁচাতো দেবি—যেমন বাঁচিয়েছিল একদিন দ্বৈপায়ণ-জননী সত্যবতীকে—সত্যকাম-জননী জবালাকে—কিন্তু বর্ত্তমান বাস্তব-বাদী মানুষের জীবন আজ অ-সত্যে প্রতিষ্ঠিত, তাই সমাজে এত অনাচার, এতব্যভিচার। এই জীবন-সামাজিকতা কৃত্রিম—এই জীবন-বিজ্ঞান প্রবল স্রোতের উপর সভ্যতার সেতু নির্ম্মানের মত—যতই পোক্ত করে তৈরী করুন, স্রোতের আঘাত অবিশ্রাম তাকে সইতে হবে এবং একদিন সে সেতু ভাঙবেই! কিন্তু স্রোত অকৃত্রিম—অনন্তকাল প্রবাহিত থাকবে সে। তাকে বুজিয়ে দিন—অন্য খাতে প্রবাহিত হবে।—আলোক একটু হাসলো, অবন্তী চোখ মুছছে! চোখে ওর জলবিন্দু নেই, হয়তো জ্বালা করছিল—আলোক একবার দেখে বলল,

—সিধুর সঙ্গে তাহলে তোমার প্রেম-ভালোবাসার কোনো সম্বন্ধই নেই—কেমন?

—না—অবন্তীর গলার স্বর খাটো, কিন্তু স্পষ্ট।

—সে যদি তোমাকে আজ নিতে আসে তাহলে তুমি যাবে না অবন্তী?

প্রশ্নটা কঠিন। গতকালই অবন্তী গিয়েছিল সিধুর কাছে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে; গুরুদেবের দেখা পেলে হয়তো চলেই যেত। অল্পক্ষণ ভেবে বললো,

—ওর জীবন আজকাল সাধুর জীবন আলোকদা,—ওখানে যদি যাই তো ভালো আশ্রয়ই পাব আমি। না গিয়ে এখানেই বা আমি কি করবো?

—করবার বিস্তর আছে অবন্তী—আলোক আস্তে বলল—ভোগের আকাঙ্ক্ষা থাকতে যে সন্ন্যাস নেয়—সেও মিথ্যাকে আশ্রয় করে। সেখানেও তার পতন হবার আশঙ্কা কমে না কিছুমাত্র। অনর্থক সিধুকেও আরো নীচে নামিয়ে আনবে!

—তাহলে আমার উপায়?—অবন্তী প্রশ্নটা করে আলোকের মুখের পানে চাইল!

—নিরুপায় হবার মত কিছুই এখনো হয় নি তোমার। উপস্থিত যে পরিচয়ে তুমি রয়েছ—তাই যথেষ্ট ভাল পরিচয়—কথাগুলো বললো উৎপলা দেবী!

—এভাবে কতদিন আমি থাকতে পারি? এমনি একলা, এমনি সব-ছাড়া, স্বর্গচ্যুত হয়ে?

—স্বর্গ থেকে চ্যুত হয়েছ—একথা ভাবছো কেন তুমি অবন্তী? উৎপলা গলায় জোর দিয়ে বললো—"তোমার স্বর্গ যদি তোমার হয়, তাহলে নিশ্চয় সেখান থেকে তোমাকে কেউ সরাতে পারবে না।" কিন্তু অবন্তী, জীবনের ভুলকে আবার ভুল দিয়েই সংশোধন করতে যেও না। সিধুকে আশ্রয় করার ভুল সিধুকে ত্যাগ করেই সংশোধন করতে হবে—তাতে তুমিও বাঁচবে, সিধুও বেঁচে যাবে!—আলোকের আগে-বলা কথাগুলোই যেন উদ্ধৃত করে উৎপলা বললো।

—তাই করবো!—অবন্তী আত্মসমর্পণ করার ভঙ্গীতে বললো কথাটা!

ওর মুখের রেখায়-রেখায় ক্লান্তি যেন কালিমার মত ফুটে উঠেছে! চোখের বিষণ্ণতায় বিশ্বের জড়িমা—একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো,

—মা তোমাকে দেখলে খুসী হবেন আলোকদা—যাবে ওখানে একবার?

—আজই?—আলোক প্রশ্ন করলো!

—হ্যাঁ—আমি তো যাব কিছুক্ষণ পরে। আজ যদি তোমার যেতে আপত্তি থাকে, তাহলে কাল-পরশু যেও, ঠিকানাটা লিখে নাও। উৎপলাদিও যদি যান তো মা আরো খুশী হবেন! আমি ঐ মায়ের মেয়ে, এ পরিচয় আজ দিতে লজ্জা করে 'পলাদি, আমার মা কেমন, আলোকদা জানে।

উৎপলা চাইলো আলোকের পানে—তারপরই মুখ ফিরিয়ে নিল! মনে পড়ে গেল ওর নিজের মা'র কথা এবং নিজের মা হবার কথাটাও! অবন্তীর মাও হয়তো বা···না—অবন্তীর মা সত্যই মা—মহিমময়ী জননী!

—চলো, আজই প্রণাম করে আসি। আবার কবে সময় পাব, জানি না।—আলোক বললো অবন্তীকে। অবন্তী আবার উৎপলাকে অনুরোধ করলো যাবার জন্য।

—আচ্ছা, যাব, যাও কাপড় বদলে এসো—উৎপলা সম্মতি দিল যাবার।

অবন্তী কাপড় বদলে তৈরী হতে গেল ভেতরে। গোধূলিবেলার স্নিগ্ধতা—বাইরে পথচারী জনস্রোতের কাকলি—বাগানের বেলফুলের গন্ধ:

—ওর মা'কে তো আপনি ভালই চেনেন আলোকবাবু?

—হ্যাঁ—আমার নিজের মা'র মতই!—আলোক বললো উত্তরে!

—তিনি বুঝি খুবই মহীয়সী মহিলা?

—তাঁকে 'মা' শব্দের বেশি কোনো বিশেষণ দেওয়া যায় না—দিলে ক্ষুণ্ণ করা হয়।

উৎপলা বুঝতে পারলো, কত বেশি শ্রদ্ধা আলোকের অন্তরে ঐ মা'র উপর। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বিশেষ একটা কথা ভেবে নিল উৎপলা।

—তিনি যদি আপনাকে অনুরোধ করেন অবন্তীর পাণিগ্রহণের জন্য ?

—তিনি মা ; যেমন অবন্তীর, তেমনি আমার, তেমনি আপনারও। সন্তানের অমঙ্গল হবার মত কিছুই তিনি করবেন না উৎপলা দেবি !

—তিনি যদি মনে করেন, এতে মঙ্গলই হবে !

—মনে করবেন না তিনি—আলোক একটু হাসলো ; বললো—তাঁকে বুঝবার মত বুদ্ধি-বিদ্যা আমার নাই। নিতান্ত সাধারণ আবার অত্যন্ত অসাধারণ তিনি। আমি শুধু ভাবছি, অবন্তীকে এই অসত্যের আশ্রয়ে আসতে কেন তিনি দিয়েছিলেন !

—হয়তো স্বামীর আদেশ—সমাজের শাসন—এবং তাঁর নিজের কন্যাস্নেহ !

—না—আলোকের কণ্ঠ সংশয়শূন্য—ওর কোনোটাই নয় ! অবন্তীকে অবন্তীর ইচ্ছাতেই তিনি চলতে দিয়েছিলেন। বুদ্ধিমতী অবন্তীই এই চক্রান্তের সৃষ্টিকর্ত্রী—এতে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নেই ! কিন্তু তিনি বাধা দিলেন না কেন ?

অবন্তী কাপড় বদলে এসে পড়েছিল, কথাগুলো শুনে বললো,

—তুমি ঠিকই ধরেছ আলোকদা, সিধুকে স্বামী স্বীকার করে সমাজকে ফাঁকি দেওয়ার বুদ্ধিটা আমার। মা বাধা দিলেন না—আমার পেটের ছেলেটাকে মারবার চক্রান্ত করেছিলেন বাবা এবং তাঁর একজন বন্ধু ! মা চেয়েছিলেন সে বেঁচে থাকবে। তাই বাধা দেন নি !

উৎপলা আর আলোকও ওর [illegible] ! [illegible]

অবন্তী ! নীচু মুখেই বলল—আমার পাপ আর পুণ্য সবই তো বললাম, এখন পথ যদি কিছু থাকে তাহলে নির্দ্দেশ দিও আলোকদা—চলো !

—চলো !—উৎপলা উঠলো। আলোকও উঠলো। অবন্তী বাড়ীর চাকরদের ডেকে বলে দিল—সে মা'র ওখানে যাচ্ছে। ফিরবে দিন তিন-চার পর। ওরা যেন সাবধানে থাকে সকলে ! দরকার হলে ফোন করে ডাক্তারের বাড়ী থেকে ! উৎপলার গাড়ীতে গিয়েই উঠলো সকলে।

ডাক্তারের বাড়ীর সামনে দিয়েই যেতে হবে—ডাক্তার নিজের বাড়ীর গেটে দাঁড়িয়ে। অনেকক্ষণ থেকেই সে দেখছিল, অবন্তীর ঘরে কারা যেন এসেছে ! সকালবেলার অপমানটা ভোলে নি ডাক্তার। গাড়ীখানা ধীর গতিতে যাচ্ছে,—ডাক্তার হঠাৎ ড্রাইভারকে বললো—এই—রোখ্ খো !

—নমস্কার উৎপলা দেবি !—এখানে, এ বাড়ীতে আপনি ? পরিচয় আছে নাকি অবন্তী দেবীর সঙ্গে ?

—নমস্কার !—ডাক্তারকে প্রতিনমস্কার জানালো উৎপলা ! হেসে বললো—পরিচয় করে নিলাম ওর সঙ্গে। আপনি ভাল আছেন ডাক্তার গুহ ?

—আর ভালো ! রুগীটুগী আজকাল কমে গেছে উৎপলা দেবি !

—দেশ স্বাধীন হয়ে গেল ; রোগবালাই আরো কমে যাবে—উৎপলা বললো।

—আমি যে-রোগের চিকিৎসক সে-রোগ কমবে কি বাড়বে বলা কঠিন।

—অর্থাৎ ?—উৎপলার প্রশ্নে বিস্ময় !

—অর্থাৎ স্বাধীনতা বনাম উচ্ছৃঙ্খলতা !—হাসলো ডাক্তার। হঠাৎ হাসি থামিয়ে বললো—কিন্তু এঁর পরিচয়টি ?—আলোকের পানে চাইল !

—ওঁর নাম—আলোকনাথ—অবন্তী দেবীর···

—ও, বুঝেছি ? ডাক্তার উৎপলার কথাটা আধাপথে থামিয়ে দিয়েই বলল—আজই সকালে ওঁর মাকে ফোনে উনি বলছিলেন এঁর কথা—বেশ বেশ, নমস্কার !

—আমরা একটু ব্যস্ত আছি ডাক্তার গুহ—আসি আজ !—উৎপলা বললো।

—আচ্ছা, আচ্ছা, আসুন—নমস্কার !—বিদায়-সম্ভাষণ জানালো ডাক্তার। কিন্তু উৎপলা, অবন্তী এবং আলোকও লক্ষ্য করলো, ডাক্তারের ছোট ছোট চোখ দুটো আলোকের দিকে শানিত ছুরির মত উদ্যত রয়েছে। অস্বস্তিকর চাহনি ! গাড়ীটা কিছুদূর এগিয়ে গেলে আলোক শুধুলো অবন্তীকে—ওর সঙ্গে তোমার কিসের পরিচয় অবন্তী ?

—ওর বাড়ীতে মাঝে মাঝে ফোন করতে আসতে হয়।

—আপনিও ওকে চেনেন ?—উৎপলার প্রতি প্রশ্ন করলো আলোক।

—চিনি !—ভালো ভাবেই চিনি। আমার জীবনের সে এক রহস্যময় অধ্যায় !—উৎপলার মুখে হাসির কণাও নেই—শুকনো হাসি তবুও ফুটাচ্ছে, বিকৃত হয়ে উঠ্‌ছে ওর সুন্দর মুখখানা। আলোক লক্ষ্য করে বলল,

—নারী চিরদিনই রহস্যময়ী। কিন্তু দেবি, এই মহারহস্যের সৃজয়িত্রী যিনি, তিনিও নারী—করুণাপরবশ হয়ে তিনি পুরুষকে এমন একটি ক্ষমতা দিয়েছেন যাতে নারীর রহস্যের কুয়াশা ভেদ না করেও সে পথ দেখে চলতে পারে।

—আপনার কথাটার অর্থ ভালো বুঝতে পারছি না আলোকবাবু ! উৎপলা বলল।

—নারীর জীবনে পুরুষ প্রত্যক্ষভাবে প্রয়োজনীয়, পুরুষের তা নয়। উপমা সিদ্ধেশ্বর!

—আপনি ক্রমশঃ হেঁয়ালী হয়ে উঠছেন আলোকবাবু।—উৎপলা কুণ্ঠার সঙ্গে বললো।

—রহস্যময়তা নারীর শুধু প্রবৃত্তি নয়, অপরিহার্য্য বৃত্তি—ইন্‌ডিস্‌পেন্‌সিব্‌ল তার পক্ষে।

—তাতে কি হয়েছে আলোকবাবু? আপনি কেন এভাবে কথা বলছেন?

উৎপলা ভয়ে ভয়ে শুধুলো। আলোক হাসলো একটু, বলল,—মানুষের মনোরাজ্যের পরিধি অনন্ত বিস্তৃত 'পলা দেবি—কিন্তু মানুষের জীবনের পরিধি নিতান্ত সঙ্কীর্ণ—কয়েকটা দশক মাত্র। অল্প পরিসর জীবনে অনন্ত বিস্তৃত মনকে সে রাখবে কোথায়—দেবে কি—ভরবে কিসে? এই চিন্তা আর্য্যঋষিগণ করেছিলেন—তাই তাঁরা বেদ-বেদান্ত জৈমিনীসূত্র-যোগবাশিষ্ট রচনা করে গেছেন। জীবনের পর জীবনকে কল্পনা করে পরমায়ুর পরিধিকে বাড়াতে চেয়েছেন—কিন্তু তাতেও মনোরাজ্যের রহস্যময়তার বিস্তৃতি আয়ত্তাধীন হোল না।

—কিন্তু আমি আপনাকে কি এমন বললাম যে আপনি আমাকে এই সব গুরুগম্ভীর ঋষিবাণী শোনাচ্ছেন? আমি নিতান্তই সাধারণ মেয়ে আলোকবাবু!

—সাধারণ কখন অসাধারণ হয় জানেন? যখন সে বুঝতে পারে যে সে সাধারণ,—সে সহজ—সে সত্যে আশ্রিত। তখন সে সূর্য্যালোকে ধূলিকণার মতই উজ্জ্বল, দীপ্তিময়, মনিপ্রভ হয়ে উঠে। আপনি তাই আজ অসাধারণ!

—কম্‌প্লিমেণ্ট্‌ দিচ্ছেন?—উৎপলা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো যেন আলোকের দিকে।

—না—রাজাকে রাজা আর ভিখিরীকে ভিখিরী বলতে আমি অভ্যস্ত; দরিদ্রনারায়ণ বলে ব্যঙ্গ করি না।

উৎপলা ঠিক বুঝতে পারছে না, আলোক কি বলতে চায়—কেন ওভাবে ঘুরিয়ে সে কথা বলছে তার সঙ্গে। অবন্তী চুপচাপ শুনছিল; এতক্ষণে বলে উঠলো—আপনি ওকে এখনো বোঝেন নি পলাদি, আমি বলছি শুনুন, ঐ ডাক্তার যদি কোনোদিন কোনো কারণে আপনার জীবনের সংস্পর্শে এসে থাকে—এসেছে, আপনি নিজেই বললেন, এবং তারপরেও আপনার জীবনের রথকে এতখানা টেনে এনেছেন—আলোকদার চোখে এইখানেই আপনি অসাধারণ। আপনার রহস্যময়তা যতই থাক, আলোকদার কাছে আপনার দীপ্তি প্রকাশ হয়ে গেছে। অর্থাৎ আপনি হীরা, না পোকরাজ, নাকি পাথর, তা ও জেনে গেছে!

—তাই কি আলোকবাবু?—উৎপলা প্রশ্ন করলো।

আলোক হাসলো একটু—কিছু বলল না।

গাড়ী পৌঁছে গেল অবন্তীর বাপের বাড়ী।

শৈল-সানুদেশে সুবৃহৎ আশ্রম—নাম 'অজপাশ্রম'। আধ্যাত্মিক আলোচনা বা যোগের আনুষ্ঠানিক আড়ম্বর এখানে নেই—যাগযজ্ঞও এখানে হয় না। ইংরাজের হাত থেকে ভারতমাতাকে উদ্ধার করবার জন্যই এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দীর্ঘকাল পূর্ব্বে। বিবেকানন্দের বাণী এর তোরণদ্বারে লেখা—

"জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর"

জীবরূপী ঈশ্বর—জন্মভূমিরূপিণী জননী—আর জগন্ময় সৌভ্রাত্র এঁদের আদর্শ। কিন্তু সেই আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন

জননীরূপা জন্মভূমির মুক্তি। পরপদানত ক্রীতদাসের কথা সর্ব্বত্রই অগ্রাহ্য হয়—তাই ভারতের শাশ্বত সনাতন সত্য অস্বীকৃত হচ্ছে পাশ্চাত্যের স্বাধীন অহংভূমিতে। কিন্তু মানুষের জীবনবাদ বা জীবনবেদে আজো কোনো জাতি ভারতীয় মণীষার থেকে বেশি অগ্রসর হতে পারে নি—কিন্তু সে-সত্য স্বীকার করে কে? বৈদিক প্রজ্ঞা—যা স্বয়ং ঈশ্বরবাক্য বলে প্রতিষ্ঠিত তারই কদর্থ করে ইউরোপীয় পণ্ডিত বোঝালেন—'বেদ চাষাভূষার মেঠো গান—কতকগুলো অদ্ভুত আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া আর তৎকালীন সমাজের কয়েকটা কুৎসিত নিয়মকানুন মাত্র পাওয়া যায় ওতে।' দুর্ভাগ্য ভারতের, কয়েকজন ভারতীয় পণ্ডিতমূর্খই নিজেদের অতি-পাণ্ডিত্যের অভিমান বশে বেদের যে টীকা করেছেন—তাই হোল ইউরোপীয়দের ভাষ্যের প্রমাণ।

শ্রীগুরুদেবকে এই প্রশ্নই করছিল সিদ্ধেশ্বর।—কে সেই পণ্ডিতপ্রবর?

—মহীধর নামা জনৈক ভাষ্যকার—শ্রীগুরুদেব উত্তর দিলেন। একটু পরে বললেন,—বৈদিক ভাষা না জেনে বেদের ভাষ্য লিখবার দুঃসাহস তাঁর কি করে হোল, বোঝা কঠিন—একটা দৃষ্টান্ত দিলেই বুঝবে,—

'তা উভৌ চতুরঃ পদঃ সম্প্রসারয়াব স্বর্গে লোকে প্রোর্ণুবাথাং বৃষা বাজী রেতোধা দধাতু ॥২॥ য. অ. ২৩ মং ২০।

মহীধর মহাশয় এই বেদমন্ত্রের ভাষ্য করলেন—'যজমানের স্ত্রী ঘোটকের পুরুষত্ব নিজেই নিজের স্ত্রীত্বে যোজনা করবে'—অথচ সত্যার্থ হচ্ছে 'রাজা এবং প্রজা উভয়েই মিলেমিশে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম আর মোক্ষসাধন ব্যাপারে সর্ব্বদা প্রবৃত্ত থাকবে। অর্থাৎ এমন কাজ করবে, যার ফলে রাজা-প্রজা উভয়েই সুখে-শান্তিতে থাকতে পারে এবং সকল প্রাণীকেই সুখে রাখতে পারে। যে রাজ্যের মানুষ ঈশ্বরের উপাসনা করেন—তাঁকে জানেন—

সে রাজ্য নিশ্চয় সুখলাভে সমর্থ হয়। অতএব সকলে সৎ উপদেশ ও সৎপুরুষের সেবা করবেন এবং বিদ্যা ও বলের বৃদ্ধি করতে যত্নবান হবেন'—এই সুন্দর অর্থকে বিকৃত করে মহীধর যে টীকা করে গেছেন—তারই পাপ আজ মহাভারতকে দগ্ধিভূত করছে। এমনি অসংখ্য আছে, সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ।

—আবার এই সব মহাগ্রন্থের সত্যার্থ নির্ণয় প্রয়োজন হবে, নইলে ভারতকে তার পূর্ব্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না। রুদ্ররূপী কালই করবেন সে কাজ! ভারতীয় ঐক্যের সাধনার কথা যা আপনি বলছিলেন, বেদে কি তার ইঙ্গিত আছে?

—নিশ্চয়। শুধু বেদে নয়—ভারতীয় সাধনার সর্ব্বত্র; কিন্তু সেই ঐক্যকে আজ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা সুদুরূহ সিধু—যুগযুগান্তব্যাপী পরাধীনতার অত্যাচারে ভারত ভুলে গেছে তার সাধন-ঘরের চাবিকাঠিটি কোথায়। তাছাড়া···শ্রীগুরুদেব কিছু বলতে গিয়ে থেমে রইলেন।

সিধু বলল—তাছাড়া আর কি?

—আজকার এই পর-শাসনমুক্তির মধ্যেও কোনো শ্রেয়ঃ আমি দেখতে পাচ্ছি না। —উনি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন—এই মুক্তি শুধু ভিক্ষালব্ধ নয়, ভীরুতার কলঙ্কে লাঞ্ছিত। এই মুক্তির নির্দ্দেশ ভারতীয় অনুশাসনের নির্দ্দেশ হোল না—হোল বৈশ্যজনোচিত বৈষয়িক নির্দ্দেশনামার নূতন রূপ—দুর্ভাগ্য! কিন্তু যাক সে কথা,—ভারত আজ স্বাধীনতা পেল। রুদ্ররূপী কালই প্রমাণ করবেন এ স্বাধীনতা কতখানি।—একটু ভেবে বললেন—

স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্ম্মকে মধ্যযুগীয় সংকীর্ণতা আর ভাবপ্রবণতা হতে মুক্ত করে মহাভারতীয় হিন্দুধর্ম্মরূপে প্রচার করলেন—নেতাজীর জীবনে এই বীর্য্যপ্রদ শক্তিধর্ম্মই প্রকটিত। গান্ধীজি পুনরায় আমাদের

ধর্ম্মে মধ্যযুগীয় ভাব সংযুক্ত করলেন এবং কংগ্রেস গান্ধী-ভক্তিকে দেশ-ভক্তির উপরে স্থান দিল। ভারতমাতার মানসপুত্র স্বামী বিবেকানন্দ; তিনিই পরাধীনতার গ্লানি সর্ব্বপ্রথম অনুভব করে বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে দেশবাসীকে জানিয়েছিলেন—পরাধীনতার মত দুঃখ আর নেই। তারপর তাঁরই আদর্শ গ্রহণ করলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র;—বাংলা থেকে যে চিন্তার বৈপ্লবিক ধারা সারা ভারতকে পরিপ্লাবিত করেছে, তারই ফলে উর্ব্বর হোল অন্যান্য প্রদেশ—কিন্তু সিধু, বাংলার স্থান আজ কোথায়! —গুরুজীর দুঃখ-শান্ত আঁখি-তারকায় অশ্রু নয়,—দ্রবীভূত অনল বুঝি। সিধু এক মুহূর্ত্ত চেয়ে রইল, তারপর বলল ধীরে ধীরে,

—বাঙালী কি চিরদিনই আত্ম-বিস্মৃত থাকবে গুরুদেব? বাঙালীর মণীষা, বাঙলার সম্পদ, বাঙলার বীর্য্য দ্বারা অপর প্রদেশ শ্রেষ্ঠতা অর্জন করলো, আর বাঙালীকে ঠেলে দিল তার অধিকারের বাইরে। বিভক্ত হোল বাঙলা—ক্ষুণ্ণ হচ্ছে তার সংস্কৃতি, নির্য্যাতীত হচ্ছে তার দেশ-ভূমি, তার ভৌতিক সত্বা, আর বাঙালী তার শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রচারিত ক্ষমাসুন্দর প্রেমের মহিমা গান করছে, বিশ্ব-জনীনতা আর বিশ্বপ্রেমিকতার স্তুতিবাদ চালাচ্ছে—এ আর কতদিন চলবে?

—চলবে—আরো বেশি করেই চলবে আরো কিছু দিন। শিরে সর্পাঘাত না হলে ওদের নিদ্রাভঙ্গ হয় না—গুরুদেব কিছুক্ষণ থেমে থেকে বললেন—'অতিবুদ্ধির নাকে দড়ি' কথাটা নিদারুণ সত্যি এই বাঙালী জাতির সম্বন্ধে সর্ব্বত্র, সর্ব্বকালেই। কিন্তু ওসব কথা থাক সিধু, ঐক্যের সাধনায় আমাদিকে অবহিত হতে হবে। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন বাঙলাদেশে দুটি জাতি রেখেছিলেন—ব্রাহ্মণ আর শূদ্র। শূদ্র ছিল দুইরকম—জল-আচরণীয় আর জল-অনাচরণীয়; জল-চল আর জল-অচল জাতির সীমারেখা অবলম্বন করে

বৃটিশ-শক্তি কাষ্ট হিন্দু আর সিডিউল্ড কাষ্ট জাতি তৈরী করে বিভেদ সৃষ্টি করল। তথাকথিত তপশীলিদের মন থেকে হীনতার ছাপ মুছে দেবার জন্য মহাত্মাজি 'হরি' শব্দের পর 'জন' শব্দ যোজনা করে 'হরিজন' পদ নিষ্পন্ন করলেন। কিন্তু এই হরিজনদের মধ্যেও বিস্তর ভেদ রয়েছে—বৈবাহিক সম্বন্ধ চলে না অর্থাৎ এরা হরিজন হলেও একজাতি হলেন না। শিক্ষাদ্বারা এঁদের উন্নত করলে এবং আর্থিক বনিয়াদে প্রতিষ্ঠিত করলেই যে বর্ণহিন্দুর সঙ্গে হরিজন হিন্দুর ভেদ লুপ্ত হয়ে যেতে পারে—তার প্রমাণের অভাব নেই, কিন্তু বৃটিশ সরকার সে চেষ্টা করেন নি। ভেদটাই তাঁরা প্রবল রাখতে চেয়েছিলেন। এখন আমাদের দেখতে হবে, সিডিউল্ড কাষ্ট নামে কোনো জাতি ছিল না, নাই এবং ভবিষ্যতে থাকবে না, তার ব্যবস্থা করা।

—সে খুব ভাল কথা গুরুদেব, কিন্তু বর্ত্তমানে অন্য দুটি জাতির সৃষ্টি হয়েছে, তার কি করা যেতে পারে? ধনী জাতি আর নির্ধন জাতি।—সিধু হাসলো কথাটা বলেই।

—বর্ত্তমান রাষ্ট্রনীতির কর্ণধারগণ যে ভাবে পরিচালন করবেন রাষ্ট্রকে, তাতেই ওই জাতিতত্ত্ব সমাধানের বীজ রয়েছে—আশা করি তাঁরা করবেন। কিন্তু—সে কথা যাক সিধু—আমাদের ঐক্যের সাধনা এবার আরম্ভ করতে হবে। আধ্যাত্মিক ঐক্য তার সঙ্গে আধিভৌতিক ঐক্য—মানুষের অন্তরাত্মা যেখানে একমেবাদ্বিতীয়ম্—সেখানে সকলকে পৌঁছে দেওয়াই আমাদের কর্ম্ম!

—এ কাজ কি আর সম্ভব হবে গুরুদেব?—সিধুর কণ্ঠস্বর সন্দেহ-সঙ্কুল।

—সম্ভব করতে হবে। ও ছাড়া ভারতের মহান বাণীকে বিশ্বে প্রচার করা সম্ভব নয়—ঐ বাণীই সত্য বাণী, শাশ্বত বাণী—সম্পূর্ণ বাণী!

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

—কিন্তু বর্ত্তমান যুগ সাম্যের যুগ—সমানাধিকারের যুগ।

—অধিকারীভেদ স্বীকার করে ভারত চিরদিন। নিরবচ্ছিন্ন সাম্য প্রলয়ের নামান্তর—সাম্য নাই, হতে পারে না! সৃষ্টির রহস্যই হোল, অনন্ত বৈচিত্র্য। সুযোগ বা সম্ভাব্যতার সমতা সম্ভব করা যেতে পারে রাষ্ট্র বা সমাজনীতির আইনবলে, কিন্তু দেহগত সাম্য বা অন্তরগত সাম্য মানুষের শক্তির পরিধির বাইরের বস্তু! ভোগ্য বস্তুর ন্যায্য বিভাগ বা বণ্টনের দ্বারা যতদূর সম্ভব সাম্য স্থাপন করা যেতে পারে কিন্তু সেটা বাহ্যিক সাম্য। বস্তুজগতে এই বাহ্যিক সাম্যের প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না,—কিন্তু ভারতের সাধনা বস্তুর ঊর্দ্ধে, সদ্‌বস্তুর সাধনা। পৃথিবীর বস্তুতান্ত্রিকতা আজ এ সত্য ভুলে আছে—ভারতই তাকে সেকথা মনে করিয়ে দেবে, ভারতের এইটাই নিজস্ব বাণী।

উনি চুপ করে কি যেন ভাবতে লাগলেন। হঠাৎ বললেন,

অবন্তীর সঙ্গে আমি দেখা করতে পারলাম না সিধু—কাল গভীর রাত্রে ওখানে গিয়ে দেখলাম—সে বাড়ীতে নেই; হয়তো বাপের বাড়ী গেছে, কিম্বা আর কোথাও। তুমিই একবার যাও কলকাতা, কালই যাও।

—এদিককার কাজ ঢিলে পড়ে যাবে গুরুদেব।

—না, যতটা সম্ভব—অতীন আর অশোককে দিয়ে আমি চালিয়ে নেব।

রাত অনেক হয়ে গেছে—গুরুদেবের শোবার ব্যবস্থা করে সিধু নিজের ঘরে এলো। অবন্তীর কথাটা মনেই ছিল না ওর। মনে থাকার মত কি-ই বা এমন ঘটেছে অবন্তীর সঙ্গে? সিধু বিছানায় শুয়ে ভাবছে। অনেকদিন হয়ে গেল সেই ঘটনাটা—কাশীতে অবন্তীর করুণ আবেদন—সিধুর আশ্বাস দান—আশীর্ব্বাদ—আবার ফিরে আসবার প্রতিশ্রুতি। তারপর? এই দীর্ঘদিনের বিশেষ কোনো খবর অবশ্য জানা নাই

অবন্তী সম্বন্ধে, কিন্তু সিদ্ধেশ্বর নিজে তো বিবাহিত জীবনের আনন্দাস্বাদে লুব্ধ নয়। নাই-বা এলো অবন্তী! অনর্থক তাকে জড়িয়ে নিজকে কেন সে দুর্ব্বল করতে চাইছে? —না, সে চাইছে না, তার প্রতিশ্রুতি, তার ধর্ম্ম তাকে চাওয়াচ্ছে। অবন্তী না এলে সিধুর সাধারণ জীবন কিছুমাত্র ক্ষতিগ্রস্থ হবে না—তার ধর্ম্ম ক্ষুণ্ণ হবে। কিন্তু অবন্তী কি সত্যি তার ধর্ম্মপত্নী? কৈ—কোথায়, কবে সিধু তাকে বিয়ে করেছিল? শুধু কথা দিয়েছিল, তার সন্তানের পিতা বলে সিধুকে সে পরিচিত করতে পারবে। ঐটুকু অধিকার—কিন্তু নারীর জীবনে ওর থেকে বড় অধিকার লাভ কমই আছে। সিধু কথা দিয়েছে—সে কথা তাকে রাখতেই হবে। তবে অবন্তীর সেই সন্তান বেঁচে নেই, এ খবর সিধু জানে। এখন সিধুকে স্বামী বলে পরিচয় দেওয়া-না-দেওয়া অবন্তীর ইচ্ছাধীন। যদিই সে দেয় সেই পরিচয়, তা হলেও সিধু তাকে নিয়ে সংসার করবে—এ আর সম্ভব নয়—সিধু চাইলো কুলুঙ্গীর দিকে—পাথরের নুড়িটা ফুল-ঢাকা।

উঠে এলো সিধু বিছানা থেকে; ওর পিতৃপুরুষের পূজিত শালগ্রাম,—ওর রক্তের অনুপরমাণুতে ঝঙ্কৃত হচ্ছে সেই পূজামন্ত্রের অবিনশ্বর বাণী, অপরিমেয় আনন্দানুভূতি—হিরণ্ময়বপু ধৃতশঙ্খচক্র—নিরাকার ঈশ্বরের সাকার শিলামূর্ত্তি—শূন্যের সুগোলকত্বে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ধৃতি-বৈভব, আর্য্য-প্রজ্ঞার অত্যাশ্চর্য্য নিদর্শন! সিধু প্রণাম করলো—নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা—ওঁ!

মনটা শান্ত হচ্ছে ধীরে ধীরে; ঈশ্বর নাই—কে বলে ঈশ্বর নাই। ঈশ্বরকে যে মানুষের বড় বেশি প্রয়োজন! তিনি না-থাকলে চলবে কেন মানুষের! তিনি নাই-বা থাকলেন হস্তপদবিশিষ্ট আকারে—অনন্ত-শক্তিমত্তার অহঙ্কারে, অশেষ করুণার আধারে নাই-বা থাকলেন তিনি? তাঁকে সৃষ্টিকরবার শক্তি যে রয়েছে মানুষের মনের মাধুর্য্য-মহিমায়! আপন

শ্রীলক্ষ্মী বুক স্টল

অন্তরের অনুভূতি আর আবেগ দিয়ে তাকে যে ইচ্ছানুরূপ সৃজন করে নেওয়া চলে। পিতারূপে, বন্ধুরূপে, স্বামীরূপে সখীরূপে তাঁকে সৃজন করে আপনার অন্তরবেদনার সহচর করা কি কম লাভের কথা? মানুষ কেন বোঝে না—ঈশ্বর না থাকলে ঈশ্বরের কিছুই যায় আসে না—কিন্তু মানুষের দেহাতীত সত্তার আশ্রয় কোথায়? দেহগত ভোগ-বিলাস, সুখ-দুঃখ মানুষ মনুষ্য-ভূমির অন্তহীন বৈচিত্র্যের মধ্যেই শেষ করে ফেলতে পারে—কিন্তু তারপর যে ক্লান্তি—মানুষের দেহাতীত সত্তার যে ক্ষুধিত আর্ত্তি, —যে দিব্য ক্ষুধা, তা পরিপূরণের উপায় কি? একমাত্র উপায় মানুষের মনোরাজ্যের সৃষ্ট ঐ লোকাতীত ঈশ্বর—ঐ দেহাতীত দেহী—ঐ গুণাতীত গুণময়ের সান্নিধ্যলাভ! নান্যঃ পন্থা!

আবার প্রণাম করে বিছানায় ফিরে এলো সিধু! প্রণাম, দেহ-মন-আত্মাকে একই সঙ্গে সমর্পণ—আপনার অন্তর-সৃজিত পরমানন্দের পাদমূলে নিঃশেষে সমর্পণ! যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি—যা করাও তাই করি। আমার মনরূপী অশ্বযুক্ত হৃদয়রথের হে সারথী—রথ চালাও,—"সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত!" দ্বিধা এবং দ্বন্দ্বের মধ্যে, ভালো এবং মন্দের মধ্যে, কুৎসিৎ আর সুন্দরের মধ্যে, দুর্নীতি আর সুনীতির মধ্যে—জয় এবং পরাজয়ের মধ্যে, জীবন এবং মৃত্যুর মধ্যে আমাকে তুমি স্থাপন কর অচ্যুত, যেখান থেকে আমি চ্যুত না হই। আমি দেখবো সবই, তার সঙ্গে তোমাকে দেখবো। তোমার সঙ্গেই আমি দেখতে চাই সব—তুমিই দেখে আমাকেও দেখাও—আমিই তুমি হও,—এক হও!

সিধু চোখ বুজে ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে গেছে কখন! বহু রাত্রে শুয়েছিল, অভ্যাসমত ঠিক উঠে পড়লো অনুদয়ে! নিকটস্থ নির্ঝরের তীরে একটু বেড়ায় সে রোজ—তারপর অবগাহন স্নান সন্ধ্যাবন্দনাদি করে আবার কুটিরে ফেরে। আজও চলে গেল সেইদিকে; কিন্তু গত কাল

রাত্রের আদেশটা মনে পড়ছে। ওকে যেতে হবে কলকাতা; গুরুদেবের আদেশ! যেতে কিন্তু ইচ্ছা নাই সিধুর!

গুরুর আদেশ, ঈশ্বরেরই আদেশ হিন্দুশাস্ত্র মতে, কিন্তু কর্ণবিজয় কানফোঁকা গুরু নন—তিনি শিষ্যদের স্বতন্ত্র স্বত্তা স্বীকার করেন; তাদের বিচারশীলতাকে গুরুত্বের মহিমার আঘাতে চূর্ণ করেন না—চিন্তাশীলতাকে ব্যাহত করেন না! তাই তিনি অধিক শ্রদ্ধেয় শিষ্যমণ্ডলীর কাছে। অধ্যয়ন অধ্যাপনার অভ্যন্তরে যে বজ্রগর্ভ বিদ্যুতের খেলা চলেছে এখানে এতদিন, কর্ণবিজয় তারই গুরু—তার সঙ্গে শিক্ষা-দীক্ষা-সমীক্ষারও গুরু! সিধু স্নানাদি সেরে ফিরলো, আজ আর বেড়ানো হোল না! ট্রেণের সময় ভোর সাড়ে ছটায়—সাধারণ বেশেই সিধু বেরিয়ে পড়ল শ্রীগুরুর পাদবন্দনা করে! ভারত স্বাধীন হয়েছে—এখন আর ছদ্মবেশের কোনো প্রয়োজন নাই। লালকেল্লা আজ আমাদের!

আমাদের? সত্যি আমাদের? সিধুর আনন্দ হাসিতে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। অবন্তীই তাকে শুনিয়েছিল লালকেল্লার কথা প্রথম। অবন্তী, অশনিভরা বিদ্যুৎ! তাকে আনতে যাচ্ছে সিধু আজ অনন্তর বন-পথের সঙ্গিনীরূপে! এক জন্মের জন্য নয়, অনন্ত জন্মের জন্য সিধু তাকে পেয়েছে। পথের ইঙ্গিত সেই তো দিয়েছিল সিধুকে—যদি আসে, সিধু সাদরে তাকে সঙ্গে আনবে! অবন্তীর উপর মোহগ্রস্ত হচ্ছে নাকি সিধু? আসক্ত হচ্ছে? আকর্ষিত হচ্ছে? সিধু চমকে উঠলো—না! সিধু উদাসী, ত্যাগী, বৈরাগী!

নিজের ঘরে বসে ভাবছিল উৎপলা। আজ অপরাহ্নে আশ্রমের মিটিং আছে। তারই য়্যাজেণ্ডাটা ওর হাতে; কিন্তু ও ভাবছিল অন্য কথা—আলোক সেদিন যে কথা বলেছিল। আলোক অসাধারণ বুদ্ধিমান;

আশ্চর্য্য সূক্ষ্ম তার বিশ্লেষণশক্তি, উৎপলার ভয় করে! কেন ওভাবে কথাগুলো সেদিন বললো সে? সেকি উৎপলার অতীত-জীবনরহস্যের কিছু জানে? কিছু আন্দাজ করেছে? কিছু শুনেছে কারো কাছে? কিম্বা ঐ ডাক্তারকে দেখে এবং উৎপলার সঙ্গে তার আলাপ আছে জেনেই আলোক কল্পনা করেছে কিছু তার সম্বন্ধে? উৎপলার অন্তরটা ব্যাকুল হয়ে উঠছে এক-একবার—কিন্তু সে বর্ত্তমানে স্থিতবুদ্ধি, শান্ত এবং গম্ভীর হয়ে উঠেছে—নিজেকে যে-কোনো অবস্থায় সামলে সাধারণ হবার ক্ষমতা সে অর্জন করেছে এই বছর কয়েকের আপ্রাণ চেষ্টায়। উৎপলা ভাবতে লাগলো—যদি জেনেই থাকে আলোক তার অতীত জীবন সম্বন্ধে কিছু,—তাতেই বা উৎপলার কি এসে যায়? সে তো বহুবার আলোককে জানিয়ে দিয়েছে—সে কোনো মহীয়সী সীতা-সাবিত্রী নয়।

নয়—উৎপলা নিজেই জানে সে কথা—কিন্তু সে তার আপন আত্মজের হন্ত্রী—এ সত্য নিজের কাছেও স্বীকার করতে ভয় পায় উৎপলা। চিন্তাটা মনে উদয় হবামাত্র ওর স্নায়ুকেন্দ্র যেন অবশ হয়ে আসতে থাকে—অসহায় বোধ করে উৎপলা। কিন্তু ও কাজের সাক্ষী তো কেউ নেই উৎপলার গর্ভধারিণী ছাড়া!

আলোকের সঙ্গে এই কিছুদিনের কাজকর্ম্ম, আলাপ-আলোচনার মধ্যে উৎপলার মন তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে শিখেছে, তার একমাত্র কারণ, আলোক আশ্চর্য্য চরিত্রবান। বহু মানুষের দ্বারা বিড়ম্বিত উৎপলার পূর্ব্বজীবনে আলোকের মত দৃঢ় চরিত্রের যুবকের দর্শন ঘটে নি। বিকাশ? দুর্ব্বলচেতা, স্বার্থলোভী—সুযোগ সন্ধানী একটা!—আলোকই একদিন বলেছিল—'তন্ত্রশাস্ত্রে মানুষ নাকি মূলতঃ পশু! উত্তম, মধ্যম আর অধম ভেদে পশু-মানুষ তিনপ্রকার।' উৎপলা অধম পশুই দেখেছে বেশি—মধ্যমও দেখেছে কিছু, কিন্তু তার মনশ্চেতনায় একজন মাত্র উত্তম পশুর

মূর্ত্তি জাগে—সে আলোকের! মানুষ যদি সত্যি পশু হয় তাহলে আলোক পশু-দেবতা, কিন্তু আলোকের উপর এই মন তার, তাকে অতি মাত্রায় বিড়ম্বিত তো করলোই—আলোককেও হয় তো বিপন্ন করলো! আলোক পদত্যাগপত্র দাখিল করেছে। ম্যাজেণ্ডার শেষে লেখা রয়েছে—"আলোক বাবুর পত্র সম্বন্ধে আলোচনা।" পত্রটা পদত্যাগপত্র কিনা, আলোক ইচ্ছা করেই য়্যাজেণ্ডায় সেটা বর্ণনা করে নি। মিটিংএ ঐ পত্র দাখিল না হওয়া পর্য্যন্ত সে কাউকে জানতে দিতে চায় না যে, সে পদত্যাগ করছে! জানে শুধু উৎপলা!

উৎপলা কি ওকে অনুরোধ করবে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করতে?—না! অনুরোধ রক্ষিত হবার কোনো আশা নেই; অনুরোধ করা উচিৎও হবে না! উৎপলার জন্যই সে পদত্যাগ করছে প্রধানতঃ—উৎপলার বুকটা মুচড়ে উঠলো!

নারী—নিতান্ত অসহায়া! হোক সে ধনবতী, হোক শিক্ষিতা, হোক আধুনিকা, সব দেশে, সব কালেই নারী সমাজের একটা যায়গায় একান্ত-ভাবে অসহায়া। সেটা তার চরিত্রে কলঙ্ক, তার নামে কুৎসা—তার আচরণে নিন্দা! এর থেকে অব্যাহতি নেই নারীর; কারণ নারীকে বিধাতা জীবস্রোত বহমান রাখবার প্রত্যক্ষ যন্ত্র হিসাবে নির্ম্মাণ করেছেন—নারী এ সত্য যতই অস্বীকার করুক—এইটাই সত্য! তার আচরণ তাই সকল যুগে, সকল দেশে, সকল মানুষের চোখেই কঠোর সমালোচনার বিষয়!—উৎপলা দীর্ঘশ্বাসটা বের করে দিল বুক থেকে!

চারটা বাজলো—পাঁচটায় মিটিং; তৈরী হয়ে নিতে হবে! প্রস্তুত হতে গেল উৎপলা। বিকাশকে নাকি ডাকা হয়েছে। সে মোটা টাকা ডোনেশন দিয়ে আজই মেম্বার হবে; ওদের কর্ম্মপরিষদেও ওকে কো-অপ্ট করে নেওয়া হবে! শুনেছে উৎপলা! বুদ্ধিটা কার তাও জানে! কেন,

সেটাও আন্দাজ করতে দেরী হোল না ওর। বিকাশকে দিয়ে আলোককে তার অন্তর থেকে নির্ব্বাসিত করার চক্রান্ত!—হাসলো উৎপলা মুখ টিপে। কাপড় বদল করলো ভালো করে। ওর অপরূপ সৌন্দর্য্য দ্যুতি বিস্তার করছে যেন। বিকাশ আসবে বলেই কি সাজ করলো অত ভাল করে?—না। উৎপলা নিজেই জবাব দিল নিজের অন্তরকে! তাহলে অত সাজসজ্জা করলো কেন? কারণ—উৎপলা খানিকক্ষণ চিন্তা করলো—অনেক কারণ। মিটিংএ আসবে যারা, তারাই আশ্রমটা চালাবার ভরসা; তারা ধনী, লোভী, বিলাসী। উৎপলাকে কেন্দ্র করেই তারা এখানে এসে ঘোরে; অজস্র অর্থ দান করে—অপরের কাছ থেকে আদায়ও করে দেয়—অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করে আশ্রমকে—উৎপলাকেও!

উৎপলাকে কেন ঋণে আবদ্ধ করে তারা? আশ্রম না চললে উৎপলার কি এমন ক্ষতিটা হয়? হয়—দেশের এইরকম মেয়েগুলো নিরাশ্রয়া হয়ে যায়; কিন্তু উৎপলা তার জন্য অন্যায়ভাবে টাকা উপার্জ্জন করতে পারে না! উৎপলা ভাবলো—অন্যায় তো কিছু করছে না সে! করছে না কি? নিজের রূপের জৌলুষে কয়েকটা পুরুষ-পতঙ্গের পাখা পুড়িয়ে ঐ মিটিংএ নাচাতেই তো চললো সে ওখানে! এ সত্য আর কেউ না বুঝুক, আলোক বুঝবে—তার বিশ্লেষণশীল দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়া চলে না!—উৎপলা দামী-কাপড় জামা বদলে সাধারণ ভদ্রবেশেই বার হয়ে গেল আশ্রমের উদ্দেশে!

মিটিংএর সময় হয়ে এসেছে; উৎপলা গাড়ী থেকে নেমেই একেবারে মিটিংরুমে এসে ঢুকলো; সকলেই অভ্যর্থনা করলো ওর। রেবতী সাজ-সজ্জা করে অপেক্ষা করছিল ওর জন্য—ওর সঙ্গেই ভেতরে ঢুকলো এসে! সে যেম্বার নয়, ছাত্রী, কিন্তু উৎপলা মিটিংএর সময় তাকে কাছে রাখে। নিজের এবং অন্য কারো কিছু দরকার হলে রেবতী এগিয়ে দেয়—মধ্যে মধ্যে আর

একটু হাসে—হাতের চুড়ি, মাথার চুল বা গলার লকেট নিয়ে খেলা করে বসে বসে; এছাড়া ওখানে ওর অন্য কোন কাজ নেই। ও নির্ব্বাক শ্রোতা-মাত্র; তবু উৎপলা ওকে কাছে রাখে—কেন রাখে তা জানে উৎপলাই। ওর বৈদ্যুতিক রূপ আর পুষ্পপেলব হাসি মিটিংএর লোকগুলোর চোখের সামনে ধরে রাখে উৎপলা—এতে উৎপলার দিকে নজরটা ওদের কিছু কম পড়ে—আর বেশি হয় এই আশ্রমের প্রতি ওদের আকর্ষণ!

কৃষ্ণা কোনোদিন মিটিংএ আসে না। সে বলে—'আমি ওসবের ধার ধারিনা পলাদি,—কাজ করতে এসেছি কাজ করে যাব। মিটিং নিয়ে তুমি যা হয় কর।' রেবতীকে সামনে রেখে উৎপলা মানুষগুলোর শাণিত দৃষ্টিবাণ এড়াতে চায়—কিন্তু এর পরিণাম কোথায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে—উৎপলা কোনোদিন ভেবে দেখেনি! আজো রেবতী বসলো উৎপলার পাশে! মিটিং আরম্ভ হয়ে গেল ঠিক পাঁচটায়!

যথারীতি ইংরাজী-অনুশাসন মত মিটিং। একজন চেয়ারম্যান নাম, স্যার ব্রহ্মানন্দ আচার্য্য; এই আশ্রমের জন্য তিনিই বাড়ী দিয়েছিলেন, এবং তদবধি চেয়ারম্যান আছেন। উৎপলা বরাবর সেক্রেটারী আছে; এ ছাড়া 'জয়েন্ট', 'এসিস্টেন্ট', 'সাব'—ইত্যাদি পদেও আছেন অনেকে! উৎপলা ছাড়া আর দুজন মহিলা মেম্বারও আছেন, তাঁরা সহরের এবং দেশের বিখ্যাত বিদুষী!

স্বাধীনতাকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রথম প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল, তারপর নেতাদের এবং অন্যান্য দেশবরেণ্য ব্যক্তিদেরও জানানো হোল অভিনন্দন; অতঃপর কর্ম্মপন্থা স্থিরীকৃত হবে! তুমুল তর্ক চলতে লাগলো এই নিয়ে। কথায় কথায় কাটাকাটি—পরস্পরকে বাক্যবাণে আঘাত করবার প্রচেষ্টা বেশ লক্ষ্য করা যায়। রেবতী মাঝে মধ্যে হাসতে লাগলো—বেণীটা নিয়ে খেলা করতে লাগলো আনমনে; কিন্তু আজ

একজন নতুন লোক এসেছে, ওর দিকে চাইছে—যেন কি এক রকম ভাবে! রেবতীর ভয় হচ্ছিল প্রথমটা, কিন্তু সে তখুনি ভেবে নিল—সমাজ-সংসার সে হারিয়েছে—তার আবার ভয় করবার কি আছে! সপ্রতিভ, সাবলীল হয়ে উঠলো রেবতী আবার। লোকটা চাইছেই। হাসলো রেবতী মধুর—মঞ্জুহাসি!—ঐ নতুন লোকটি কিন্তু তর্কে একেবারে যোগ দেয় নি! মিঃ মাকু বলছিলেন—এ সব দেশ-হিতকর কাজে সরকারী সাহায্য এখন প্রচুর পাওয়া যাবে—এবং জনগণের সমর্থনও লাভ করা যাবে বিপুলভাবে। অতএব আমাদের কর্ম্মতালিকা বিরাট এবং বিস্তৃত করা হোক—বঙ্গে, বৃহত্তর বঙ্গে, সারা ভারতে, এমন কি বহির্ভারতেও আমাদের অভিযান চালানো হোক, বিপন্না নারীর উদ্ধারের জন্য, আশ্রয় দানের জন্য, আর্থিক স্থিতি লাভের জন্য!

—কিন্তু আমাদের ক্ষমতা এখনো অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। জনৈক সভ্য বললেন!

—বাংলাতেই নারী-সমস্যা বহু, ব্যাপক, জটিল—ভারতের কথা এখন আমাদের ভাবা উচিৎ নয়।—অপর ব্যক্তি বললেন।

—তা ছাড়া আমাদের কর্ম্মপন্থাই তো ঠিক হয় নি এখনো—অন্যজন বললেন।

বাংলার বড় বড় সহরে ব্রাঞ্চ খুলতে হবে—কর্ম্মী নিযুক্ত করতে হবে; টাকা চাই! সে টাকা আনতে হবে বদান্য ব্যক্তিদের পকেট কেটে—বললেন জনৈক হালদার!

—পকেট্ কেটে?—মিঃ মাকু চীৎকার করে উঠলেন—এরকম ইল্লেজিটিমেট্ কথা……

হা-হা-হা! হি-হি-হি! হো-হো-হো! হাসির বান ডেকে উঠলো সভায়। প্রেসিডেণ্ট বললেন—আঃ থামুন থামুন—ওঁর কথাটা ইল্লিগেল কি না দেখা দরকার।

—এরকম ইল্লেজিটিমেট্…আই মিন ইল্লে…মিঃ মাকু চেঁচাচ্ছেন।

—হ্যাঁ মিঃ মাকু, ওঁর কথাটা ইল্লিগেল কি না বিচার করা হোক। উনি হয়তো 'পকেট থেকে' বলতে গিয়ে 'পকেট কেটে' বলে ফেলেছেন!

—স্যরি—স্যার ঠিকই ধরেছেন…হালদার মাক্ চাইল। কিন্তু হাসি তখনো থামছে না! মিঃ মাকু তাঁর ইংরাজীবিদ্যাটার জন্য অতিশয় ক্ষুব্ধ হয়ে অধোমুখ হয়েছেন। হঠাৎ বলে উঠলেন—নেক্সট্ নেক্সট্!

নেক্সট্ অর্থাৎ পরবর্ত্তী প্রস্তাবটী 'কর্ম্মসচিব' নাম বদলে 'হেড্ ক্লার্ক' করা সম্বন্ধে! আগের প্রস্তাবটা হাসির ধমকে হারিয়ে গেলেও মিঃ মাকু নেক্সট্ প্রস্তাব তুলবার অধিকারী নন—কিন্তু কে শোনে কার কথা! সভাপতি অত্যন্ত সুচতুর ব্যক্তি। তিনিও অবস্থা বুঝে বললেন, —আগেরটার সম্বন্ধে তিনজন সভ্যকে নিয়ে একটা সাব-কমিটি গঠন করা হোক—মিঃ মাকু, মিঃ হালদার আর মিঃ গায়েনকে নিয়ে।

সকলে সমর্থন করার পর সভাপতি বললেন—নেক্সট্!

বিশেষ বাদ-প্রতিবাদ উঠলো না—'কর্ম্মসচিব' স্থলে 'হেড্-ক্লার্ক' নাম রাখা স্থির হয়ে গেল। অনারারী মেম্বারদের সঙ্গে মাইনে-খাওয়া চাকরের মর্য্যাদা সমান হতে পারে না—এই সত্য সকলেরই সমর্থন পায়। মিঃ মাকু আলোকের দিকে তাকাচ্ছেন। আচ্ছা জব্দ করে দিলেন তিনি আলোকনাথকে! বুঝুক এবার বাছাধন!

কিন্তু আলোকনাথের কোনোরকম বৈলক্ষণ্য নেই। সে নিশ্চিন্তে প্রস্তাবগুলো লিখে নিচ্ছিল সর্টহ্যাণ্ড নোটবুকে!

—নেক্সট্!—সভাপতি বললেন!

—আলোকবাবুর দরখাস্ত! উনি পদত্যাগ করেছেন!—উৎপলা বললো!

ঠাণ্ডা মেরে গেল মাকুদের হাসির উষ্ণতা। মিনিটখানেক চুপ হয়ে রইল সভা। হঠাৎ মিঃ মাকু সজোরে বলে উঠলেন—সেকি? সেকি কথা? পদত্যাগ!

—হ্যাঁ!—উৎপলা সংক্ষিপ্ত জবাব দিল—উনি অনুরোধ করেছেন এই পত্র গ্রহণ করতে!

—সে তো করবেনই; কিন্তু কেন?—মিঃ মাকু প্রশ্ন করলেন!

—না-না, ওঁকে কি ছাড়া যায়? এই আশ্রমের প্রথম দিন থেকে উনি আছেন!—একজন বললেন।

—উনি যতদিন থাকবেন কর্ম্মসচিবই থাকবেন।—অন্যজন বললেন।

—না—তা আর হয় না—সে প্রস্তাব পাশ হয়ে গেছে—মিঃ গায়েন বললেন—তবে ওঁকে এ্যাসিটেণ্ট কিংবা সাব এ্যাসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী করে নেওয়া যেতে পারে।

—যা হয় করুন—ওঁকে ছাড়া যায় না। উনি অসাধারণ কর্ম্মী!

—কেন আপনি পদত্যাগ করছেন আলোকবাবু!—সভাপতি শুধুলেন।

—আমি পদত্যাগ-পত্রেই সে কথা লিখেছি।—আলোক আস্তে বললো!

—ঐটাই কি সত্য? ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার জন্য আপনি চলে যেতে যান?—মিঃ মাকু বললেন কথাটা। আলোক চাইল, হাসল একটু। বললো,

—আমার লিখিত বিষয়ের সত্যাসত্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করা আইনবিরুদ্ধ, মিঃ মাকু, এতে আমাকে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত করতে চাইছেন আপনি!

—আয়্যাম স্যরি!—মিঃ মাকু রক্তবর্ণ হয়ে উঠছেন!

—আচ্ছা, আপনাকে মার্জ্জনা করলাম—হাসলো আলোক। ওর কথা বলার ভঙ্গীতে সকলেই হেসে উঠলো।

সভাপতি বললেন—আপনি প্রথম দিন থেকে আছেন। আপনাকে আমরা ছাড়তে চাই না—আপনার উন্নতির পরিপন্থী এখানে কোথায়, জানাবেন ?

—ইচ্ছা নাই আমার ; মাফ্ করবেন।

—আপনার বেতন উপযুক্ত হচ্ছেনা ? দরখাস্ত করুন ; বিবেচনা করে নিশ্চয় বাড়িয়ে দেওয়া হবে আসছে মাস থেকে !—মিঃ মাকু বললেন।

—আমি আবার আপনাকে মার্জ্জনা করলাম মিঃ মাকু ; বেতন বৃদ্ধিটাই আমার উন্নতির একমাত্র অঙ্গ বলে আমি মনে করি না।

—ওঃ স্যরি—তাহলে আপনার চলে যাবার কারণটা কি ? পারশোন্যাল কিছু ?

—আপনি এ প্রশ্ন করতে পারেন না আমায়—আলোক ধীর ভাবেই বলল—মনে রাখবেন, আমার পারসন্যাল কিছু জিজ্ঞাসা করবার মত আত্মীয়তা আপনার সঙ্গে আমার নাই,—বিশেষতঃ, মিটিংএর মধ্যে আপনি তা করতে পারেনই না। তবু আমি তৃতীয় বার আপনাকে মার্জ্জনা করলাম !

মিঃ মাকু মাথা নামিয়ে নিলেন। হালদার বললেন—উনি পদত্যাগ করছেন—কোনো প্রশ্ন না করে ওঁকে ওটা প্রত্যাহার করতে বলা হোক ; কি বলেন ?

—ওঁর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কি ভরসা আমরা দিতে পারি ?—বললেন জনৈক ভদ্র !

—উনি যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করেই এই আশ্রমের সেবা করেছেন এতদিন—বললেন মিসেস গুপ্তা ; লেডী মেম্বারদের একজন।

মিসেস মিত্র বললেন—ওঁর কর্ম্মদক্ষতা অসাধারণ !

—নিশ্চয় !—কথাটা সমর্থন করলেন জন পাঁচ-সাত !

—আপনাকে আমরা অনুরোধ করছি, আপনি এই পত্র প্রত্যাহার করুন আলোক বাবু—আমরা পরবর্ত্তী প্রস্তাব গ্রহণ করছি—"আলোক বাবুর পদের নাম হবে সহকারী সম্পাদক"—আশা করি রাজি হবেন ! সভাপতি বললেন অনুরোধের সুরে !

—কোনো পদাধিকার পেতে আমি চাইছি না……। আমি জীবনের পথে এখানে এসে পড়েছিলাম—বুঝলাম, এ-স্থান আমার কর্ম্মভূমি নয় ; বুঝতে খুবই দেরী হোল আমার, কিন্তু বুঝেছি ! এখন আর কোনো অনুরোধ করে আমাকে লজ্জা দেবেন না। আমি স্থির-সঙ্কল্প।—আলোক উত্তর দিল।

গৃহীত হয়ে গেল পদত্যাগ-পত্র। অবশ্য দুঃখ জানালেন সকলেই ; মিটিং শেষ হোল—ঠিক হোল, আলোক উৎপলাকেই চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে যাবে।

ভাদ্রের ভ্যাপ্‌সা গরম—উৎপলা ভালো সরবৎ তৈরী করিয়ে রেখেছিল—রেবতীকে দিয়ে পরিবেশন করালো। সকলে খাচ্ছে।

—তুই এখানে কদ্দিন ছিলিরে আলোক ?—বিকাশ হঠাৎ উঠে প্রশ্ন করলো !

—প্রায় বছর তিন—আলোক হেসে বললো।

—তুই শেষকালে একটা আশ্রমে এসে চাকরী করছিস ? আশ্চর্য্য !

—ওর থেকেও আশ্চর্য্য আছে বিকাশ !—আলোক মৃদু হেসে বললো।

—আছে ! কি সেটা আলোক ?

—এই আশ্রমে এতদিন তোর না-আসা !—হাসলো আলোক আবার একটু।

উৎপলা তাকাচ্ছে আলোকের পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ; মিঃ মাকু এবং মিঃ গায়েন জানতেনই না যে বিকাশ আলোকের সঙ্গে পরিচিত। বিকাশ

শুধুলো আলোককে,—তুই এতে কি 'মীন্' করতে চাস আলোক? আমি আসি নি, সেটা আশ্চর্য্য কেন?

—কারণ, রাজনীতি আর সমাজনীতি নিয়ে তুই দীর্ঘকাল চর্চ্চা করছিস; একটা কাগজও নাকি চালাস—এ তো তোরই কাজের ক্ষেত্র!—আচ্ছা ভাই, আমি চললাম!—আলোক চলে গেল! কি বলে গেল? কথাটা তো সে বেশ বললো, কিন্তু ওর অভ্যন্তরে কি আছে গভীর, গূঢ় অর্থ?

আলোক যাওয়ার পর মিঃ মাকু প্রশ্ন করলেন—ওঁর সঙ্গে কোথায় পরিচয় আপনার?

—আমার সহপাঠী!—বিকাশ বলল আস্তে—ওর বাসা কোথায় উৎপলা দেবি?

—থাকেন এখানেই! আজই হয়তো চলে যাবেন।—উৎপলা জবাব দিল!

বিকাশ তখুনি বেরিয়ে গেল আলোকের সন্ধানে।

শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছে সিধু!—শ্বশুরবাড়ী! মানুষের মনের মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতা। সিধুর আবার শ্বশুরবাড়ী কোথায়—? কবে বিয়ে করে ঘর-সংসার করলো সিধু! কি সব বাজে চিন্তা আসে ওর মাথায়—দূর!—নিজকে স্থির করলো সিধু!

হাওড়া ষ্টেশনে নেমেছে সকাল সাড়ে ছটায়। পুল পার হয়ে এদিকে এসে গঙ্গায় স্নান করতে নামলো—চিন্তাটা ঠিক সময় মাথায় এল! না—শ্বশুরবাড়ীর আদর-অভ্যর্থনা বা অবন্তীর কাছ থেকে আনন্দ-বিলাস লাভ করবার জন্য সিধু আজ আসছে না এখানে—তার আসার প্রয়োজন আরো গুরু!

হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে গামছা দিয়ে গা মাজতে-মাজতে সিধু ভাবছিল—ওর ঝোলাতে আছে সাধুর ব্যবহার্য্য দ্রব্য, তার সঙ্গে সাধারণ কাপড়-জামাও, আর ঐ ছোট থলেটিতে আছে শালগ্রাম-শিলাটি—সিধুর পৈত্রিক সম্পদ! স্নান-পূজা এখানেই সেরে নিয়ে সাধারণ কাপড়-জামা পরেই সে যাবে ওখানে। গতবছর যখন এসেছিল, তখন অবন্তী তার নতুন বাড়ীতে যায় নি—কাশীতেই ছিল। নতুন বাড়ীটা দেখেনি সিধু এখনো! কিন্তু অবন্তী যদি গতবারের মত এবারও বলে—'তার শারীরিক সামর্থ্য আর অভ্যাসের অভাবের দরুন সে যেতে পারবে না সিধুর সঙ্গে'।—সিধু কোমর-জলে নেমে ভাবছে!

বলে, বলবে! অবন্তীকে নিতে এসেছে সিধু, নিজের জন্য নয়—তাদের সঙ্ঘের শক্তি বাড়াবার জন্য, শ্রীগুরুদেবের আদেশ পালন করবার জন্য, আর নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য। মূলতঃ প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্যই সে এসেছে আজ! আজই শেষবারের মত আশা। অবন্তী যায় যাবে—না যায়, তার যা-ইচ্ছা করবে।

কিন্তু কি জটিল পরিস্থিতি সিধুর জীবনে! একটা মেয়েকে বিয়ে না করেও সে তার স্বামী হয়ে বসেছে! সিধু কোনোদিন তাকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করে নি। তার রূপযৌবনের উপর লোভ হয়তো ছিল সিধুর মনে একদিন, কিন্তু আজ—সিধু একটা ডুব দিয়ে উচ্চারণ করলো—ওঁ গঙ্গা-গঙ্গা-গঙ্গা গঙ্গায়ৈ নমঃ। সদ্য পাতক সংহন্ত্রী সদ্য দুঃখ বিনাশিনী···সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা···স্তোত্র-মন্ত্র মনে পড়তে লাগলো সিধুর অভ্যাসমত। কিন্তু আশ্চর্য্য! স্তোত্র সে ঠিকই আউড়ে চলেছে, অথচ মনে সে চিন্তা করছে অন্য কিছু! —অবন্তী হয়তো এবারও জবাব দেবে; হয়তো বলবে—'আমার শরীর খুব খারাপ সিধুদা'—কিম্বা হয়তো বলবে 'তোমার সঙ্গে বনে-জঙ্গলে কোথায় আমি ঘুরতে যাব সিধুদা'—কিম্বা হয়ত সরাসরি অস্বীকারই

করবে সিধুর পত্নীত্ব!—অস্বীকার করবে? সিধুর মনে প্রচণ্ড ধাক্কা লাগলো!

ওঁ নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গোব্রাহ্মণ···সজোরে উচ্চারণ করলো সিধু। মনে পড়লো, এতক্ষণ কি স্তোত্র সে গাইছিল মনে নাই—হয়তো সবই ভুল করেছে! আশ্চর্য্য অস্বস্তি মনের! একি করছে সিধু? সে সংসারমুক্ত সন্ন্যাসী হবার সাধনায় দীক্ষা নিয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর তাদের কাজ শুধু লোক-কল্যাণ, জীবপ্রেম, জগত-হিতসাধন! তুচ্ছ অবন্তীর জন্য সিধু এতটা বিচলিত হচ্ছে কেন আজ! না—সিধু আর ও চিন্তা করবে না। প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থ তার কাছে যাওয়া প্রয়োজন—যাবে—তার উত্তর নিয়ে ফিরে যাবে। আর যদি সে অনুগমনই করে সিধুর·····

"জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ"—সর্ব্বনাশ! প্রায় পাঁচ মিনিট আগে প্রথম লাইনটা বলে এতক্ষণে সিধু দ্বিতীয় লাইনটা বললো! ছিঃ ছিঃ! সিধু করছে কি!—মায়া—মোহ—পাপ চিন্তা! সিধু আরো কয়েকটা ডুব দিয়ে নিল তাড়াতাড়ি—যেন পাপটা ধুয়ে পবিত্র হয়ে যেতে চাইছে! উঠে এসে ছোট থলেটা খুলে শিলাটি বের করলো—তুলসীপত্র, চন্দন সংগ্রহ করাই ছিল—কিনে নিয়েছিল সিধু ওখানেই—পুজো করতে বসলো। মন্ত্র বলছে! মন্ত্র বলছে—কিন্তু মনে মনে যে অবন্তীর কথাই ভাবছে সিধু! একি বিপদ! একি কঠিন পরীক্ষা! সিধুর বুকের ভেতর যেন যন্ত্রণাবোধ হচ্ছে! কিন্তু কেন! অবন্তী আসবে তার সঙ্গে—আসবেই। না এসে তার উপায় কি আছে? কোথায় যাবে, কি করবে সে না এসে? সিধুকে আশ্রয় করেই তাকে কাটাতে হবে জীবন। সিধু স্বস্তি বোধ করছে! সে চলেছে নিজের বিবাহিত পত্নীর কাছে।—বিবাহিত? না—কিন্তু বিবাহ জিনিষটা তো মাত্র লোকাচারেই আবদ্ধ নয়—বিবাহ বিশেষরূপে বহন

করবার প্রতিশ্রুতি। সিধু দিয়েছে সে প্রতিশ্রুতি অবন্তীকে! পূজা শেষ করলো!

জামাকাপড় বের করে পরলো সিধু; ঝোলাটা নিতান্তই সন্ন্যাসীদের ঝোলা—ছাইভস্ম লেগে রয়েছে ওতে,—ওগুলো নিয়ে অবন্তীর বাড়ী যাওয়া ঠিক হবে কিনা, এক মিনিট ভাবলো; কিন্তু কোথায় ওগুলো রেখে যাবে? ঘাটের উপর যারা স্নানার্থীদের জন্য তেল রাখে—গামছা দেয়—কাপড়-চোপড় রেখে স্নানের ব্যবস্থা করে—তাদের কাছে রেখে গেলে কিছু মন্দ হয় না! এমন কিছু মূল্যবান বস্তু ওতে নেই যে চুরি করবে কেউ। সিধু উঠে এসে ঘাটের মণ্ডপে-বসা একজন দোকানীর জিম্মায় রেখেদিল ঝোলাটা, কিন্তু শালগ্রাম শিলাটি রাখতে মন সরছে না ওর! গলায় ঝুলিয়ে নিলে হয়, কিন্তু দেখতে বড় বিশ্রী হবে! সাজপোষাক সম্বন্ধে সিধুর একদিন অত্যন্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল—সেই আদিম বৃত্তিটা বাধা দিচ্ছে আজ—আশ্চর্য্য মানুষের মন, অত্যাশ্চর্য্য তার মৃগতৃষ্ণিকা! শেষ পর্য্যন্ত সিধু শিলাটিকেও জিম্মা দিলে ঐ দোকানেই!

অবন্তীর নতুন বাড়ীর ঠিকানা জানা আছে তার—কালীঘাটে এসে নামলো বাস থেকে! এবার মিনিট চার-পাঁচ হাঁটলেই অবন্তীর বাড়ী—কিন্তু এতক্ষণে সিধুর আবার সংশয় জাগছে মনে—কে জানে, কি বলবে অবন্তী! হয়তো হাসবে সিধুর দুর্ব্বলতা দেখে—তার সন্ন্যাস নেওয়া উপলক্ষ্য করে বিদ্রূপ করবে হয়তো!—কিন্তু এতখানা এসে আর ফিরে যাওয়া চলে না। ঈশ্বর স্মরণ করে সিধু অবন্তীর বাড়ীর গেটে ঢুকলো। সাধারণ ভদ্রলোকের মতই জামা কাপড় তার! কপালে গঙ্গামৃত্তিকার তিলক ছাড়া সন্ন্যাসের আর কোনো লক্ষণ নেই চেহারায়। অবন্তীর বাচ্চা চাকরটা ওকে প্রশ্ন করলো—কাকে চান?

—অবন্তী দেবীর বাড়ী এটা? তিনি কি বাড়ীতে আছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—আছেন। বসুন, খবর দিচ্ছি! আপনার কার্ড?

—কার্ড নাই—বলো, আমার নাম সিদ্ধেশ্বর!—সিধু হলঘরে ঢুকে বসলো!

চাকরটা গেল খবর দিতে অবন্তীকে। সকালের স্নান শেষ করে বারান্দায় বসে চুলগুলো শুকোচ্ছিল অবন্তী। সেদিন আলোক আর উৎপলাকে নিয়ে মা'র কাছে গিয়েছিল; সেখানেই ছিল আট-দশ-দিন—গত কাল মাত্র ফিরেছে! মা'র কাছে এই কয়েকদিন থেকে অবন্তীর মনের সুরে কিছুটা পরিবর্ত্তন ঘটেছে। অবশ্য সে পরিবর্ত্তন এখনো ওর আভ্যন্তরীণ জীবনে কোনো ক্রিয়াই করতে পারে নি—তবু বোঝা যায়, অবন্তী অনেকটা স্থির, শান্ত হয়ে উঠেছে! নিজকে যেন প্রস্তুত করে ফেলেছে সে যে-কোন অবস্থার সম্মুখীন হবার! উৎপলা তাকে একদিন তাঁর 'বিশ্বেশ্বরী আশ্রম' দেখতে যাবার জন্য নিমন্ত্রণ করেছিল—আজই যাবে কি না ভাবছে অবন্তী। গতকাল নাকি ওখানে কমিটি-মিটিং হয়ে গেছে! আজ গিয়ে অবন্তী দেখে আসবে আশ্রমটা, উৎপলাকে আর আলোকদাকেও।—দশটার মধ্যেই বেরুবে, চুলগুলো তাই শুকিয়ে নিচ্ছিল অবন্তী!

—সিদ্ধেশ্বরবাবু এসেছেন—মেম্ সাব—বাচ্চাটা এসে বললো!

—কে এসেছেন!—অবন্তী সচমকে প্রশ্ন করলো। কিন্তু সে শুনেছে 'সিদ্ধেশ্বর' নামটা!

—সিদ্ধেশ্বর বাবু—চাকরটা আবার বললো। উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছে চাকরটা!

—বসতে বলো। আসছি!—অবন্তী চাকরটাকে বিদায় করে বাঁচলো যেন।

তাহলে সিদ্ধেশ্বর এলো আবার—তাকে নিতেই এসেছে নিশ্চয়। কি এখন করবে অবন্তী? যাবে। যাওয়াই উচিৎ তার। না গিয়ে কি করবে অবন্তী এখানে?—এই কলকাতা শহরের অসহায়তায় করবার মত কাজ

তো খুঁজেই পাচ্ছে না সে কিছু। উৎপলার আশ্রয়ের কর্মী হতে পারে—সমাজের সেবিকা হ'তে পারে—সিনেমার অভিনেত্রী হতে পারে—শহরের কদর্য্যতার অন্ধকারে ডুবেও যেতে পারে কিন্তু তাতে লাভটা কি অবন্তীর! অবন্তী আলোককে হারিয়েছে, অন্ধকারকে বরণ করতেও প্রস্তুত হয়েছে, সেটা যে-ভাবেই হোক! সিধুর সঙ্গে গিয়ে সন্ন্যাসিনীর জীবন যাপনও তার পক্ষে অন্ধকার! কিন্তু সিধু যদি তাকে নিয়ে ঘর-সংসারই করে?—অবন্তীর অন্তরটা দোলায়িত হয়ে উঠলো অকস্মাৎ। হ্যাঁ—তা করতে পারে। যদি করে,—ভালো কথাই তো! কিন্তু অবন্তী একটা প্রেমহীন, আলোহীন, অন্ধকারময় জীবন যাপন করবে সিধুর সঙ্গে?—তাই করবে! এছাড়া উপায় কি অবন্তীর? একটা জীবন এই ভাবেই কাটিয়ে দেবে সে। ভাবতে ভাবতে উঠলো অবন্তী!

যে অধিকার নিয়ে সিধু আজ এখানে এসেছে, তাতে তাকে নীচে বসিয়ে রাখা নিশ্চয় উচিৎ হচ্ছে না—অবন্তী উঠে কাপড়খানা সামলাতে সামলাতে চাকরকে বললে—ওঁকে উপরে আসতে বল!—অবন্তী আয়নায় মুখখানা দেখে নিল একবার। নন্দ নামধারী সেই বাচ্চা চাকরটা আশ্চর্য্য হোল কিঞ্চিত। কারণ এপর্য্যন্ত এ বাড়ীতে-আসা কোনো অতিথিকেই অবন্তী উপরে আসবার আদেশ করে নি! কে জানে, কে ঐবাবুটি! নন্দ ডাকতে গেল সিদ্ধেশ্বরকে।

পাঁচ-সাত মিনিট মাত্র একা বসে আছে সিদ্ধেশ্বর। সম্পূর্ণ নতুন আসবাবে সাজানো ঘরটা—তার আসন-কুশন, আলমারী, ওয়ালনট সবই আভিজাত্যের পরিচায়ক! পুরু কার্পেটে ঢাকা মেঝেটায় পা দিলে মনে হয়—মাটিতে নেই; একবারে স্বর্গে ই এসে পড়েছি! ওদিকে ছোট রেডিও

যন্ত্রটা মৃদু স্বরে গান বাজাচ্ছে! এদিকে কয়েকটা ফুলের টবের ফুলগুলো গন্ধ ছড়াচ্ছে—সামনের রাস্তাটায় সুবেশ নরনারী চলে যাচ্ছে লেকের দিকে, বা লেক থেকে ফেরত! স্থানটার অদ্ভুত একটা আকর্ষণীয় পরিবেশ। গিরিগুহাবাসী সিধুর কাছে সত্যি মনোরম। কিন্তু এই পরিবেশ সাধনার পরিপন্থী—ব্রহ্মচর্য্যের বিরোধী—বিলাসের সহায়ক! জলনিমজ্জিত ব্যক্তির মতই আঁকু-পাঁকু করছে সিধুর অনভ্যস্থ অন্তর; কিন্তু আশ্চর্য্য! ওর মনের অতল তলে যেন একটা তীব্র চেতনা অনুভূত হচ্ছে—এই বৈভব,এই ব্যসন, এর অধিকারিণী, সবই সিধুর—একান্তই সিধুর নিজস্ব সম্পদ! সন্ন্যাসের উষ্ণ-কৃচ্ছ্র তাকে অবদমিত করে সেই হিমশীতল হাতখানা যেন কণ্ঠরোধ করে দিতে আসছে সিধুর—না,—হাতবুলিয়ে দিতে আসছে তার সাধনক্লান্ত শরীরে-মনে-মানসিকতায়!—সিধু আতঙ্কিত হয়ে উঠলো। গলায় হাত দিল—শালগ্রাম!—নেই!

—আপনাকে উপরে আসতে বললেন হুজুর!—নন্দ দরজায় দাঁড়িয়ে বলছে!

—উপরে?—কেন?—ও—আচ্ছা, যাচ্ছি!—সিধু উঠে পড়েছে নিজের অজ্ঞাতসারে। কিন্তু তখনো তার হাতখানা বুকে—শালগ্রাম নাই তার বুকে, নাই; সেখানে আছে অবন্তীর উপর লোভ—বিলাসের কামনা—বাসনের আসক্তি! উঃ! সিধু এ করছে কি? কেন এলো সিধু এখানে? না—সিধু দেখা করবে না অবন্তীর সঙ্গে! দরকার নাই! বেশ আছে অবন্তী—খুবই ভাল আছে। সিধুকে তো প্রয়োজন নাই তার আর! যেজন্য সিধুকে চেয়েছিল অবন্তী, সে প্রয়োজন তো ফুরিয়ে গেছে—আবার কেন সিধু তাকে জড়িয়ে রাখতে এল?—সিধু দেখা করবে না।

কিন্তু কর্ণবিজয়ের আদেশ—নিজের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি—সঙ্ঘের শক্তি বর্দ্ধন—সিধু আস্তে এগুতে লাগলো সিড়ির দিকে! দেখা তাকে করতেই

হবে—অনুরোধও করতে হবে অবন্তীকে তার সঙ্গে যাবার জন্ত। কর্ত্তব্য থেকে চ্যুত সে হতে পারে না! সিধু টপ্‌টপ্‌ করে সিড়িগুলো ভেঙে উপরে উঠে এলো! অবন্তী সিড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে। মাথায় কাপড়—মুখে হাসিও একটু! মৃদু মিষ্টি গলায় বললো,—এসো! শরীর ভালো আছে?

—হ্যাঁ—তোমাদের সব মঙ্গল অবন্তী?—সিধু কথাটা বলতে বলতেই সামনের ঘরে ঢুকলো। অবন্তীর বসবার ঘর—টেবিল, চেয়ার, আলমারীতে সাজানো; দেওয়ালে অর্দ্ধনগ্ন বিলাতী ছবি,—অপূর্ব্ব সুন্দর দৃশ্য-চিত্র—অনেকগুলো আলোকচিত্রও একদিকের একটা টেবিলের উপর ফটো-ফ্রেমের মধ্যে রয়েছে! অধিকাংশই অবন্তীর ফটো, নানাভাবে. নানা ভঙ্গীতে, নানা পোষাকে তোলা। অবন্তীর মা এবং বাবার ছবিও রয়েছে। আরো যে দু'তিনটা ছবি রয়েছে, সেগুলো সিধুর অচেনা! কিন্তু অবন্তী কোথায়?

অবন্তী অন্য ঘরে চলে গেছে সিধুকে অভ্যর্থনা করেই! সিধু বসলো একখানা স্প্রিংএর গদি আঁটা চেয়ারে! চমৎকার চেয়ার—অত্যন্ত আরামের। ওরই সুমুখে বড় আয়নাটায় সিধুর উপবিষ্ট মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হয়েছে—সিধু দেখতে পেল। অন্য একটা লোককে দেখ্‌ছে যেন—এমনি ভাবে চেয়ে রইল সিধু নিজের প্রতিবিম্বের পানে মিনিটখানেক! কে ঐ লোকটা? সিদ্ধেশ্বর? কিন্তু সিদ্ধেশ্বর তো অমন বাবু নয়—অন্তত বছর কয়েক থেকে ওরকম বেশে থাকে না সে—তাহলে কে ঐ আরসীর মধ্যেকার লোকটা? সিদ্ধেশ্বরই! সেই আগেকার দিনের সিদ্ধেশ্বর—সেই চরিত্রহীন, গাঁজাড়ে সিদ্ধেশ্বর!

সিধু চমকে উঠলো! ও কেন তার চোখের সামনে? তাকে তো বহু দিন হত্যা করেছে সিধু! না—হত্যা নয়—নির্ব্বাসিত করেছিল, কিন্তু ওর নির্ব্বাসনের মেয়াদ শেষ হলে ফিরে এসেছে নাকি আবার এখানে? ওঃ!

সিধু উঠে দাঁড়ালো—অস্বস্তিতে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ালো ঘরটার মধ্যে! ছোট টেবিলটায় অবন্তীর লেখবার সরঞ্জাম—প্যাড্, ফাউন্টেনপেন, পেপারওয়েট—দামী টেবিল-ল্যাম্প—আর একগাছা লম্বা চুল—কার? অবন্তীরই নিশ্চয়! আর কার হতে যাবে! সিধু সরে এল ওখান থেকে।

—হাত মুখ ধোও—ঐ পাশেই বাথরুম—অবন্তী দরজায় দাঁড়িয়ে বলছে!

—আমি স্নান করে এসেছি অবন্তী—সিধু নীচু মাথায় জবাব দিল!

—তাহলে এসো—জলখাবার দিই।—অবন্তীর কণ্ঠস্বরে মাধুর্য্য, মমতা, মত্ততা!

—জল-খাবার! আমি তোমাকে আমার গুরুর আদেশে সঙ্ঘে যোগ দেবার অনুরোধ জানাতে এসেছি অবন্তী—তুমি কি এখন যেতে প্রস্তুত আছ?—সিধু এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে যেন বেঁচে গেল!

অবন্তী চক্ষু বিস্ফারিত করে বললো,

—এই তো এলে! সে-সব কথা পরে হবে! এখুনি কি করে যাওয়া যায়!

—না—তা নয়, যেতে ইচ্ছুক তো তুমি?

—হ্যাঁ—যাব! এসো, খাবে!—অবন্তী চলে গেল কথাটা বলেই।

যাবে—সিধুর আনন্দটা নাভিমূল থেকে উঠছে যেন—শিহরিত হচ্ছে সর্ব্বাঙ্গে!—কিন্তু সিধু, সন্ন্যাসী সিধু—সাধক সিধু—সর্ব্বস্ব ত্যাগী সিধু কাঁপছে তার অন্তশ্চেতনায়! সে-সিধুর মৃত্যু হোল! এক জন্মের জন্য নয়, কত জন্মের জন্য, কে জানে! সিধু খেতে এল!

অবন্তী ফল-জল-মিষ্টি সাজিয়ে রেখেছে পাথরের রেকাবে। অনেকদিন আগেই এগুলো কিনে রেখেছিল সে। কাশীতে কিনেছিল পাথরের

থালা-বাটি-গেলাস! এতদিন ছিল আলমারীতেই সাজানো, আজ কাজে লেগে গেল! স্বামী-পরিচর্য্যার কাজে! অবন্তী একখানা হাতপাখা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সিধুর খাবার যায়গায়। ঘরের বারান্দা এ যায়গটা—বৈদ্যুতিক পাখা ঝুলছে না—কিন্তু ভগবানের হাওয়া প্রচুর আসছে লেকের ওদিক থেকে; তবু অবন্তী পাখা নিয়ে পুণ্য সঞ্চয় করবে নাকি?

সিধু একবার তাকালো অবন্তীর মুখের দিকে এতক্ষণে। কী রূপ! যেন উর্ব্বশী! যেন উষসী—যেন উমা—শিবের তুষ্টি-তপস্যায় শীর্ণা—তপস্বিনী;—কিন্তু না—সিধু মুখ নামালো—উদ্যত অনুরাগ সম্বরণ করলো সিধু; উমা নয়, অবন্তী,—কুমারী জীবনের কদর্য্যতায় ক্লিন্না আত্মপরায়না অবন্তী—অভিশপ্তা অবন্তী—অশুচি অবন্তী!

সিধু আসনে বসলো; সুন্দর কার্পেটের আসন, হয় তো অবন্তীর নিজের হাতেই তৈরী কর; কিন্তু আসন বুনবার মত সময় কোথায় অবন্তীর! তবু অবন্তী আজ অতি যত্নে সিধুকে হাওয়া করছে। হাওয়ার প্রয়োজন নেই, তবু করছে; অপ্রয়োজনীয় কোনো কিছু বড়ই অস্বস্তিকর; তবু সিধু চুপ করে রইল, এক টুকরো ফল মুখে দিল! অবন্তী বললো,

—তোমাদের আশ্রম কি সেখানেই আছে? এখনো তেমনি গুপ্ত ভাবেই আছে?

—হাঁ—সিধু উত্তর দিল—তবে গুপ্ত ভাবে আর থাকবে না। ভারত স্বাধীন হোলো, এখন আমরা কাজের ধারা বদলে জাতীয় উন্নতিমূলক কাজ, গঠনের কাজ, ঐক্যের কাজ করবো!

—তা হলে আর সন্ন্যাসী হয়ে থাকবার কি প্রয়োজন আছে? অবন্তী প্রশ্ন করলো।

—নিজে ভালো না হলে অপরকে ভালো করবার অধিকার জন্মে না অবন্তী!

—মন্দ আমি হতে বলছি না—কিন্তু সন্ন্যাসী কেন? ছাই-ভস্ম মাখার মধ্যে কোন মহিমা নেই।

—মহিমা না-থাকাটাই ওর মহিমা অবন্তী—সিধু উত্তর দিল।

আধমিনিট চুপকরে ভাবতে লাগলো অবন্তী সিধুর কথার অর্থ, তারপর হঠাৎ বললো,

—আমাদের বিয়েটা সাধারণ ভাবে হওয়া দরকার এখানে!

—আবার কেন? সিধু অতি বিস্ময়ে বললো—কাশীতে তুমি তো বলেছিলে যে তোমার বিয়ে হয়ে গেছে!

—হ্যাঁ—না,—ঠিক সে রকম কথা···কাশীর কথা কাশীতে চুকে গেছে! এখানে আমি তোমার বাগদত্তা বধূ হয়ে আছি! এখানকার আত্মীয়-স্বজন তো দেখেনি, কবে আমার বিয়ে হোল তোমার সঙ্গে!

—তাহলে এখানে তুমি কুমারী পরিচয়ে আছ; বলো!—সিধু প্রশ্ন করলো তীক্ষ্ণ স্বরে!

—হাঁ—বাগদত্তা!—অবন্তীর মুখের হাসিটায় কৌতুক, কৌতূহল, কাপট্য!

—তাহলে তো তুমি অনায়াসে অন্য কাউকে বিয়ে করতে পার, অবন্তী! অনর্থক আমার জীবনে জড়িয়ে নিজকে কেন অসুখী করবে? বাগদত্তা কন্যার বাপ-মা বাক্য আজকাল রক্ষা না করেও পারেন—বিশেষতঃ কলকাতায়। এখানে বাক্যের শুচিতা বা সত্যতার মূল্য নগন্য!

—কিন্তু তুমি আমাকে অসুখীই বা করবে কেন? অবন্তী হেসে শুধুলো!

সন্দেশটা আধখাওয়া করে রেখে দিয়ে সিধু জলের গ্লাসটা তুলে নিল। বললো,

—তোমাকে সুখী করবার জন্য আমি নিতে আসিনি অবন্তী—সহধর্ম্মিণী করবার জন্য এসেছিলাম, কিন্তু আমার যা ধর্ম্ম—সে ধর্ম্ম তোমার

সইবে না—সে কঠিন, কঠোর—তবু তোমাকে আমি নিতে এসেছি! কিন্তু যদি তুমি না যেয়ে পার—যেও না! আমি তাতে সুখীই হব। জলটা চকচক করে পান করলো সিধু!

অবন্তী ভাবছে—ভয়ে, আনন্দে এক সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে চিন্তাটা!

সিধু উঠে বললো,

—ভেবে বলো, আমি অপেক্ষা কচ্ছি!

* * *

কথাগুলো বলে যেন বেঁচে গেল সিধু—এমনি একটা মুক্তির আনন্দের দ্যোতনা ওর মনে! তাড়াতাড়ি হাত ধুয়ে নীচে চলে এল—ঢুকলো ছোট মত একটা ঘরে। কে জানে কিসের ঘর—কার ঘর—কে থাকে ওখানে! ঘরটায় একখানা চৌকী পাতা—খালি চৌকী, বিছানা-বালিস নেই—সিধু শুয়ে পড়লো চৌকীতে!

অবন্তী লক্ষ্য রেখেছে বরাবর; সিধু শ্রেষ্ঠ অধিকার নিয়ে এসেছে তার বাড়ীতে—স্বামীর অধিকার। সে গিয়ে শুলো নীচের তলার সাধারণ একটা ঘরে, খালি চৌকীতে! ব্যাপারটা অত্যন্ত দৃষ্টিকটু, বিশেষতঃ অবন্তীর ঝি-চাকরদের চোখে। কিন্তু আশ্চর্য্য! অবন্তী কিছুই বললো না সিধুকে। হয়তো সন্ন্যাসীদের অমনিই নিয়ম, এই ভেবে বললো না, কিম্বা বলতে লজ্জাবোধ করলো অবন্তী—অথবা সিধু তার উপর থেকে অধিকার ছেড়ে দেবে ভেবে আনন্দের আতিশয্যেই কিছু বললো না! 'দেবাঃ ন জানন্তী'—আলোক বলেছিল!

অবন্তী কাপড়-জামা গুছিয়ে পরে নীচে এসে ঠাকুরকে বললো, —নিরামিষ রান্না করা হয় যেন—আর ড্রাইভারকে বললো গাড়ী বের করতে! নন্দকে বললো—'উনি রাত জেগে এসেছেন—একটু ঘুমুবেন। তুই এখানে বসে থাক, উঠলে যা-চাইবেন—দিবি—যা বলবেন করিস—আমি

মা'র ওখান থেকে ঘুরে আসি!'—অবন্তী বেরিয়ে পড়লো বাড়ী নিয়ে।

সিধু ঘুমায় নি—অবন্তীর বলা সব কথাগুলোই শুনেছিল সে! অবন্তী মা'র বাড়ী গেল—হয়তো পরামর্শ করতে গেল। বেশ। যা হয় একটা জবাব পেলেই চলে যাবে সিধু—নিশ্চিন্ত হয়ে, নির্ব্বিকার হয়ে চলে যাবে!

কাঠের শক্ত চৌকী—সিধুর যোগ্য শয়ন-মঞ্চ! বাঃ, বেশ লাগছে! এই বিলাসের অমরাবতীতেও বিশ্বেশ্বর ব্যবস্থা রেখেছেন সিধুর মত সন্ন্যাসীর জন্য—তিনি সর্ব্বত্র, সর্ব্বব্যাপী—বাঞ্ছাকল্পতরু—শরণাগতের আশ্রয়···!

চমৎকার চমৎকার বিশেষণগুলো মনে পড়ছে—সিধু সামলে গেল; শালগ্রাম ওকে রক্ষা করে দিলেন! অবন্তী নিশ্চয় যাবে না—যেতে পারবে না। এতখানা বিলাসের মধ্যে যার জীবন কাটে—সে যাবে অরণ্যে, পর্ব্বতে, গুহায়? অসম্ভব! সিধুকে পত্নীত্যাগীও হতে হবে না! অবন্তীই স্বীকার করলো যে বিয়ে তাদের হয়নি; এখন নাকি হতে হবে! আর কারো সঙ্গেও হতে পারে।

পারে, কিন্তু···ধ্বক্ করে উঠলো সিধুর অন্তরের জ্বলন্ত শিখাটা! আর কেউ এসে নিয়ে যাবে অবন্তীকে! নিয়ে যাবে, না হয় এখানেই থাকবে! এই আরামের আশ্রয় ছেড়ে যাবে কেন? মানুষ তো এই-ই চায়, এই নীড়—এই নারী—এই নশ্বরত্ব! সিধু অনন্তের পিয়াসী, অবিনশ্বরত্বের আকাঙ্ক্ষায় উদ্‌গ্রীব। অবন্তীর মত একটা নিতান্ত নগণ্য মেয়ের রূপের প্রলোভনে ভুলে মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ আকাঙ্খাকে উৎসাদিত করবে সে? —না!

সিধুর গলার আওয়াজটা গুরুগম্ভীর হয়ে বেজে উঠলো বাইরে। ছোট ছেলেটা ভয় পেয়ে যাচ্ছে! ঘরে কেউ নাই, অথচ উনি কাকে 'না' বলছেন! নন্দ উঁকি দিয়ে দেখলো একবার—সিধু কড়িকাঠের দিকে চেয়ে

গেছে। উনি ঘুমোন নি—ঘুমোবেন না—দরকার হয় তো ডাকবেন! নন্দ পালিয়ে গেল।

সিধু তাকালো দরজার দিকে—ছেলেটা নাই! ছেলেটাকে প্রহরায় বসিয়ে গিয়েছিল অবন্তী! ও না থাকায় মুক্তির আনন্দ অনুভব করলো সিধু—কিন্তু অবন্তী এখুনি আবার ফিরবে—হয়তো তার মাকেও সঙ্গে করে আনবে। তারপর সিধুর উপর চলবে অনুরোধ, উপরোধ; অবন্তীকে স-সমারোহে বিবাহ করে সমাজকে জানাতে হবে যে তারা বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী। তারপর হয়তো সিধুকে সংসারের পঙ্কে ডুবোবার ব্যবস্থা করবে ওরা!! ওহো না। অবন্তী বেশ আছে; কুমারী হয়ে আছে—যাকে ইচ্ছে বিয়ে সে করতে পারে। সিধুর পত্নীরূপে পরিচয়টা তার কেউ জানে না এখানে। অকারণ কেন সিধু তার সাংখ্য-পাতঞ্জলের বিভূতিভূমি থেকে এই নরককুণ্ডে নেমে আসবে?

সিধু উঠে বসলো চৌকীটায়—বেরিয়ে উপরে উঠে এল অবন্তীর সেই বসবার ঘরটায়। টেবিলের ওপর প্যাড—কলম; লিখলো:—

অবন্তী—

ভেবে দেখলাম, আমার সঙ্গে যেতে হয়তো তুমি চাইবে; কিন্তু যাবার প্রয়োজন নাই—যেতে সক্ষমও হবে না তুমি। কুমারী পরিচয়ে তুমি যখন পরিচিতা, তখন বেশ বোঝা যাচ্ছে—আমার সঙ্গে উদ্বাহ-বন্ধনটা তুমি অস্বীকারই করেছ এখানে আসার পর থেকে! স্নেহ-প্রেমের অর্থহীন অপলাপ করে সময় নষ্ট করতে আমি চাই না—সে বস্তু তোমার আমার মধ্যে কোনদিন জন্মায় নি—হয়তো কোনদিন জন্মাবে না। তাই চলে যাচ্ছি তোমার ফেরার অপেক্ষা না রেখেই! আশীর্ব্বাদ করে যাচ্ছি, যোগ্য স্বামীর সঙ্গে যুগোচিত জীবন লাভ কর—যুগোত্তর পুত্রের জননী হও! ইতি।

—সিদ্ধেশ্বর

প্যাডটায় কাগজ চাপা দিল সিধু—কলমটা রেখে দিল; বেরুচ্ছে। হঠাৎ নজরে পড়লো কোণের টেবিলে সাজানো অবন্তীর নানা ভঙ্গীর ফটো! —কুমারী অবন্তী, কিশোরী অবন্তী, তরুণী অবন্তী;—অবন্তী উৎসব বেশে, অভিসার বেশে, আলস্যের আরামে;—ফুলবীথিকায়, ঝর্ণা-ধারায়, গিরিশৃঙ্গে;—হাসিমুখে—উদাস চোখে—অশ্রু-নয়নে……অবন্তীর জীবন-বৈচিত্র যেন থরে থরে সাজানো টেবিলটায়! সিধু আস্তে এগিয়ে এল ঐদিকে! ছোট্ট একটি ফটো—সোনালী ফ্রেমের ভেতর হাসছে—'কিশোরী অবন্তী!' সিধু টুপ্ করে তুলে পাঞ্জাবীর বুকপকেটে ফেলে দিল; তারপর নেমে গেল।

গেটে কেউ নাই—কোথাও কেউ নাই সামনের দিকে; আস্তে বেরিয়ে এল সিধু বাড়ীটার বাইরে, রাস্তায়—যেন চুরি করতে ঢুকেছিল। গটগট করে হাঁটতে লাগলো ট্রাম লাইনের দিকে; মুক্তি—মুক্তি—মুক্তি! নারায়ণ,—সিধুকে তুমি রক্ষা করে দিয়েছ—সিধু ঊর্দ্ধপানে তাকালো।

কেউ ওকে দেখতে পায় নি নিশ্চয়; কেউ-ই তো ছিল না! যদি দেখেই থাকে তো কি আর হবে! সিধু তো লিখেই রেখে এল যে সে চলে যাচ্ছে। অবন্তী এসে চিঠিখানা দেখেই বুঝবে—তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে বর যোগাড় করবার চেষ্টা করবে তার মা-বাবা। কিছু আটকাবে না অবন্তীর—কিছুই না। —একটা নিশ্বাস পড়লো সিধুর! অবন্তীর অন্তর থেকে মুছে গেল সিদ্ধেশ্বর!—যাক্! মুক্ত, ত্যাগী সন্ন্যাসী সে। কি করবে সে অবন্তীকে নিয়ে? ওকে ঐ ভাবে জানিয়ে না দিয়ে এলে ওর মা-বাবা ওর বিয়ের যোগাড় হয়তো করতে পারতো না।

নিজের পল্লী-সুলভ অভিজ্ঞতা থেকে ভাবলো সিধু—কিন্তু আশ্চার্য্য এই কলকাতা সহর! অবন্তী নির্ব্বিঘ্নে নিজকে কুমারী বলে চালিয়ে দিল?—কেন একাজ করলো অবন্তী? কেন করলো? সিধুর বিবাহিতা

পত্নী বলে পরিচয় দিতে কোথায় বেধেছিল তার? গতবার যখন দেখা হয়, তখন অবন্তী ছিল কাশীতে। পরিচিত মহলের অনেকেই জানতো তার ইতিহাস—তাই হয়তো সেবার শুধু নিজের অসামর্থ্যের কথাটাই জানিয়েছিল অবন্তী তার অনুগমন করবার পক্ষে! সিধুকে চায় না অবন্তী, কোনো দিনই চায় নি। প্রয়োজনের তাগিতেই প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছিল তার সন্তানের জনক বলে পরিচয় দেবার—উঃ! নারী সত্যিই নরকের দ্বার!—সিধু পকেট থেকে টেনে বের করলো অবন্তীর ফটোখানা; ট্রামের তলায় ছুড়ে ফেলে দেবে—কিন্তু কি সুন্দর, কি পবিত্র ঐ কিশোরীর হাসিটি! সিধু দাঁড়িয়ে গেল ট্রাম লাইনের ধারে। ট্রামখানা চলে গেল—ওঠা হোল না সিধুর। দ্বিতীয় ট্রামের জন্য অপেক্ষা করতে গেলে কেউ তাকে দেখে ফেলবে। হেঁটে চললো সিধু! কালীঘাটের ওদিকে চলতে চলতে আবার পকেটে ভরলো ফটোটা। গলায় ছিল ছোট ঝোলায় ঝোলান শালগ্রামের নুড়ি—এখন রয়েছে পাঞ্জাবীর বুক-পকেটে অবন্তীর ফটো—আশ্চর্য্য!

অবন্তী মা'র কাছে এসে জানালো সিধুর আগমন-বার্ত্তা। জননী তৎক্ষণাৎ আশীর্ব্বানী উচ্চারণ করলেন—আহা, বেঁচে থাক্—সে ছেলে কি কথার বেঠিক করবে কখনো! কিন্তু অবন্তীর বাবাও ছিলেন ওখানে। মহাধনী হয়ে তিনি এখন মন-মেজাজেও সাধারণেকে ছাড়িয়ে গেছেন। রুক্ষস্বরে স্ত্রীকে বললেন—এত আনন্দের কি হয়েছে! থামো।

স্বামীর মেজাজ ভালই চেনা আছে অবন্তীর মায়ের; তিনি সত্যি থেমে যাচ্ছিলেন, কিন্তু অবন্তী মা'কে বলল—তুমি একবার চলো মা—তার সঙ্গে যা কথা কইবার, কইবে।

উত্তর দিলেন অবন্তীর বাবা—কথা আমিই কইবো! ওকে এখানে না এনে খুবই ভাল করেছিস। তোর সঙ্গে ওর সম্বন্ধের কথা কলকাতার কেউ-ই জানে না। কাশীর বন্ধুর বাড়ীতে সিধু মাত্র দুটোদিন ছিল—তাকে চিনতেই পারবে না তারা আর কোনো দিন; তাছাড়া...

—আমি ওটা ভাল মনে করি না—অবন্তীর মা বলতে গেলেন।

—তুমি থামো! তোমার কথা শুনে মেয়েটাকে জলে ভাসিয়ে দিতে পারি না। একে তো বজ্জাত, গাঁজাড়ে, চরিত্রহীন—তারপর ফেরারী, চোর না ডাকাত কে জানে! কাশীতে যে উপকারটুকু ও করেছিল, তার জন্য হাজার খানেক টাকা দিয়ে ওকে বিদায় করে দেব আমি—ও যাতে কোনো গোলোযোগ না করে এখানে, তারই জন্য এই টাকাটা দিতে হবে। তারপর আমার কুমারী মেয়ের বিয়ে দিতে আমার আটকাবে না—কত ব্যাটা এসে বিয়ে করবে···কথাগুলো বলে তিনি মোটা চুরুটটা ধরিয়ে নিলেন। অবন্তীকে বোললেন—এখানে কাউকে বলিসনি তো যে ও তোর কে? কোনো পরিচয় দিস নি তো ওর?

—না বাবা—পরিচয় কি দেব? ওর সঙ্গে সম্পর্কের কোনো কথাই তো কেউ জানে না।

—ছাটস্ গুড্—ও ব্যাপারটা আজই একেবারে চুকিয়ে ফেলবো আমি। তোকে আলাদা বাড়ীতে রাখবার উদ্দেশ্যই হোল, যদি হঠাৎ কোন দিন সে এবাড়ীতে এসে তোর স্বামী বলে পরিচয় দিয়ে বসে তো, মুস্কিলে পড়তে হবে। আজ সে এসেছে—তাকে বুঝিয়ে কিছু টাকা দিয়ে বিদায় করে দেব!

—সে যদি রাজি না হয়?—অবন্তীর মা আস্তে বললেন!

—রাজি হবে ওর চৌদ্দ পুরুষ—কর্কশ কণ্ঠে বললেন অবন্তীর বাবা। বলেই চললেন—না যদি রাজি হয় তো কি সে করতে পারে? কাশীর ব্যাপারের সাক্ষী কে? যারা সাক্ষী, তারা তো আমারই আপনার লোক···অবন্তীর বিয়ে তো সত্যিই হয় নি কারো সঙ্গে! ছেলেও বেঁচে নেই, কি করতে পারে সিধু আর?

—পারে—অবন্তী, তুই যা'তো মা এখান থেকে একটু ওদিকে—বলে অবন্তীর মা আস্তে বললেন স্বামীকে—অবন্তীর দেহেই আছে সেদিনের ইতিহাস লেখা।

—ভুল! আহাম্মক্!—চীৎকার করে উঠলেন অবন্তীর বাবা—এতবড় কারো বাবার সাধ্যি আছে যে আমার মেয়ের সম্বন্ধে সে-কথা বলতে সাহস করে?

মা চুপ করে গেলেন। ব্যাপারটা তাঁর মোটে ভাল লাগছিল না। কিছুক্ষণ উভয়েই চুপচাপ—মা কিন্তু বড়ই অস্বস্তি অনুভব করছেন। আবার বললেন,

—সিধুর সঙ্গেই-বা দিলে মেয়ের বিয়ে?

—তারপর সারাজীবন মেয়ে থাক স্বামীপরিত্যক্তা সতী হয়ে, কেমন? তোমার বুদ্ধিতে চললেই হয়েছে আর কি!—যাও, নিজের কাজ দেখ গিয়ে। আজকালকার জগতে তোমার ও সতীত্ব, স্বামীনিষ্ঠার কোন মানে হয় না। ও সব অক্ষয় পুণ্য তোমাদের জন্যই থাক্; স্বর্গে ভাড়িয়ে খাবে—জোরে দুটো টান দিলেন তিনি চুরুটে—তারপর ডাকলেন, —অবন্তী!

—বাবা—অবন্তী এসে দাঁড়ালো।

—সেদিন আলোক এসেছিল, আমার সঙ্গে দেখা হোল না—তার সঙ্গে কিছু কথা হয়েছে তোর? সে কি বিয়ে করেছে নাকি?

—ন্-না—অবন্তী আস্তে উচ্চারণ করলো। কিন্তু 'না', কথাটা কোন্ প্রশ্নের নেতীবাচক? তার সঙ্গে কোনো কথা না হওয়ার, নাকি তার বিয়ে না করার?

—কি না? কোনটা না—অবন্তীর বাবার গলার স্বরে তীব্রতা! অস্বস্তি! উদ্বেগ!

—বিয়ে সে করে নি এখনো!

—তোকে বিয়ে করতে রাজি আছে সে?—তুমি জিজ্ঞেস করেছিলে তাকে?—শেষের প্রশ্নটা পত্নীকে করলেন! অবন্তীর মা ধীরে-ধীরে বললেন,

—একজনকে স্বামী বলে স্বীকার করার পর আর কারো সঙ্গে বিয়ে হয়—এরকম ব্যাপার আমার জানা নেই। ও-সব কথা হয়নি আমার সঙ্গে!

—কি সব কথা হয়েছিল?—শ্লেষের স্বরে প্রশ্ন করলেন অবন্তীর বাবা।

—কিছু না—কেমন আছে, কি করছে—কোথায় থাকে—ও কটা কথা।—অবন্তীর মা শ্লেষটা এড়িয়ে সোজা জবাব দিলেন। অবন্তী বলল,

—আগে এই ব্যাপারটা চুকে যাক্ বাবা—তারপর আলোকদার কথা ভাবা যাবে!

—আলোককে চাই-ই আমার! ভারত স্বাধীন হয়ে গেল। ওর মত বিদ্বান, বুদ্ধিমান জেলখাটা ছেলের আজ বিস্তর কদর! ওকে অনায়াসে বিশেষ বড় কাজে ঢুকিয়ে দিতে পারবো আমি;—বক্তৃতা দিতে পারে, লিখতে পারে—অর্গ্যানাইজ করতে পারে—হীরের টুকরো ছেলে···চুরুটে দুটো টান্ দিলেন আবার—আচ্ছা, চল, আগে সিদ্ধেশ্বরের সঙ্গে কাজ মেটাই!—উনি উঠে পড়লেন! অবন্তী আস্তে আস্তে বললো,

—রাত জেগে এসেছে, এখন একটু শুয়েছে বাবা—কথাটা ওবেলা হলে হয় না?

—না—ওকে সাবধান করে দিতে হবে, যেন তোর সঙ্গে সম্পর্কটা প্রকাশ না করে!

উনি নামতে লাগলেন নীচে। অবন্তীকেও আসতে বললেন সঙ্গে। অবন্তীর মা দাঁড়িয়ে ছিলেন, দাঁড়িয়েই রইলেন। অবন্তী নেমে এল। অবন্তীরই গাড়ীটাতে পিতা-কন্যা উঠলেন এসে। বাবা প্রশ্ন করলেন,

—তোর মা এলো না যে?

—না, মা হয়তো যাবে না!

—যেতে হবে—ডাক! নরমে গরমে তাকে রাজি করতে হবে—আগে নরমে!

অবন্তী আবার নেমে গিয়ে মা'কে ডেকে আনলো। নিরুপায় মাতা উঠলেন এসে গাড়ীতে। গাড়ী চলতে লাগলো অবন্তীর বাড়ীর দিকে। মা ভাবছেন—অবন্তীকে নিয়ে একদিন তিনি মহা পাপের পথে অগ্রসর হতে বাধ্য হয়েছিলেন—কাশীশ্বর তাঁকে রক্ষা করেছিলেন সে-দিন। আজ আবার কোথায় চলেছেন! কে তাঁকে রক্ষা করবে? কিন্তু তিনি এটাও ভাবলেন যে অবন্তীর সঙ্গে সিধুর বৈদিক বিবাহ হয় নি—কোনোরকম বিবাহই হয় নি—সিধুকে ত্যাগ করার মধ্যে স্বামীত্যাগের পাপ নিশ্চয় নেই; —তাছাড়া···অবন্তীর কয়েক বছর আগের জীবন মনে পড়লো তাঁর—বিবাহিত জীবনের সতীনিষ্ঠার কোনো আদর্শই নেই ওর মধ্যে! অনর্থক কেন তিনি ভাবছেন! মেয়েটা যাতে সুখে জীবনটা কাটাতে পারে, সেই চেষ্টাই এখন করা দরকার! কি হবে আর ধর্ম্মের বা পুণ্যের কথা ভেবে? ও গেছে। যদি আলোক গ্রহণ করে অবন্তীকে—হয়তো করবে—আলোক ছোটবেলা থেকে তাকে ভালোবাসে—আলোকের মা ছিলেন অবন্তীর মা'র সখী—আলোকের সঙ্গে অবন্তীর বিয়ের কথাও হয়েছিল অনেকবার। হয়তো আলোক গ্রহণ করতে পারে অবন্তীকে—যদি করে, তাহলে অবন্তী

সম্বন্ধে দুর্ভাবনার আর কোনো কারণ থাকবে না। কিন্তু আলোক অসাধারণ আদর্শনিষ্ঠ—অবশ্য তার আদর্শ মানবতারই আদর্শ—তবুও জননী ভীত হয়ে উঠছেন। আলোক ছাড়া আর কেউ যদি বিয়ে করে অবন্তীকে এবং যদি কোনোদিন অবন্তীর পূর্ব্বজীবনের কথা প্রকাশ পায়, তাহলে অবন্তীর জীবন হবে অভিশপ্ত! কিন্তু এমন কত মেয়েই তো রয়েছে আজ দেশে—অনেক—আকছার। মা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। এই নৈতিক আদর্শহীনতা, এই ধর্ম্মবুদ্ধির বিলোপ—এই উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি-অশ্ব কোথায় নিয়ে যাচ্ছে মানুষের সভ্যতার রথকে?—কোথায়?

গাড়ী এসে পৌঁছালো অবন্তীর বাড়ীতে! অবন্তীর বাবা যেন তৈরীই ছিলেন, গাড়ীখানা ভালোকরে খাড়া হতে না হতে নেমে পড়লেন।—আয় অবন্তী—বলেই চললেন ঘরের দিকে! অবন্তীও আসতে লাগলো পিছনে। যে ঘরটায় শুয়েছিল সিদ্ধেশ্বর, উভয়ে এসে দেখলেন—সে-ঘর ফাঁকা! তাহলে কি উপরে গিয়ে বসেছে সিদ্ধেশ্বর? কিম্বা বাইরে কোথাও গিয়েছে কোনো কাজে? অবন্তীর বাবা ছোট চাকরটাকে ডেকে শুধুলেন, —যে-বাবু এখানে শুয়েছিল সে গেল কোথায়?

—আমি জানি না হুজুর—ভয়ে ভয়ে উত্তর দিল ছেলেটা। আমতা-আমতা করে বললো—উ বাবু বিড়বিড় করে মন্তর পড়ছিলেন—'হাঁ'-'না' এই সব কথা বলছিলেন নিজের মনে!

—তারপর?—রায় বাহাদুর ধমক দিয়ে শুধুলেন ছেলেটাকে!

—তারপর উঠে কোথায় গেলেন!

—কোন্ দিকে গেল?

—আমি জানি না!

—শুয়ার কাঁহাকা'—বলে সজোরে আর একটা ধমক দিয়ে রায়বাহাদুর বাইরের দিকে এলেন, সিদ্ধেশ্বর কোন্ দিকে গেছে, কেউ দেখেছে কি না জানবার জন্য। ইতিমধ্যে অবন্তী উপরে উঠে তার বসবার ঘরে ঢুকেই দেখতে পেল সিধুর চিঠিখানা। একনিমেষে পড়ে ফেলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল মিনিট দুই। ওর বাবা বাগানের মালিটাকে ডেকে প্রশ্ন করছেন, ধমকও দিচ্ছেন। অবন্তী ডাক দিল,

—বাবা, উপরে এসো,—চিঠি লিখে গেছে সে একখানা!

রায় বাহাদুর ত্বরিতে উপরে উঠে এলেন। মেয়ের হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে পড়ে ফেললেন। তারপর আনন্দে চীৎকার করে উঠলেন অকস্মাৎ—

—বাঃ! এরপর আর কিছু ভাবনার রইলো না! স্বেচ্ছায় দাবী ছেড়ে দিয়ে গেছে সে!

—কে? কিসের দাবী?—অবন্তীর মা প্রশ্ন করলেন ব্যগ্র কণ্ঠে!

—সিধু! অবন্তীর উপর সব দাবী ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে সে। এখন নিশ্চিন্ত হয়ে ওর বিয়ের ব্যবস্থা করা যেতে পারে যে-কোনো ছেলের সঙ্গে। মহা উৎসাহে রায় বাহাদুর একখানা চেয়ারে বসে চুরুট বের করলেন পকেট থেকে। অবন্তীর মুখের দিকে উনি চেয়ে দেখেন নি—প্রয়োজনও অনুভব করেন নি! কিন্তু মা দেখছিলেন অবন্তীকে; অবলম্বনহীনতার একটা থরকম্পিত শিহরণ ওর আপাদমস্তকে! মুখের রেখায় সর্ব্বহারার ম্লানিমা! আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন তিনি—অবন্তীর হাতখানা ধরে পাশের ঘরে টেনে আনলেন—বললেন,

—সিধুকে তো তুই কোনোদিন ভালোবাসিস নি অবন্তী?

—না!—অবন্তীর কণ্ঠস্বর শুষ্ক—শাণিত—সতেজ, কিন্তু তাতে আশ্চর্য্য ব্যথা-কারুণ্য!

—অমন করছিস কেন অবন্তী? তুই যদি ওকে চাস তো ওকেই আমরা খুঁজে আনবো!

—না—অবন্তীর কণ্ঠস্বর দৃঢ়, আকম্পিত—অথচ অশ্রুময়!

—আলোকের সঙ্গে তোর বিয়ে দেব আমরা অবন্তী!

—না—অবন্তীর কণ্ঠস্বর উদাস, আশাহীন,—আর্ত্ত!

অবন্তী ধীরে চলে গেল ঘর থেকে। কোথাও আড়ালে গিয়ে ও যেন একটুক্ষণ দম্ নিতে চায়—একটু নির্জ্জনতার মধ্যে নিজকে সামলে নিতে চায়। মা বুঝে কিছুই বললেন না; কিন্তু ভাবতে লাগলেন—অবন্তীর এ পরিবর্ত্তনের কারণ কি! যতদূর তাঁর জানা আছে, তাতে সিধুকে কোনো-দিন ভালো বেসেছে অবন্তী—এমন কোনো প্রমাণ নেই! মা'ই বার বার সিধুর কথা বলতেন অবন্তীকে; অবন্তী নিজে কোনোদিন বলেনি! কিন্তু আজ অবন্তীকে দেখে মনে হচ্ছে—সে একান্তভাবে সিধুকেই ভালবাসে। আশ্চর্য্য! উনি স্বামীর কাছে এলেন; রায় বাহাদুর নিশ্চিন্ত মনে চুরুট টানছিলেন এবং পরবর্ত্তী কার্য্যপ্রণালী ভেবে নিচ্ছিলেন। এখন আলোকনাথকে ধরতে হবে এবং তাকে এনে অবন্তীর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তার উন্নতির ব্যবস্থা করে দিতে হবে! অবন্তীর বিয়ের দিন সর্ব্বসমক্ষে "রায়বাহাদুর" উপাধিটা ত্যাগ করবেন তিনি! কিন্তু এখন ভাদ্র-আশ্বিন-কার্ত্তিক মাস। দেশাচার হিসাবে এমাসগুলোয় নাকি বিয়ে হয় না! অনর্থক দেরী পড়ে যাবে বিয়ের! তাহোক—ভালো করেই দিতে হবে অবন্তীর বিয়ে—বেশ ধুমধাম করে! সারা সহরকে জানিয়ে দিতে হবে যে তিনি মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন! আলোকের কাছে আজই যাওয়া দরকার—এক্ষুনি গেলেই তো হয়।

—আলোকের ঠিকানাটা রেখেছ তো? স্ত্রীকে দেখেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন!

—অবন্তী জানে! কিন্তু সিধুর কি আর কোনো খোঁজই করবে না?

—আবার কেন? সে বুদ্ধিমান ছেলে; যা করা উচিত তাই করে গেছে! তবে যদি দেখা পেতাম তো টাকা কিছু দিতাম আমি তাকে, কিন্তু ওর বরাৎ!

মৃদু হাসলেন রায় বাহাদুর! হাসিটা ব্যঙ্গের—সিধুর বরাতের উপর ব্যঙ্গ! অবন্তীর মা ক্ষুন্ন হলেন, বললেন,—সে সন্ন্যাসী, সব ছেড়ে সন্ন্যাস নিয়েছে। তোমার টাকা না পেলেও তার চলে এখন! কিন্তু অবন্তী সিধুকেই ভালোবাসে!

—ইডিয়ট্!—য়্যাব্‌সার্ট! ইম্‌পসিব্‌ল্! তোমার মাথায় এমন সব অদ্ভুত ধারণা গজায় কি করে?

—আমার তাই মনে হচ্ছে!

—তোমার মন আর অবন্তীর মন এক নয়, এটা মনে রেখো। একটা জেনারেশনের তফাৎ!

কথাটা বুঝলেন না অবন্তীর মা! চুপ করে রইলেন। স্বামীকে তিনি ভালই চেনেন। অনর্থক কথা বাড়িয়ে লাভ কিছু নেই। রায়-বাহাদুরই পুনরায় বললেন,

—কোথায় অবন্তী? গেল কোথায় সে? অবন্তী! অবন্তী!—ডাক দিলেন।

—যাই বাবা! অবন্তী সাড়া দিল দূর থেকে! খুবই ক্লান্ত শোনাচ্ছে ওর গলার আওয়াজ! কিন্তু রায় বাহাদুর সেদিকে লক্ষ্য করলেন না। সিধুর দাবী-ছেড়ে-যাওয়ার আনন্দে উনি চুরুটে ঘনঘন টান দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন অবন্তীর জন্য।

—ডাকছো বাবা?—অবন্তী এলো; মুখে চোখে জল দিয়ে এসেছে!

—হ্যাঁ—কি হোল তোর আবার? উনি সবিস্ময়ে শুধুলেন, —কাঁদছিলি নাকি রে?

—না—অবন্তী আস্তে বললো—কিছুই হয়নি বাবা—ও চলে গিয়ে ভালোই করেছে!

—দেখা হলে কিছু টাকা আমি ওকে দিতাম!

—চলে গিয়ে সেই অপমানটা ও এড়িয়ে গেল বাবা। ওর ঈশ্বর ওকে বাঁচালেন!

—তার মানে? রায়বাহাদুরের গলার আওয়াজ গম্ভীর এবং গুরু!

—স্বামীর দাবী যে ছেড়ে দিয়ে গেল নিঃসঙ্কোচে, টাকা তাকে দেবার কথা বোলো না বাবা,—সিধুদা গোঁয়ার, গাঁজাড়ে, বজ্জাৎ—কিন্তু অতবড় ত্যাগী পৃথিবীতে কমই জন্মেছে!

—তোর কি ইচ্ছে অবন্তী—সিধুকে ফিরিয়ে এনে তোর সঙ্গে বিয়ে দিই?

—না—সে ফিরবে না; দরকারও নেই! বিয়ে তার সঙ্গে যতখানা হয়েছিল, ঐতেই যথেষ্ট হোত—যদি সে গৃহবাসী হোত। সে সন্ন্যাসী, কিন্তু হীন নয়—তাকে আমি শ্রদ্ধা করি বাবা—তার কোনো রকম অসম্মান কোরো না তুমি।

রায়বাহাদুর চুপ করে রইলেন একটুক্ষণ! কিন্তু কি যেন ভেবে বললেন,

—বেশ! এখানে তো কেউ জানে না যে সে তোর কে! এখন আলোকের ঠিকানাটা বল—দেখে আসি তাকে! তাকে বিয়ে করতে তোর আপত্তি নেই তো?

অবন্তী কিছুই বললো না। একটা চাকর দুগ্ধাস সরবৎ এনেছে; তাই পরিবেশন করল মাকে আর বাবাকে! ঐ সুযোগে বাপের প্রশ্নটার

জবাব এড়িয়ে গেল সে! কিন্তু রায়বাহাদুর জবাব চান তাঁর প্রশ্নের। পুনরায় তিনি বললেন,

—আলোক সম্বন্ধে তোর অভিমত কি?

—অত তাড়াতাড়ি কেন করছো বাবা! সে যা হয়, পরে ভেবে দেখা যাবে!

—না; আমি চাই তাড়াতাড়ি তোর বিয়েটা দিয়ে ফেলতে; ঐটাই আমার একমাত্র কাজ যার জন্য রাত্রে আমি ঘুমুতে পারি না। আলোক না-হয়, অন্য পাত্রের অভাব হবে না।

অবন্তীও চেনে তার বাবাকে। কথার সংঘর্ষে আগুন উঠবে ভেবে চুপ করে রইল।

ওকে চুপ করে থকতে দেখে রায়বাহাদুর বললেন,

—আলোকের ঠিকানাটা দে; আমি এখুনি যাব তার কাছে!

—সে অনেক দূর বাবা—বরাহনগর! বেলা হয়ে গেছে। এ বেলা গেলে তোমার ফিরতে বেলা দুটো হয়ে যাবে। তার থেকে ফোন করে ওকেই আসতে বলো—অবন্তী বিশ্বেশ্বরী নিকেতনের ফোন নম্বর দিল।

রায়বাহাদুরের আর সবুর সইছে না যেন! মেয়েকে প্রশ্ন করলেন,

—এখানে কার বাড়ী থেকে ফোন করতে পারা যাবে?

—ঐ যে, ডাক্তার গুহর বাড়ী থেকে আমি ফোন করি!

কথাটা বলেই কিন্তু অবন্তীর মনে হোল—ডাঃ গুহের সঙ্গে তার আবার দেখা না হওয়াই বাঞ্ছনীয়—কিন্তু ভেবে সে কিছু বলবার পূর্ব্বেই রায়বাহাদুর বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে! সিধু তার অধিকার ছেড়ে দিয়ে গেছে; অবিলম্বে অন্য একজন কাউকে ঠিক করা দরকার, যে তাঁর বাগদত্তা মেয়ের হবু-স্বামী হয়ে থাকবে এবং যথাকালে বিবাহ করবে

অবস্থাকে। তা না-হলে রায়বাহাদুরের সামাজিক সম্মান ক্ষুন্ন হবার সম্ভাবনা আছে; কারণ এতকাল তিনি বন্ধু-বান্ধব সকলকে জানিয়েছেন যে মেয়ে তাঁর বাগদত্তা, জামাই মুক্তি-যজ্ঞের হোতা—পরাধীন ভারতের গৌরবের সামগ্রী! আলোক হলেই সব দিক দিয়ে বেশ মিলে যায় তাঁর বলা কথাগুলো; মেয়েটাও সুখী হতে পারে এবং তিনিও জামাতৃগর্ব্বে ফুলে উঠতে পারেন। ব্যাপারটা কিছুদিন পূর্ব্বে হলে হয়ত তিনি জেল-ভোগী, ইংরাজের শত্রু আলোকের সম্বন্ধে অত বেশি আগ্রহান্বিত হতেন না; কিন্তু আজ দেশ স্বাধীন—এবং স্বাধীন ভারতে কারাবরণকারী বীরদের সম্মান বিপুল—পদগৌরব প্রচুর এবং বুদ্ধি থাকলে বিত্তও অনায়াসলভ্য হবে।

সটান চলে এলেন তিনি ডাক্তারের ঘরে। ডাক্তার গুহ প্রায় সকাল থেকেই জানালাপথে এই বাড়ীর অভ্যন্তরে কি হচ্ছে, দেখবার এবং বুঝবার চেষ্টা করছিল। রায়বাহাদুরকে সে আগেও দেখেছে দু-একবার, কিন্তু আলাপ ছিলনা। হঠাৎ তাঁকে ঢুকতে দেখে সবিনয়ে আহ্বান জানালো—আসুন স্যার—আসুন!

—একটা ফোন করতে পারি কি আপনার এখান থেকে?

—স্বচ্ছন্দে!—ডাঃ গুহ তাঁর মুদ্রাদোষ অনুযায়ী "স্বচ্ছন্দে" কথাটাই বললেন, এবং আরো বললেন—আপনার বাড়ীতে আজ নূতন কে যেন একজন এসেছিলেন। কে তিনি?

—না!—কে এসেছিল? কখন? ফোনের রিসিভার তুলেও রায়বাহাদুর থেমে গেলেন। ডাঃ গুহ কতটা কি দেখেছে তাঁর জেনে নেওয়া আবশ্যক! ওদিকে ফোন্ গার্ল বেচারা—"নম্বর প্লিজ"—"নম্বরটা বলুন" ইত্যাদি বলে চেঁচাচ্ছেন! ডাঃ গুহ তীক্ষ্ণভাবে চেয়ে দেখলেন রায়বাহাদুরকে, বললেন,

—সকালেই এসেছিলেন একজন ছোকরা—কপালে তিলক-ফোঁটা ; তারপর দেখলাম অবন্তী দেবী গাড়ী নিয়ে কোথায় গেলেন! তার কিছুক্ষণ পরে দেখলাম, সেই লোকটিও চুপিচুপি চলে গেলেন।

—ও হ্যাঁ ; সে আমাদের সিধু! আমাদের দেশের ছেলে। এখানে এসে আমার খোঁজ না পেয়ে আমার বাড়ীর ঠিকানা নিয়ে ওখানে গেছে!

রায়বাহাদুর তাঁহা মিথ্যা কথাটা বলে দিয়ে বিশ্বেশ্বরী-নিকেতনের ফোন নম্বর বললেন ফোন-গার্লকে!

সাড়া দিল স্বয়ং উৎপলা—হ্যালো কে? কাকে চাইছেন?

—ওখানে কি আলোক আছে? আলোক নামে কোনো লোক?

—আপনি কোত্থেকে বলছেন? কি দরকার জানতে পারি কি? প্রশ্ন করলো উৎপলা।

—দরকার একটু প্রাইভেট—ব্যক্তিগত! তাকে দয়া করে একটু ডেকে দিন, বলুন—অবন্তীর বাবা ডাকছে!—রায় বাহাদুর অনুরোধ করলেন।

—ও; আপনিই রায় বাহাদুর? নমস্কার। আমি উৎপলা কথা বলছি। সেদিন গিয়েছিলাম আপনার বাড়ীতে—আপনার সঙ্গে দেখা হয় নি!

—হ্যাঁ মা, দেখা হলে ভালই হোত! আচ্ছা, এসো আর একদিন সুবিধামত! আলোক রয়েছে ওখানে?

—আজ্ঞে না; তিনি আজই সকালে চলে গেছেন এখান থেকে!

—চলে গেছে? কোথায়?

—তা জানি না; এখানকার চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন অন্য লোককে, তিনি পদত্যাগ করে গেছেন!—উৎপলার গলার স্বরটা ম্লান শোনাচ্ছে!

—সেকি? কোথায়……কিন্তু রায় বাহাদুর সামলে গেলেন ডাক্তারের মুখের পানে চেয়ে! ডাক্তার দু'কান দিয়ে ওদের কথাগুলো যেন গিলছে। কিন্তু ফোনের মস্ত সুবিধা এই যে অপর পক্ষ কি বলছে, এখানে বসে থাকলেও দ্বিতীয় ব্যক্তি তা শুনতে পায় না। বললেন,

—আচ্ছা মা, তুমি যদি একবার এসে আমার সঙ্গে দেখা কর তো বড় ভাল হয়! তোমার আশ্রমের জন্য কিছু টাকাও দেব আমি—আজই এসো! আসবে?

—যাব—চারটা-পাঁচটার সময় যাব—উৎপলা বললো।

ফোন রেখে দিয়ে উঠছেন রায় বাহাদুর; ডাঃ গুহ হঠাৎ বলে উঠলো,

—ঐ আলোকবাবুই বুঝি আপনার মেয়ের বর ঠিক হয়ে আছেন?

রায় বাহাদুর 'হ্যাঁ' বলতে গিয়েও বললেন না! ডাঃ গুহই বললো,

—উৎপলা মেয়েটি খুব সুবিধের মেয়ে নয় স্যার; আপনার মেয়ের কল্যাণের জন্যই বলছি—উৎপলার সঙ্গে যিনি অত বেশি মাখামাখি করেন, তিনি যে বিশেষ ভাল আছেন, তা মনে হয় না! আপনারা প্রতিবেশী, তাছাড়া অবন্তী দেবীর সঙ্গে আলাপও আছে আমার, তাই কথাটা আপনাকে বললাম—নইলে আমার কি দায় বলুন?

—উৎপলা সম্বন্ধে কী জানেন আপনি?—রায় বাহাদুর প্রশ্ন করলেন।

—বিস্তর—অনেক কিছু!—মুখ টেপা হাসিটা ক্রুর হয়ে উঠছে।

—আলোককে আমি ছোটবেলা থেকে চিনি!

—মানুষ ছোটবেলায় খারাপ হয় না স্যার—হয় বড় হলে—যৌবন এলে!

—কি আপনি বলতে চাইছেন ডাঃ গুহ?

—বলছি, আপনাদের মঙ্গলের জন্যই! নইলে আমার আর কি দরকার বলুন! ঐ উৎপলা নারী-সমাজের কলঙ্ক। যুদ্ধের সময় ওর

কাণ্ডকারখানা···কিন্তু থাক স্যার—আমার ওসব কথায় দরকার কি! তবে আপনি সহরের বিশিষ্ট ভদ্রলোক—নাম-খাতির আছে; মেয়েটিও আপনার সুন্দরী, বিদুষী;—বাগদান তো আর বিয়ে নয়—বিয়েটা ভাল ছেলে দেখেই দেবেন—এইটুকুমাত্র বলতে চাই! কবে, কোন্ দিন তাঁদের ভালোবাসাবাসি ছিল—আজও তা টিকে আছে কি না—জানা দরকার!

—ধন্যবাদ! আচ্ছা, আমি খবর নেব!—রায় বাহাদুর আর বেশি কথা না বলে বেরিয়ে এলেন! কিন্তু ভাবতে ভাবতে এলেন। পিছন ফিরে তাকালে উনি দেখতে পেতেন—ডাঃ গুহের ছোট ছোট চোখ দুটো যেন জলছে ছুরির তীক্ষ্ণ ফলার মত!

চলে এলেন রায় বাহাদুর অবন্তীর বাড়ীতে আবার। অতঃপর কি করা যায়? উৎপলা সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত করলো ঐ ডাক্তার, তাতে বোঝা যাচ্ছে, আলোক আর তেমন ভাল নেই,—অর্থাৎ নিঃসঙ্কোচে তার হাতে মেয়ে দেবার মত মানুষ আর নেই আলোক! কিন্তু অত সব ভাবা অভ্যাস নেই রায় বাহাদুরের। অতিমাত্রায় আধুনিকপন্থী তিনি চিরদিনই। চরিত্র নিয়ে বেশি মাথা ঘামাবার প্রয়োজন কমই অনুভব করেন। গ্রামে তবু-বা কিছু-কিঞ্চিৎ ভাবতেন ও বিষয়ে, ইদানিং কলকাতায় এসে হঠাৎ বড়লোক হয়ে একেবারে ও বিষয় ভাবেনই না! কিন্তু ভাবনার অন্য বিষয় রয়েছে; সেটা আলোকের অন্তর্দ্ধান। উৎপলার ওখান থেকে সে চলে গেছে চাকরী ছেড়ে দিয়ে। কোথায় গেল? কেন গেল? আরো ভাল কোনো চাকরী পেয়েছে নাকি? তা যদি হয়তো ভাল;—কিন্তু ওকে খুঁজে না পেলে রায় বাহাদুর করবেন কি?

অবন্তীর মা ধীরে ধীরে প্রশ্ন করলেন—আলোক কি বললো?

—কিছু না! আলোক নেই ওখানে! সে ওখানকার চাকরী ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে!

—চাকরী ছেড়ে দিয়ে? কেন?—কে বললো তোমাকে একথা?

—সেই উৎপলা নামে মেয়েটি। কেন চাকরী ছাড়লো সেটা অবশ্য কোনে বলবার কথা নয়। হয়তো কোনো গুরুতর কারণ আছে, না হয় ভাল চাকরী পেয়েছে অন্যত্র। তবে অন্যত্র ভাল চাকরী পেলে উৎপলা নিজেই সেটা বলতো।

দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন! অবন্তী ওখানে ছিল না—নীচে গিয়েছিল কি একটা কাজে; ফিরে এসে বাবা-মার তূষ্ণীম্ভাব দেখে বলল,

—কি হোল মা?

—আলোক ওখানকার চাকরী ছেড়ে দিয়ে গেছে; কোথায় গেছে জানিস তুই?

—না বাবা—তা আমি কেমন করে জানবো! চাকরী ছাড়বার কথা তো কিছু শুনিনি!

অবন্তী অতিশয় বিস্মিত হয়েছে আলোকের চাকরী ছাড়ার সংবাদে, কিন্তু কেন-কে-জানে, তার মনে অহেতুক একটা আনন্দ জেগে উঠলো! এ আনন্দের উৎস কোথায়, অবন্তী বুঝতে পারছে না। চাকরী ছেড়ে আলোক তার কাছে আসবে, এমন সম্ভাবনা কিছুমাত্র নেই। উচ্চ কোনো পদে আলোকের নিযুক্ত হবার আশাও করে না অবন্তী—সে জানে, বড় চাকরী নিয়ে জীবনকে ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত করবার দিকে আলোকের লক্ষ্য একেবারে নেই। তবে কেন তার মনে এই আনন্দ!—কিন্তু গবেষণা করবার সময় পেল না অবন্তী। ওর বাবা বললেন—তোর মা আর তুই এখানেই থাক, যদি আলোক আসে এখানে, তাকে আটকাবি!

—সিধুকে তাহলে তুমি ছেড়েই দিলে?—অবন্তীর মা কুণ্ঠিতস্বরে বললেন!

—সে-ব্যাটা তো নিজেই ছেড়ে দিয়ে গেছে!—কঠোরস্বরে বললেন

রায় বাহাদুর। তারপর কন্যার পানে আধমিনিট তাকিয়ে থেকে বললেন —উৎপলা মেয়েটাকে কি রকম মনে হয় তোর?

—কি করে জানবো বাবা! তাকে তো আমি মাত্র দুবার দেখেছি! তবে আলোকদা যখন তার……

—আলোকও তো খারাপ হতে পারে তার সংসর্গে!—বাধা দিয়ে বললেন রায় বাহাদুর—বিশেষ, ওরকম একটা আশ্রম যে চালায়, তার সম্বন্ধে স্বতঃই মনে প্রশ্ন জাগে! কিন্তু যাক, আলোক যদি আসে তাহলে তৎক্ষণাৎ আমাকে খবর দিবি ডাক্তারের ওখান থেকে। আমি এখন চললাম। খুব সম্ভব আলোক আসবে।

—আসবে না!—অবন্তী আস্তে উচ্চারণ করলো।

—কেন?—বিস্মিত প্রশ্ন করলেন রায় বাহাদুর।

—কেন, তা ঠিক বলতে পারবো না বাবা, কিন্তু তুমি অত ব্যস্ত হোচ্ছ কেন? আমি তো ভালই আছি! না হয় এমনিই থাকবো!

—থাম্—ধমক দিলেন রায় বাহাদুর—ও কথা বলবার এক্তার নাই আর তোর! আবার কোনো বিপদের মধ্যে যাতে না গিয়ে পড়িস, তার ব্যবস্থা আমায় করতেই হবে।

উনি হন্ হন্ করে নেমে চলে গেলেন। কন্যাকে যে কথাটা বলে গেলেন, তার আঘাত কতখানি হোল, দেখবার জন্য ফিরেও তাকালেন না; কিন্তু অবন্তী…!

অবন্তী সত্যি সয়ে গেল এই নিদারুণ ভৎর্সনা—সইতে হোল ওকে—ও নিরুপায়!

আলোকের চাকরী ছাড়াকে উপলক্ষ্য করে ও মনের চিন্তাটা ঘুরিয়ে রাখতে চাইছে—কিন্তু পিতার কথিত কথাটা জলন্ত শূলের মত ওর বুকে

বিঁধে রয়েছে। অপরাধিনী অবন্তী—অভাগী অবন্তী—কিন্তু অসীম সহ্যশক্তি অবন্তীর। কিছুক্ষণের মধ্যে মনটাকে ও ঠিক করে ফেললো—আলোকের চাকরী ছাড়া শুনে তার আনন্দ জাগবার কারণটা অনুসন্ধান করতে লাগলো নিজের মনে! আলোকের সঙ্গে অবন্তীর প্রীতি শুধু সাঙ্গিক,—আলোক ভালোবাসে না অবন্তীকে, তাহলে কাকে ভালোবাসে আলোক? কাকে? অবন্তী ছাড়া আলোকের জীবনে আর কোথায় কোন নারী আছে, যাকে চেনে না অবন্তী? চেনে—সে উৎপলা!—অবন্তীর বুকের নিশ্বাসটা বেরিয়ে হাল্কা হচ্ছে।

উৎপলার মুষ্টি থেকে বেরিয়ে পড়েছে আলোক, তাই অবন্তীর আনন্দ! হ্যাঁ—তারই জন্য! কিন্তু অবন্তী কি অকৃতজ্ঞ হচ্ছে না? উৎপলা স্নেহময়ী দিদির মত তাকে সান্ত্বনা দিয়েছে—তার ব্যথার ভার লাঘব করবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে এবং আলোকের অন্তরের কাছে আবেদন পর্য্যন্ত করেছে উৎপলা অবন্তীর জন্য—অবন্তী সেই উৎপলার উপর ঈর্ষা পোষণ করে মনের গোপন কোণে? আশ্চর্য্য! হোক আশ্চর্য্য—এ সত্য! একে অস্বীকার করতে পারছে না অবন্তী। আলোক থাকবে অবন্তী ছাড়া আর কোনো নারীর কাছে—অবন্তীর পক্ষে এ একেবারে অসহ্য!

কিন্তু অবন্তী খুবই ছোট হয়ে গেছে; আলোকের যোগ্যা আর নেই অবন্তী, এমন কি, আলোকের জন্য অন্তরের গোপন কোণায় ভালবাসা সঞ্চিত রাখবার অধিকারও নেই বুঝি অবন্তীর আর! অবন্তী এতো ছোট হয়ে গেল? এমন ঈর্ষাপরায়ণা হয়ে উঠলো—এতখানি স্বার্থপরতাকে প্রশ্রয় দিল অবন্তী!

না—অবন্তী নিজের মনটাকে যেন ধমক দিল প্রচণ্ড একটা—না! আলোক যদি সত্যি ভালোবাসে উৎপলাকে, তাহলে সে তাকে লাভ

করুক! কিন্তু ভালোবাসাবাসির প্রশ্নই তো আসে না আর? আলোক তো চলেই গেছে ওখান থেকে? কেন গেল? কি এমন ঘটলো এই সামান্য দু'চার দিনের মধ্যে? কি এমন ঘটতে পারে? ভয়ানক কিছু নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু যদিই হয় সেরকম কিছু?

অকস্মাৎ আলোকের জন্য মনটা অতিমাত্রায় চিন্তিত হয়ে উঠলো অবন্তীর। কোথায় যাবে—কি করবে আলোক? নিজের উপর লক্ষ্য তার চিরদিনই কম। উদাসীন গোছের মানুষ—না আছে খাওয়া পরার নেশা, না বা নারীর উপর মোহ! ও আবার ভালোবাসবে কাউকে! দূর ছাই—ওকেই ভালোবেসে মরুক সব! ও কারুর দিকে লক্ষ্য রাখে না—আপনাকে পুড়িয়ে শুধু আলোক বিতরণ করে। কে ওকে দেখবে? উৎপলার ওখানে তবু উৎপলা ছিল তাকে দেখবার জন্য—এবার কে দেখবে ওকে?—অবন্তীর কাছে ও নিশ্চয় আসবে না—নিশ্চয় না!

অবন্তীর নিশ্বাসটা আবার বুকে গুমরে ভারী হয়ে উঠলো। কিন্তু আশ্চর্য্য!—মাঝখানে এই কয়েকটা বছর গেল—অবন্তী তো আলোকের কথা খুব বেশি ভাবে নি! মাঝে মধ্যে স্বপ্নের মত মনে পড়তো তার মুখখানা মাত্র। তখন বেশ ছিল অবন্তী—ক্লাবে ক্যাসানোভায়, পার্টিতে পিক্‌নিকে—রঙ্গে-রসে-রভসে দিব্যি কাটিয়ে দিচ্ছিল জীবনটা মদের পেয়ালার মত। অমন সুন্দর জীবন আর আছে নাকি কিছু? মানুষের নিতান্ত পরিমিত পরমায়ু অত সহজে, অত অনায়াসে ব্যয় করবার আর ভালো কোনো উপায়ই নেই! কেন যে মানুষ নীতির গণ্ডীর বেড়া দিয়ে—সমাজ-শাসনের ভ্রূকুটি করে নিজের জন্য শৃঙ্খল রচনা করেছে এতো বেশি কে জানে! মানুষ যদি অমনি আরণ্যক, বর্ব্বর, পশু থাকতো তো কি ক্ষতি হোত পৃথিবীর? স্নেহ-প্রেম-ভালোবাসা ইত্যাদি বৃত্তিগুলোর অনুশীলন কেন করলো মানুষ—কেনই বা এক অস্তিত্বহীন ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার

করে নিজকে হাজার বিড়ম্বনায় বিড়ম্বিত করলো সে? আলোকের দেখা পেলে জিজ্ঞাসা করবে অবন্তী। কিন্তু সেদিন গাড়ীতে-বলা আলোকেরই একটা কথা মনে পড়ে গেল—"মানবাত্মা অগ্নিধর্মী। তার শিখার গতি উর্দ্ধপানে—বর্ব্বরতাকে ছাড়িয়ে সে সভ্যতার সোপানে উঠবেই! পশুত্বকে অতিক্রম করে মানবত্বের রাজ্যে তার যাত্রা অশ্রান্ত;—স্নেহদয়া-প্রেমের সুকোমল ভাবলহরী তার বহ্নিমান স্বত্তার জ্যোতিতরঙ্গ!"—মানুষ পশু ছিল—প্রাণী থেকে পশুতে, পশু থেকে মানুষে সে উন্নীত হয়েছে নিজের আত্মারই অগ্নিধর্ম্মের প্রভাবে! জলের মত তরলভাবে তাকে গড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়।

মানুষ চিরদিনই পশু থাকতে পারে না। পাশবত্ব তার মধ্যে জাগতে পারে সাময়িক ভাবে—কিন্তু সেইটাই তার একান্ত সত্য স্বরূপ নয়—প্রমাণ সিদ্ধেশ্বর! নিজের সমস্ত অধিকার নিঃশেষে ছেড়ে দিয়ে গেল সে অবন্তীর উপর থেকে! অথচ ঐ অবন্তীর উপর কতই-না লোভ ছিল সিদ্ধেশ্বরের! অবন্তী ভাবতে লাগলো, মানুষের মধ্যে এই ত্যাগশক্তি—এর মূল কোথায়? এই আশ্চর্য্য প্রেরণা কেমন করে লাভ করে মানুষ? চরিত্রহীন-বর্ব্বর শয়তান সিদ্ধেশ্বর নিষ্কাম যোগী হয়ে উঠলো কেন? কোন্ মহান্ প্রেরণার প্রভাবে! সে প্রেরণা পার্থিব কি অপার্থিব কি তারও উপরের কোনো প্রেরণা!—ভেবে কিছু ঠিক করতে পাচ্ছে না অবন্তী! ওর কাছে সিদ্ধেশ্বরের চরিত্র দুর্জ্ঞেয় হয়ে ছিল, আজ সেটা একান্ত অজ্ঞেয় হয়ে উঠলো!

মা খেয়ে পাশের ঘরে শুয়ে আছেন; অবন্তী নিজের ঘরে একলা ভাবছিল। মা হয়তো ঘুমিয়ে গেছেন। মা কিন্তু এখনও চান অবন্তী সিদ্ধেশ্বরকেই বিয়ে করুক। কারণ কাশীতে যে সত্য স্বীকৃত হয়েছে, মা সেটাকে আর কোনোমতেই অস্বীকার করতে পারছেন না। যার প্রাচীন

পত্নী মন অত্যন্ত পীড়িত হয়ে উঠছে যখনই তিনি ভাবছেন, অবন্তী সিধু ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে!—কিন্তু মার ওসব ভাবা আর উচিৎ নয়। অবন্তীর তো আর কৌমার্য্যপুতঃ দেহমন নেই যে কাশীর সত্যকে সত্যই রাখতে হবে! এখন অবন্তীর বিয়ে অর্থে একটা কন্‌ট্রাক্ট—চুক্তি, বাকি জীবনটা যাতে কোনো বলিষ্ঠ পুরুষের আশ্রয়ে আরামে কেটে যায়, তারই চুক্তি মাত্র হবে! সে পুরুষ যে-কেউ হতে পারে—এমন কি ঐ ডাক্তার হলেও কিছু বলবার নেই! বরং ভালই হয়; অবন্তী যেমন, ডাক্তারও তেমনি! দেখবে নাকি অবন্তী একবার ডাক্তারের নাড়ী টিপে!—ও দেখাই আছে!

হাসলো অবন্তী আপনার মনে! এতো দুঃখেও হাসি মানুষের পায়! কিন্তু দুঃখের কি এমন হয়েছে অবন্তীর? বাবা যাকে ইচ্ছে ঠিক করুন তার বিয়ের জন্য, অবন্তী দিব্যি ভালো বেনারসী পরে বিয়েতে বসবে, শুভদৃষ্টি করবে—মাল্যদান করবে—কোথাও আটকাবে না! তারপর ফুলশয্যা—অবন্তী কেমন যেন উত্তেজিত হয়ে উঠে বস্‌লো বিছানায়!—নাঃ, নতুন করে অভিনয় করবার মত মন আর নেই অবন্তীর! বিয়ে অবন্তী করবে না—বাপের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয়, দাঁড়াবে! উৎপলার আশ্রমের কাজে যোগ দেবে অবন্তী। অসংখ্য অভাগী মেয়ের সেবাধিকার লাভ করে নিজের দুর্ভাগা জীবনটাকে সার্থক করতে পারবে অবন্তী!—অবন্তী উঠে এলো মার কাছে!

মা ঘুমুচ্ছিলেন না, আকাশপাতাল চিন্তা করছিলেন। অবন্তী এসে ডাকলো—মা?

—আয়, ঘুমোস নি?

—না! শোন মা, যা হবার হয়েছে; কিন্তু ভেবে দেখলাম, সিধুদাকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করা আমার ঠিক হবে না—অথচ

সিধুদা তো চলেই গেল! তুমি বাবাকে বুঝিয়ে বল, আমার বিয়ের চেষ্টা যেন উনি না করেন। আমি উৎপলাদির আশ্রমে কাজ করবো।

—তোর বাবাকে তো চিনিস অবন্তী! উনি রাজি হবেন না।

—বিয়ে আমি করবো না?

—আলোককে যদি পাওয়া যায়···মা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইলেন মেয়ের পানে।

—তুমি কি ভাবো মা, আলোকদা, আমাকে দেখামাত্র বিয়ে করে ফেলবে? অত সোজা নয়। আলোকদা আজন্ম আদর্শবাদী। বরং সিধুদাকে ছেড়ে তাকে বিয়ে করতে চাইছি, শুনে ঘেন্নায় সরে যাবে! তুমি জানো না মা, আলোকদার ঘেন্না আমি কিছুতেই সইতে পারবো না।

অবন্তীর চোখে জল ছাপিয়ে উঠলো অকস্মাৎ। মার বুকে মুখ লুকালো। মা ওর মাথাটায় আস্তে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন।

মা'র আদর কিছুক্ষণ উপভোগ করে অবন্তী কান্না সামলে বললো,

—আলোকদার ভালোবাসা পেতে হলে আমাকে সিধুদার জন্যই বসে থাকতে হবে মা—আলোকদাকে আমি হারাতে পারবো না!

—তাতে যে সিধুর সঙ্গে প্রতারণা করা হবে অবন্তী—আর আলোককে ঠকানো হবে! মা আস্তে বললেন।

—না মা,—সিধুদাই স্বামী আমার,—আলোকদা গুরু, ইষ্ট, ঈশ্বর!

জননী আবেগে জড়িয়ে ধরলেন অবন্তীকে, ওর ললাটে চুম্বন দান করে বললেন—আশীর্ব্বাদ করি, তোর এই নিষ্ঠা তোকে সতীর সাম্রাজ্ঞী করুক।

অবন্তী আস্তে উঠে মার পায়ের ধুলো নিল নিজের সীমন্তে!

নিজের সামান্য জিনিষ কটা নিয়েই বেরিয়ে এসেছে আলোক আশ্রম থেকে; একটা ছোট সুটকেস—সতরঞ্চ-বালিশ-চাদর আর একটা ছাতা! ছাতা সম্বন্ধে একটু বলবার আছে; আলোককে এখানে সেখানে প্রায়ই যেতে হোত এবং বহু সময়ই তাকে বর্ষার জলে ভিজতে হোত দেখে উৎপলা তাকে একখানা বর্ষাতি কিনে দিতে চায়; কিন্তু বর্ষাতির বিলাস আলোকের যানাবে না, তাই ছাতাই চেয়েছিল সে। অথচ ছাতা সে সময় মোটে পাওয়া যেতো না। উৎপলা অনেক চেষ্টা করে এক ইংরাজ কোম্পানীর দোকান থেকে এই ছাতাখানা যোগাড় করে দিয়েছিল তাকে। মূল্যবান ছাতা—আলোকের বেশভূষার সঙ্গে অত্যন্ত বেমানান। আলোক একবার ভেবেছিল, ছাতাখানা নিয়ে যাবে না, কিন্তু ভেবে দেখলো ছাতাটা উৎপলা তাকে উপহার দিয়েছে; ওটা না নিয়ে গেলে উৎপলা অতিশয় দুঃখিত হবে—নিয়ে যাওয়াই স্থির করলো সে। সকালেই আশ্রম ছাড়লো আলোক।

কোথায় যাবে, প্রথমটা ভেবে ঠিক করতে পারলো না। তার পরই মনে পড়লো, সে পথে বেরিয়েছে—পথেই যাবে। হাঁটতে লাগলো আলোক কলকাতার দিকে। বাগবাজার, শ্যামবাজার-কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্, কলেজ ষ্ট্রীট ...গোলদীঘি। নতুন স্বাধীনতা লাভে আনন্দিত জনসাধারণ উচ্ছ্বাস-মুখর সর্ব্বত্র। আলোক দেখতে দেখতে চলে আসছে; অসংখ্য বিপনি-অপরিমেয়

পণ্যসম্ভার, অন্তহীন মানবস্রোত রাস্তায়; ফুটপাতে, ট্রামে বাসে তিল ধারণের স্থান নেই। দেশ স্বাধীন হোল, এইবার যানবাহনের সুবিধার দিকেও সরকারের নজর পড়বে; মানুষকে আর বাদুড়ঝোলা হয়ে যেতে হবে না! মানুষের কষ্টের দিন শেষ হোল!

শেষ হোল? কে জানে, কবে শেষ হবে! মানুষের কষ্ট কি শেষ হবে কোনো দিন? এই যে জনারণ্য—দিকে দিকে এই যে মানবাভিযান—এরা কারা? এদের সংখ্যা এতো বেশি যে মনে হয়, জগৎটা এদেরই হওয়া উচিৎ। এরাই জনসাধারণ। এদেরই শ্রম শক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি আর আত্মদানের ফলেই জগতের সভ্যতা গড়ে উঠেছে—অথচ জগতের সভ্যতার ইতিহাসে এরা কোথায়? ইতিহাস তো এদের কথা লেখে না! লেখে রাজামহারাজার কথা, বিজয়ী বীরের কথা, বুদ্ধিমান চাণক্যের কথা! কিন্তু রাজা তার জনসাধারণকে নিয়েই রাজা,—বিজয়ী বীর তার পদাতিক সৈন্যগণের আত্মদানের ফলেই বিজয়ী—আর চাণক্য তার কূটনীতির সমর্থন লাভেই চাণক্য হন! সে-সমর্থন আসে এই জনসাধারণের তরফ থেকেই। এরাই রাজাকে রাজা করে, বীরকে বিজয়ী করে, বুদ্ধিমানকে চাণক্য করে—কিন্তু এরা কোথায় স্থান পায়?

প্রশ্নটা আলোকের অন্তরে গুমরে মরতে লাগলো। জটিল প্রশ্ন, ওর সমাধানও জটিল, কিন্তু ঐ চিন্তা থেকেই আলোকের মনে অন্য একটা চিন্তা এসে জুটলো—জগতটা মূলতঃ প্রলিটোরিয়েটর জগৎ। খাটছো খাচ্ছো, বেশ আছ···কেউ তোমাকে কিছু বলবে না, কিন্তু যে মুহূর্তে তুমি এক টাকার উপর দু-টাকা রোজগার করবার জন্য সচেষ্ট হবে, সেই মুহূর্তেই তুমি একটা ভয়ানক সংঘর্ষ এবং ষড়যন্ত্রের মধ্যে গিয়ে পড়বে; কারণ যারা বহু টাকা সঞ্চয় করে বড় হয়ে বসে আছে, তারা তোমাকে বড় হতে দিতে চায় না। দিলে তাদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়। মানুষের এই মনোবৃত্তি মজ্জাগত।

এই থেকেই বোঝা যায়, জগৎটা কোনো দিনই ধনিকের কবলমুক্ত হয়ে সাধারণের আয়ত্তাধীন হবে না। কোনো না কোনো রকমে একজন অন্যের উপর প্রভুত্ব করবেই—এবং করছে তাই।

প্রাচীন যুগের রাজতন্ত্রের কথা মনে পড়লো আলোকের। পুঁথি-পড়া বিদ্যা···কিন্তু পুঁথিই তো ইতিহাস···বেদে লেখা আছে:

"শ্রীর্বৈ রাষ্ট্রম্"—যাহা বিদ্যাজনিত উত্তম গুণযুক্ত নীতি তাহাই রাজ্যের শোভা বা লক্ষ্মীস্বরূপ!" এই উত্তম গুণযুক্ত নীতিকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য আর্য্য-ভারতে কঠোর সাধনা করা হোত; এমন উত্তম ব্যবস্থা ছিল যে, কোনো ন্যায়াধীশের সম্মুখে কোনো রকম অন্যায় কাজ অনুষ্ঠিত হলে সেটা প্রজার দোষ বলে পরিগণিত হোত না, ঐ সভাধ্যক্ষ, সভাসদ বা ন্যায়াধীশের দোষ বলে গণ্য হোত—বিশ্বাস ছিল যে, রাজা রাজসভাসদ বা ন্যায়াধীশ যদি সত্যাচরণ এবং ন্যায়াচরণে রত থাকেন, তাহলে প্রজাগণ কখনো দুষ্ট-স্বভাব হতে পারবে না—কাজেই রাজা, রাজসভাসদ বা ন্যায়বিচারককে কতখানি কঠোর নিষ্ঠায় নিজ জীবন নিয়ন্ত্রিত করতে হতো, অনুমান করা কঠিন নয়! জনগণের উপর তাঁরা প্রভুত্ব করতেন, কিন্তু সেই প্রভুত্ব করবার যোগ্যতা শুধু অর্জ্জন করেই ক্ষান্ত হতেন না—সেই অর্জ্জিত যোগ্যতা আজীবন রক্ষা করতে বাধ্য হতেন। এমনি ভাবে চলতে হোত রাজা, রাজপুত্র, রাজমন্ত্রী বা রাজসেনাপতিকে; এমনকি, অতি সাধারণ রাজপুরুষের নৈতিক জীবনের উপর কঠিন দৃষ্টি রাখা হোত! আর আজ? পদাধিকার আর প্রতিষ্ঠার অন্তরালে চলছে যে অবাধ দুর্নীতি—তার ধাক্কায় জনসাধারণ বহুদূরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে শাসন-যন্ত্রের চালকদের কাছ থেকে; অথচ শোষিত হচ্ছে তারা অধিকতর!

ভাবতে ভাবতে আলোক গোলদীঘিটা একবার প্রদক্ষিণ করে এলো—; ক্লান্ত হয়ে পড়েছে খুবই অতখানা রাস্তা হেঁটে···বসলো একখানা বেঞ্চে।

অফিস যাবার সময়—ট্রামে-বাসে নিদারুণ ভীড়; বসে বসে দেখছে আলোক। বিড়ি-সিগারেট ও খায় না—এক কাপ চা খেলে ভাল হোতো; কিছু টাকা সঙ্গে আছে,—এ মাসের গোটা মাইনেটাই! ইচ্ছা করলে একটা মেসে বা হোটেলে গিয়ে উঠতে পারে আলোক। গেলে মন্দ হয় না—দু'চার দিন হোটেল-বাস ভালই লাগবে। কিন্তু যা-চার্জ! তার সামান্য সম্বল অতি অল্পদিনেই ফুরিয়ে যাবে। যাক্—যাওয়াই তো দরকার। টাকা হাতে থাকলে আলোকের মনটা বিলাস-লোভী হয়ে উঠতে পারে। ওগুলো খরচই করে দেবে সে। আলোক উঠলো। গোলদীঘির কোণায় একটা চায়ের দোকান—নাম ফেভারিট ক্যাবিন। অত্যন্ত পুরাণো দোকান। আলোক কলেজ-জীবনে এখানে চা খেয়েছে! গিয়ে ঢুকলো দোকানটায়। মার্ব্বেলের ছোট ছোট টেবিল পাতা—একটা কোণার দিকের টেবিলে বসে বললো আলোক—'এক কাপ চা দিন!'

দোকানে অনেক ভদ্রলোক চা খাচ্ছেন। আলোক তার সতরঞ্জ-সুটকেশ-ছাতা রাখবার জন্য বিব্রত হয়ে পড়েছে, হঠাৎ ওপাশের কোণা থেকে একজন ছোকরা বলে উঠলো,

—আলোক না! কেমন আছ ভাই? কোথায় ছিলে এতোদিন?

আলোকের টেবিলেই এসে বসলো সে অন্য একখানা চেয়ারে। আলোক চেয়ে দেখলো, তার এম্-এ ক্লাশের সহপাঠী তুষারকান্তি! বললো,

—অনেকদিন পর দেখা তুষার! তুমি ভাল আছ তো?

—আছি! শুনেছিলাম, তুমি জেলে গিয়েছিলে, হালে খালাস পেয়েছ নাকি?

—না—খালাস অনেকদিন পেয়েছি। তা[illegible]টা-সেটা করছিলাম।

—দু'কাপ চা—একটু টোষ্ট…আর কিছু খাবে আলোক?…তুষার বয়কে আদেশ করার সঙ্গেই আলোককে ও প্রশ্ন করলো। আলোক মাথা নেড়ে বলল—না।

—আমি ভালই আছি আলোক, সিনেমায় নেমে পড়েছি! অভিনয় করি না, করি অভিনেত্রী সংগ্রহ…হাসলো তুষার—সোজা কথায় মেয়ের দালালী!

—সে কি?—আলোক তাকালো ওর মুখপানে বিস্মিত চোখে। তুষার বললো,

—অত আশ্চর্য্য হবার কি আছে! খুব প্রফিটের জব্! তুমি কি করছো?

—উপস্থিত কিছু না! আলোক উত্তর দিল। ইতিমধ্যে চা আর টোষ্ট এসে গেছে টেবিলে!

—খাও—বলে তুষারই আরম্ভ করলো আগে খেতে। আলোকও তুলে নিল টোষ্ট!

—তুমি কি কোনো সিনেমা কোম্পানীর তরফে কাজ করছো? আলোক শুধুলো।

—হ্যাঁ—একটা কোম্পানী নয়, বিভিন্ন কোম্পানী! বর্ত্তমানে ঐটাই বড় ব্যবসা, সিনেমার ছবি তোলা!

চা খেতে খেতে কিছুক্ষণ সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। হঠাৎ তুষার বললো,

—সিনেমায় চলতে পারে, এমন কোন গল্প তোমার লেখা আছে আলোক?

—না ভাই, গল্প তো অনেক দিন লিখি নি! তা'ছাড়া সিনেমায় কি রকম গল্প চলে, সে বিষয়ে জ্ঞান আমার খুবই সীমাবদ্ধ! তবে কি চলা উচিৎ, তা ভেবেছি!

—তোমার ভাবনার কোন দাম নেই! ভাববে ফাইনেন্সার, প্রডিউসার। আচ্ছা, তোমাকে যদি আমি একজন লোকের কাছে নিয়ে যাই—তিনি তোমাকে একটা প্লট দেবেন, তদনুযায়ী গল্প কি তুমি লিখে দিতে পারবে?

—তাঁর ফরমাজ মত?

—হ্যাঁ—কি রকম গল্প চাই, তাতে কি-সব বস্তু থাকবে, সবই তিনি তোমায় বলে দেবেন। ঠিক সেই ভাবে গল্পটা লিখে দিতে পারলে কিছু টাকা পেয়ে যাও।

আলোক ঠিক বুঝতে পারছে না, কি তাকে করতে হবে। তবু একটা নূতনত্বের জন্য আর বর্ত্তমান অস্থিত-অবস্থার জন্য ভাবলো, দেখাই যাক না! বলল,—তাঁর কাছে যেতে আমার আপত্তি নাই। গল্প লিখবো কিনা, সেটা পরে বলতে পারবো।

—বেশ—এসো আমার মেসে; ওখানেই স্নানাহার করবে। ও-বেলা যাওয়া যাবে।

তুষারই পয়সা দিল চা-টেষ্টের। আলোক তার বরাতের উন্নতি দেখে অবাক হচ্ছে, কিন্তু তুষার ওকে টেনে নিয়ে চললো একটা গলির মধ্যে। দোতলা একখানা পুরানো বাড়ী; তারই দোতালার একখানা ঘরে থাকে তুষার একা। ঘরখানা বেশী বড় নয়, তবে দুজন লোকের যথেষ্ট যায়গা হতে পারে। তুষার এসেই নীচের রান্নাঘরে ঠাকুরকে বললো—আমার গেষ্ট আছে ঠাকুর—খাবে। তারপর আলোককে এনে হাজির করলো তার ঘরে। বেলা হয়েছে, কাজেই তখনকার মত স্নানাহারের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লো দুজনেই। খেয়ে একটু গল্প করলো কলেজ-জীবনের। কথা-প্রসঙ্গে তুষার জানালো যে সে অনেক দুঃখ-ধান্দা করেও যখন কিছুই করতে পারে নি, তখন একটী মেয়ে তাকে সিনেমা-লাইনে ঢুকিয়ে দেয়।

মেয়েটি বিশেষ নাম-করা অভিনেত্রী। বর্ত্তমানে সে বোম্বাই-এ থাকে, কিন্তু তার দেওয়া প্রবেশ-পত্রের বলে তুষার এই লাইনে বেশ করে খাচ্ছে! লাইনটা খুবই পয়সার লাইন।

আলোক শুধু শুনে গেল, কিছুই বললো না। তুষার বিকাল বেলা ওকে সঙ্গে নিয়ে বেরুলো। আলোক তার মূল্যবান ছাতাটা হাতে নিতে লজ্জা বোধ করছে; ওর হ্যাণ্ডেলটা প্লাষ্টিকের। তুষারকে বললো,
—তুমি এটা নাও ভাই!

গড়পাড়ের ওদিকে ভদ্র-পল্লীতে থাকেন মিঃ আর, জি, সাহা! দরজায় পিতলের ঝক্‌ঝকে নেম-প্লেট্—দারয়ান—দোয়াত, কলম, স্লিপ। ঐতে নাম লিখে মিঃ সাহার কাছে পাঠাতে হবে, তবে দেখা পাওয়া যাবে তাঁর। তুষারই ব্যবস্থা করলো! স্লিপ্ নিয়ে গেল চাকর একজন। পাঁচ-সাত মিনিট পরে এসে বললো,

—উপরে যান!

তুষার সুন্দর সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলো, পিছনে আলোক! চমৎকার সাজানো ঘরে বসে আছেন প্রায় চল্লিশ বছরের মিঃ সাহা; বর্ণ সুগৌর, একটু ভুঁড়ি আছে, আর গোঁফজোড়া সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টিগোচর হয়—বেশ চেহারা। আলোক নমস্কার করলো। তুষার পরিচয় করিয়ে দিলো। মিঃ সাহা বললেন,—খুব সুখী হলাম! আপনাদের মত শিক্ষিত ছেলেদের পেলে খুবই ভাল কাজ হবার কথা;—কিন্তু কি জানেন,—শিক্ষিত লোকরা তো পয়সা দেয় না, দেয় জনসাধারণ। আমরা ব্যবসা করতে বসেছি, যাদের কাছ থেকে পয়সা পাব, তাদের জন্যই ছবি তৈরী করবো! ওসব আর্ট-ফার্ট বুঝিনা মশাই!

আলোক যদি আশা করতো এখানে কিছু লাভজনক পাবার, তাহলে মিঃ সাহার এই কথাতেই তার হার্টফেল হবার যোগাড় হোত; কিন্তু

সে কোনো আশা নিয়েই আসে নি। তাই চুপ করে রইল। মিঃ সাহা বললেন,—শুনুন—একটা গল্প আপনাকে লিখে দিতে হবে যাতে রাজনীতি মোটে থাকবে না,—আলোক চুপচাপ শুনছে।

—ও ঝামেলার মধ্যে যেতে চাই না। সেন্সার থেকে পাশ করানো বড় কঠিন। শুধু থাকবে সে-গল্পে জমাট প্রেম—লটঘট্ আর কি! হাসছেন মিঃ সাহা—শুধু প্রেম দিয়েই আবার আজকালের লোকগুলোর মন ভুলানো যায় না; থাকতে হবে, ধনিক-শ্রমিক বিরোধ, চাল-কাপড় না-থাকার কথা, খুব বড় বড় রাশিয়া মার্কা কথা কতকগুলো—আর কয়েকটা নাচ-গান-হল্লা, তার সঙ্গে—থামলেন উনি। আলোক ওঁর মুখপানে চেয়ে রয়েছে। তুষার কথাটা একটু এগিয়ে দেবার জন্য বলল,

—কিছু হাসির খোরাক, ফাজলেমী—বুঝলে, কিছু ইত্‌রামি আর কি!

—না, ঠিক ইত্‌রামি নয়,—মিঃ সাহা বললেন—মনকে রিলিফ দেবার মতন কিছু চাই। যাতে ভিড়বাড়ে এমন এক আদটা মেয়ে না দিলে ফিল্ম চলে না—দর্শকরা খুবই হৈ-চৈ করে আপত্তি জানায়, আবার টিকিট কিনে দেখতেও দৌড়ায়……।

—এতে সিনেমা শিল্পরস সমৃদ্ধ তো হচ্ছে না! শিক্ষা-মূলকও হচ্ছে না—আলোক বললো!

—রাখুন মশাই! শিল্পরস বা শিক্ষা দেবার আমরা কর্ত্তা নই। আমাদের পয়সা চাই! ঘরের টাকা বের করে ব্যবসা করবো, টাকাটা ফিরিয়ে আনতে হবে তো। শুনুন, আপনাকে আমি একটা প্লট বলছি, লিখে ফেলুন সেটা—নাচ-গান আর হাসি জুড়ে দিন তার সঙ্গে যত পারেন, অবশ্য চোখের জল জুড়তেও ভুল করবেন না—ওটা চাই-ই! এই, চা দিয়ে যারে…উনি ভৃত্যকে ডাকলেন!

গল্পটা এবার বলবেন আলোককে, কিন্তু ঠিক সেই সময় ভৃত্য অন্য একটি কার্ড নিয়ে এল। দুজনের নাম লেখা। মিঃ সাহা তাদের আসবার অনুমতি দিলেন। এলেন দুজন, একজন পুরুষ বয়স আন্দাজ ত্রিশ, অপরা নারী, সুন্দরী, তরুণী। নারীটীর দিকে মিঃ সাহার লুব্ধদৃষ্টি প্রখর হয়ে উঠলো মুহূর্ত্তে। বললেন—বসুন বসুন!...ওরে কে আছিস, কিছু ভাল খাবার নিয়ে আয়, আর ছ'কাপ চা।

আলোক দেখলো, মিঃ সাহা তাকে গল্প বলবার আর সময় পাবেন না এখন। ঐ মেয়েটিকে নিয়ে তিনি অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে উঠছেন। মেয়েটি সিনেমায় অভিনয় করবার জন্য এসেছেন, সঙ্গের ভদ্রলোকটি তাঁর স্বামী! স্বামী সঙ্গে এনেছেন তাঁকে! সুন্দরী তরুণী নারী...সিনেমার যোগ্যা অভিনেত্রী হতে পারবেন হয় তো; আলোক ভাবতে লাগলো—

এই একটা প্রচণ্ড প্রলোভন দেশের যুবশক্তিকে ক্ষয়িষ্ণু করে তুলছে! বিশেষতঃ যাদের রূপ এবং যৌবন আছে। স্বামী স্বয়ং অভিনয়ের জন্য স্ত্রীকে আনেন প্রডিউসারের কাছে। পিতাও হয়তো কন্যাকে আনেন—এমন আরো কত কি হয়। প্রশ্ন করলে ওঁরা ইউরোপের দৃষ্টান্ত দেবেন! কিন্তু ইউরোপ আর ভারত এক নয় এবং ইউরোপের নারী-মনের আত্মরক্ষার শক্তি আজো ভারতীয় নারী লাভ করতে পারে নি; কারণ বহির্জগতে সে নিতান্ত নবাগতা। আজকার জীবন-সংগ্রামের ঘোরতর দুর্দ্দিনে নারীকে বাইরে এসে নিজের অর্থার্জ্জন করতে হবে, কিন্তু সে-পথ কি শুধু মাত্র সিনেমার পথ?—আলোকের মনে প্রশ্ন জাগলো! পথ বিস্তর আছে; কিন্তু প্রলোভনটা প্রচণ্ড ভাবে আকর্ষণ করে এই দিকেই! মহানির্ব্বান তন্ত্রোক্ত শ্লোক মনে পড়লো:—

দাস্যন্তি ধনলোভেন স্বদারান্ নীচজাতিষু।
ব্রাহ্মণ্যচিহ্নমেতাবৎ কেবলং সূত্র ধারণম্॥

নৈব পানাদি নিয়মো ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিবেচনম্।
ধর্মশাস্ত্রে সদা নিন্দা সাধুদ্রোহো নিরন্তরম্॥

কিন্তু ওসব ভেবে ফল নাই। যা হবার, হবেই। তুষার মেয়েটিকে প্রশ্ন করছে; মিঃ সাহা তার পানে তাকিয়েই আছেন! আলোক ধীরে ধীরে বললো,

—ওরকম গল্প আমার দ্বারা লেখা হবে না মিঃ সাহা, মাফ করবেন।

—ও আচ্ছা, নমস্কার।—মিঃ সাহা আলোকের দিকে না চেয়েই নমস্কার জানালেন।

তুষারকে বলে আলোক উঠে চলে এল—আসবার সময় ভুলে এল ওর দামী ছাতাটা। তুষার নিশ্চয়ই সেটা মেসে নিয়ে আসবে। আলোক মেসের দিকে ফিরবে কিম্বা তুষারের জন্য অপেক্ষা করবে, ভাবতে ভাবতে পথ চলছে—সন্ধ্যা হয়ে গেছে; অকস্মাৎ একখানা মোটর ওর প্রায় গা-ঘেঁশে চলে গেল। গাড়ীর মধ্যে একটি পুরুষ—অন্যটি মেয়ে! ওরা আলোককে দেখেনি; আলোক দেখলো,—পুরুষটি বিকাশ, মেয়েটি উৎপলা! মিঃ সাহার বাড়ীই গেল ওরা।

উৎপলার গাড়ী এসে দাঁড়ালো মিঃ সাহার বাড়ীর দরজায়। নামলো বিকাশ আর উৎপলা। দারয়ান সেলাম জানিয়ে পথ ছেড়ে দিল সসম্ভ্রমে। বেশ বোঝা যায়,—ওদের জন্য কার্ড পাঠাবার কোনো দরকার হয় না। বিকাশ উঠে চললো উপরে, পাশে পাশে উৎপলা! মিঃ সাহা তখন সেই নবাগতা মেয়েটিকে দেখছিলেন; তুষার তাকে প্রশ্ন করছিল। বিকাশ পৌঁছেই একবার দেখে নিল ঘরের অবস্থাটা। মিঃ সাহা ত্বরিতে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে বললেন উৎপলাকে,

—আসুন, আসুন! কী সৌভাগ্য আমার!—বসতে চেয়ার দেখিয়ে দিলেন।

বসলো উৎপলা ; নবাগতা মেয়েটি এদের দেখে কিছু-কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিতা হয়ে উঠেছে, তুষার সেটা লক্ষ্য করে বললো—আসুন তো এ ঘরে একটু !

মেয়েটি তুষারের পিছনে পিছনে গেল পাশের ঘরে। সেখানে গিয়ে তুষার ওঁকে বলল,

—লজ্জা-সরম দেখছি এখনো আছে আপনার ! অথচ সিনেমায় অভিনয় করতে এসেছেন !

—হ্যাঁ—না, নতুন লোক দেখে একটু···মেয়েটি আমতা আমতা করতে লাগলেন।

—দেখুন, ভদ্রলোকের মেয়ে, ভদ্রলোকের বৌ—কেন এ লাইনে আসছেন ? বাড়ী যান্ !

মেয়েটি চুপকরে দাঁড়িয়ে রইল। তুষার আবার বললো—এ বড় কঠিন ঠাঁই ; আপনাকে নিতান্ত নিরীহ গৃহস্থ ঘরের মেয়ে বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু জানবেন, এ লাইনে এলে আপনার ঐ পবিত্রতা থাকা সম্ভব হবে না—, পারবেন ?

—না—মেয়েটি মাথা নামালো এবং তারপরই ঘর থেকে বেরিয়ে এসে স্বামীকে বললো—চলো !

মুখ-চোখ ওর লাল হয়ে উঠেছে ; তুষারও পিছনে পিছনে এসে ওঁর স্বামীকে বলল,

—আপনারা বাড়ী গিয়ে ভাল করে বুঝে দেখুন, রাজি হোন তো, কাল আবার আসবেন।

ওরা নমস্কার জানিয়ে চলে গেল। মিঃ সাহা এই কয়েক মিনিট উৎপলা আর বিকাশকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন ; এতক্ষণে তুষারের দিকে চেয়ে সক্ষোভে বললেন,

—তোমার ঐগুলো বড় দোষ তুষার, মেয়েটাকে ভাগালে কেন, বলো তো ?

—কারণ, বাড়ীতে আমার মা আর বোন আছে, আমি তাদের পবিত্র দেখতে চাই !

—এরকম করলে ব্যবসা চলে না।

—ব্যবসা চালাবার জন্য বিস্তর আছে মিঃ সাহা,—এরা নয়, এরা মা-বোনের জাত ! এদের প্রকৃতিতে ষ্টুডিওর হাজার ভোল্টের আলো সইবে না।

মিঃ সাহা অত্যন্ত বিরক্ত হচ্ছেন, কিন্তু তুষারকে তিনি অনেক কারণে খাতির করতে বাধ্য হন ; তাই মুখখানা ব্যাজার করেও চুপ করে রইলেন ! বিকাশ বলল,—কোন্ বইটার জন্য একে চাইছিলেন মিঃ সাহা ?

—বই এখনো ঠিক হয় নি ; একখানা লিখিয়ে নেব ভাবছি ! নায়িকার মুখ নতুন না হলে দর্শকরা আর পয়সা দিতে চায় না ! বেশ ছিল মেয়েটা।

—আমি আরো সুন্দর মুখ এনে দিতে পারি একখানা—বিকাশ বললো !

—আছে নাকি ?—মিঃ সাহা মহা আগ্রহান্বিত হয়ে উঠলেন।

—আছে !—বিকাশ উৎপলার পানে চাইল। উৎপলা ঠিক বুঝতে পারছে না কে সেই মেয়ে। উৎপলার কথাই বলবে নাকি বিকাশ ! কিন্তু সেটা সম্ভব নয় ! উৎপলার বিস্ময়কে অতিক্রম করে বিকাশ বললো,

—তোমায় ওখানকার সেই মেয়েটি···কি যেন নাম···রেবতী, চমৎকার মেয়ে !

প্রায় আধমিনিট নির্ব্বোধের মত চেয়ে থাকলো উৎপলা বিকাশের দিকে ! অকস্মাৎ। —না—না—না···আর্ত্তকণ্ঠে প্রতিবাদ করে উঠলো···সে খুব ভাল ঘরের মেয়ে—সে অসম্ভব !

—তোমার ওখানে আবার ঘরের ভাল-মন্দ তফাৎ আছে নাকি?—বিকাশ বিদ্রূপ করছে। সেখানে তো সবাই ঘর-ছাড়া,—আব্রহ্মস্তম্ব পর্যান্ত অপবিত্র!

উৎপলা নিশ্চুপ হয়ে গেল; প্রতিবাদ করবার মত কিছুই তার নাই—নিজকে অতিকষ্টে সংবরণ করে রাখলো উৎপলা—হয়তো কেঁদে ফেলতো, হয়তো কঠিন কথার আঘাত করতে চাইতো বিকাশকে,—হয়তো উঠে চলে যেতো,—কিন্তু কিছুই সে করতে পারলো না! মিঃ সাহা ব্যাপারটা শুনছিলেন, এতক্ষণে বললেন,

—তা ভাল ঘরের মেয়ে, ভাল ভাবেই থাকবে; আপনি অত উতলা হচ্ছেন কেন উৎপলা দেবি; ইয়োরোপ-আমেরিকায় বড় বড় ঘরের মেয়েরা সিনেমা-শিল্পে যোগদান করছেন—এদেশেও করবেন। তাছাড়া এখন সিনেমা-শিল্প যথেষ্ট উন্নত হয়েছে—অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তি এ লাইনে আসছেন। আরো আসবেন।

উৎপলা কোনো কথা বলছে না। ওকে চুপ করে থাকতে দেখে বিকাশ বলল,—নায়িকার ভূমিকায় চমৎকার মানাবে ওকে! মুখখানা এত চমৎকার যে—জানেন মিঃ সাহা, কৃষ্ণনগরের সরভাজা আর কি!—হাসলো বিকাশ; কিন্তু ওর কথা তখনো শেষ হয় নি। মিঃ সাহার হাসির খোরাক যুগিয়ে দিয়ে আবার বলল,

—কাগজে পাব্লিসিটি দিয়ে ওর নামটাকে 'বুম' করে দিতে হবে, তখন দেখে নিও উৎপলা, ওর সেই ভাল-ঘরের ভাল অভিভাবকরা ওর সম্বন্ধে গর্ব্বই বোধ করবে!

—কিন্তু আমি একাজ কিছুতেই করতে পারবো না!

—কি তুমি করবে তাকে নিয়ে? বিকাশ প্রশ্ন করলো—সেলাই-বোনা আর রান্না শিখিয়ে ভালভাবে কারো জীবন নির্ব্বাহের ব্যবস্থা করা যায় না

উৎপলা—নার্সিং বা মিডওয়াইফারীর লাইনে কোনো রকমে জীবনধারণ চলতে পারে। কিন্তু ওর যখন অত রূপ আছে, তুমি কি মনে কর, তোমার কথামত চলে ও নিজের জীবনটা ব্যর্থ করবে? কখ্‌খনো না! ও এমন কিছু সতী-সাবিত্রী মেয়ে নয় যে তার বিয়ে দিয়ে তুমি ঘরের বৌ করতে পার! যা বলছি, ওর ভালর জন্যই বলছি আমি।

উৎপলা চুপ করে রইল; যেন কিছু ভাবছে; মিঃ সাহা প্রশ্ন করলেন বিকাশকে,

—আপনি কি মনে করেন বিকাশবাবু, সেই মেয়েটিকে নায়িকা করা যেতে পারবে?

—নিশ্চয়! তার চেহারাখানা দেখলেই দর্শকরা তাজ্জব বনে যাবে! অভিনয় সে যেমনই করুক, তাকে দেখবার জন্যই লোকের ভিড় কনট্রোল করতে পুলিশ না ডাকতে হয়!

হাসলো বিকাশ; মিঃ সাহার চোখ দুটো প্রলুব্ধ হয়ে উঠছে ক্রমশঃ। উনি যেন ধ্যাননেত্রে দেখতে পাচ্ছেন মেয়েটিকে! উৎপলা কেন এখানে এসেছে, তা টেলিফোনে পূর্ব্বেই তাঁকে জানিয়েছিল বিকাশ। উৎপলার আশ্রমের জন্য বিকাশ মিঃ সাহার কাছ থেকে কিছু মোটা টাকা আদায় করে দেবে! মিঃ সাহা একটু ভেবে বললেন,

—আপনার আশ্রমের জন্য এখন একটা চ্যারিটি-শো আমি দিচ্ছি আমার হাউসে, আর নতুন বই তোলা হলে আরেকটা চ্যারিটি-শো দেওয়া যাবে—উপস্থিত আমি ব্যক্তিগত ভাবে আজই কিছু···উনি বিকাশের দিকে চাইলেন, হাজার টাকা।

—আরে না-না মিঃ সাহা—হাজার দশেক বলুন! বিকাশ প্রতিবাদ করলো!

—অত পারবো না—আমি গরীব মানুষ, তাছাড়া ব্যবসার যা অবস্থা···

—তা ঠিক, ব্যবসার অবস্থার জন্যই তো বলছি—কিছু বেশি ইন্‌ভেষ্ট করুন!

—ইন্‌ভেষ্ট!—মিঃ সাহা চাইলেন বিকাশের দিকে।

—তাছাড়া আর কি!—বিকাশ মৃদু-মৃদু হাসতে লাগলো।

উৎপলা দেখছে, তাকে বাদ দিয়েই কথাবার্ত্তা সব ঠিক হয়ে যাচ্ছে এদের মধ্যে; কিন্তু মিঃ সাহা বললেন—অতটাকা কোথায় পাব বিকাশ বাবু? তবে যে মেয়েটির কথা আপনি বলছেন, উৎপলা দেবী যদি তার সঙ্গে কন্‌ট্রাক্ট করিয়ে দেন যে সে আমার কোম্পানীতেই অন্তত বছর পাঁচ-সাত কাজ করবে, তাহলে হাজার পাঁচেক না-হয় দিচ্ছি আমি আশ্রমের জন্য—এর বেশি অসম্ভব!

—না, থাক্। ওরকম কন্‌ট্রাক্ট আমি করাতে পারবো না তাকে দিয়ে!

—কেন?—বিকাশ প্রশ্ন করলো একটু কঠিনভাবে—পারবে না কেন?

—কারণ, আমি ওর গার্জেন নই! ওর নিজের মত্ ও আমার জানা নেই!

—ওর কেউ গার্জেন নেই! আর ওর নিজের মত আছে; না থাকলে মত করিয়ে আমরা নিতে পারবো!—কিন্তু তোমার অসম্মতির অন্য কারণ আছে, সেটাও আমি জানি!

—কি?—উৎপলা প্রশ্ন করলো উৎকণ্ঠিত ভাবে!

—তুমি চাইছ, ওকে কোনো ভদ্র গৃহস্থের বৌ করতে; কিন্তু তা হবার নয়; ও ভদ্র নয়—আমি সাত দিনের মধ্যে ওকে উইন্ করে তোমায় দেখিয়ে দিতে পারি—ও অত্যন্ত চপল মেয়ে!

—কি করে জানলে তুমি?—উৎপলা বিস্মিত হয়ে শুধুলো!

—জানতে আমার দেরী লাগে না! এ পর্য্যন্ত এমন কেনো মেয়ে আমি দেখলাম না—যাকে···

—থামো বিকাশ—উৎপলা যেন ধমকে উঠলো ;—পৃথিবীর কতটুকুই-বা তুমি দেখেছো ! মেয়েদের সম্বন্ধে এত ছোট ধারণা তোমার বদলাও !

—হাঃ হাঃ হাঃ ! মনু বলেছেন—"নৈতদ্ রূপং প্রপশ্যন্তে নাসাং স্ত্রানি সংস্থিতাঃ ।"……

—থামুন মিঃ চৌধুরী—মিঃ সাহা হেসে বললেন—সংস্কৃত আমি মোটে বুঝতে পারি না। আর কেই-বা বোঝে ! হাঃ হাঃ হাঃ !—উচ্চ হাসি হাসলেন উনি ! হাসির মধ্যেই কথাটা শেষ হয়ে গেল, কিন্তু কাজের কথা এখনো কিছু হয় নি ! তুষার এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল। বাগ পেয়ে বললো,

—মেয়েরা সত্যিই অত ছোট নয়, মিঃ চৌধুরী, তবে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে হয়তো আপনি সৌভাগ্যক্রমে কয়েকটা ক্ষেত্রে জয়লাভ করেছেন !

—সৌভাগ্য অর্জন করে নিতে আমি জানি তুষারবাবু—বিকাশ সদম্ভে ঘোষণা করলো !

মিঃ সাহা উৎপলার দিকে চাইছিলেন। মাথা নীচু করে বসে রয়েছে উৎপলা। কি যে ও বলবে, ঠিক করতে পারছে না। কিন্তু ওর বলার উপর এখন আর যেন নির্ভর করছে না ব্যাপারটা। বিকাশই কথা দিল—ওর নাম রেবতী ; নামটা আগেই বদলে ফেলতে হবে ; নাম দেওয়া হোক—"রাগশ্রী" !—কি বলেন ? বেশ সুইট্ নাম হবে, সিনেমার উপযুক্ত নাম।

—তা চলতে পারে !—মিঃ সাহা সমর্থন করলেন !—গাইতে পারে নাকি মেয়েটি ?

—পারে ; আমি খবর নিয়েছি ! খুব ভাল না পারলেও শিখিয়ে নেওয়া যাবে। তা'হলে উৎপলা—চল, মিঃ সাহাকে একবার দেখিয়ে দাও তো মেয়েটিকে !

—আজ আর থাক—রাত হয়ে গেছে!—উৎপলা ডুবুডুবু মানুষের খড়-কুটো ধরার মত বললো—এতো রাত্রে আপনাদের নিয়ে আশ্রমে যাওয়া ঠিক হবে না। তা'ছাড়া আমি গোপনে ওর মত্‌টা জেনে নিতে চাই।

—ওর অমত হবে না! সিনেমায় আসবার জন্য কত মেয়ে ঝুলোঝুলি করছে।

উৎপলা চুপ করে রইল। বিকাশ যেন বুঝতে পারছে উৎপলার চিন্তাধারা;—বললো,—তোমার আশ্রমের বদনাম হবে ভাবছো? কিংস্থ না, কাউকে জানতেই দেওয়া হবে না যে ও তোমার আশ্রমের মেয়ে! আগেই আশ্রম থেকে ওর নাম কেটে দেওয়া হবে। ওর অভিভাবকরা তো ওকে ত্যাগই করেছেন—তাঁরাও আর খোঁজ করবেন না। আইন বাঁচিয়ে বাকিটা আমরা ঠিক করবো সব।

উৎপলা ভাবতে লাগলো—এতোদিন আশ্রম চালাচ্ছে, এমন কঠিন সমস্যায় সে পড়ে নি এর পূর্ব্বে। টাকার অভাব হয়েছে, দেশের বদান্য ব্যক্তিদের সাহায্যও পেয়েছে সে! সেই সাহায্য পেতে তাকে সাহায্য করেছে আলোক। আলোক আজ নাই; তার কাজের ভালমন্দ বিচার করবার একমাত্র লোকটি আজ আর নাই এখানে! উৎপলা এখন যা-খুশী করতে পারে—কেউ তার সমালোচনা করবে না। উৎপলা যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো একটা! আলোক না থাকা একদিক দিয়ে তার পক্ষে ভালই! কিন্তু তক্ষুনি উৎপলার মনটা অন্যদিকে ফিরলো। আলোক থাকলে আজ বিকাশ তাকে দিয়ে এ কাজ কিছুতেই করিয়ে নিতে পারতো না; সাহসই করতো না; কিন্তু টাকার বড় দরকার। তা ছাড়া রেবতীকে ভাল লাইনেই দিচ্ছে সে; যদি ভাল অভিনয় করতে পারে, অবিলম্বে তারকা হয়ে উঠবে। রূপ আছে, যৌবন আছে তার—উৎপলার আশ্রমে সেলাই-

বোনা শিখে কিই-বা উন্নতি করবে সে? এ কাজে তার ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ, উজ্জল হবার সম্ভাবনা।

মিঃ সাহা ইতিমধ্যে ড্রয়ার টেনে চেক-বই বের করে লিখতে আরম্ভ করেছেন। পাঁচ হাজার টাকার একখানা চেক লিখে আর একবার ভাল করে দেখে তিনি ধীরে ধীরে তুলে দিলেন উৎপলার হাতে। বিনীত হাস্যে বললেন,

—উপস্থিত এই সামান্য দান গ্রহণ করুন—পরে আবার—হাসলেন মৃদু।

হাত পেতে নিল উৎপলা চেকখানা! পুরো পাঁচ হাজার টাকার চেক। পাঁচের গায়ে তিনটে শূন্য ত্রিনয়নের মত তাকাচ্ছে উৎপলার পানে। যেন পঞ্চাননের কপালে তিনটে চোখ; কিন্তু দুটো চোখ তো ভাঙের নেশায় শ্মশানে শুয়ে ঝিমোতে থাকে—বাকি তৃতীয় নয়নটা জাগে না। রুদ্রের ঐ তৃতীয় নয়নটা অন্ধ হয়ে গেছে আজকাল—ওটা শুধু শূন্য—শুধু অঙ্ক বাড়ায় সংখ্যার ডানদিকে বসে—আর কিছু নয়—উৎপলা ভাবলো, অযুত-নিযুত-লক্ষ-কোটির অঙ্ক দিয়েই চলছে এই পৃথিবী। আজ যদি ঐ অঙ্কশাস্ত্রটা পৃথিবীর মানুষ ভুলে যায় একমুহূর্তে, তা'হলে পৃথিবীর সভ্যতার কি অবস্থা হবে? অঙ্কই তো চালাচ্ছে আজ পৃথিবীকে! পৃথিবীর সভ্যতায় অঙ্কের দান অসীম! এই বাড়ীর নম্বরটা অঙ্কে লেখা; ঐ এরোপ্লেনটারও অঙ্ক দিয়ে নাম—এই চেকখানারও অঙ্ক দিয়ে শ্রেণীভাগ……

কর্কশ শব্দে একখানা এরোপ্লেন উড়ে যাচ্ছে মাথার উপর দিয়ে; IV 21-3-48 কিম্বা ঐ রকম কিছু হয়তো ওর নম্বর। নম্বরকে নমস্কার! উৎপলার চোখ দীপ্ত হয়ে উঠলো পাঁচের গায়ে তিনটে শূন্য দেখে।

তুষার নিজের অবস্থাটা অনেকক্ষণ থেকে অনুভব করছে। তার আর এখানে থাকা উচিৎ হচ্ছে না—এটা যেন বুঝেছে সে। মিঃ সাহা আজ বিকাশকে পেয়েছেন; তার বড় উৎপলা—তারো বড় আশা পেয়েছেন, সেই একটি না-দেখা মেয়ে! অতএব তুষারের আর থাকা উচিৎ নয়। সে ধীরে ধীরে উঠলো—বললো,

—আমি তাহলে এখন যাচ্ছি!

—আচ্ছা এসো! মিঃ সাহা বললেন!

তুষার আস্তে ওদিকে গিয়ে টেবিলের কোণায় ঠেসানো ছাতাখানা তুলে নিল! উৎপলা দেখতে পেল ছাতাটা। বিস্মিত হয়ে শুধুলো,

—ও ছাতাখানা কি আপনার?

—আজ্ঞে না—হাসলো তুষার—বললো—তবে চুরি করি নি—ছাতাটা আমার এক বন্ধুর।

—তার নাম?

—আলোক!—তুষার এক মুহূর্ত্ত উৎপলার মুখপানে চেয়ে চলে গেল।

পাঁচ হাজার টাকার চেকখানা পড়ে গেল উৎপলার হাত থেকে টেবিলে! মৃতের মত সাদা হয়ে গেছে তার মুখখানা! আলোক এখানে এসেছিল তাহলে!

—কি হোল মিস্……মিঃ সাহা ব্যগ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন।

—না, কিছু না।—উৎপলা সামলে নিল! বললো—আলোক কি জন্য এসেছিল এখানে?

—ঐ তুষার এনেছিল! তাকে দিয়ে একটা গল্প লিখিয়ে নেব ভেবেছিলাম, তা সে জবাব দিয়ে গেল! চেনেন নাকি তাকে আপনি?

—হ্যাঁ—গল্প লিখলো না কেন?

—তা ওই জানে।—মিঃ সাহা বললেন নীরস কণ্ঠে!—আপনার সঙ্গে ওর কিসের পরিচয়? দেখে তো নিতান্ত ভ্যাগাবণ্ড বলে মনে হোল!

—হ্যাঁ—ভ্যাগাবণ্ডই!—উৎপলা বললো।—চলো বিকাশ, আজ তাহলে উঠি মিঃ সাহা!

—বসুন না—আর একবার চা হোক—আর কিছু খাবার!—মিঃ সাহা অনুরোধ করলেন!

—ওকে ভ্যাগাবণ্ড মনে করে খুবই ভুল করেছেন মিঃ সাহা—ও ভগীরথ, গঙ্গাকে আনবার তপস্যায় নিযুক্ত আছে!—উৎপলা বললো অকস্মাৎ,—কিন্তু থাক আর চা! রাত হয়েছে—আজ যাই।

উৎপলা উঠলো। বিকাশ কথাটা লক্ষ্য করলো উৎপলার; বললো,

—ওকে তুমি ভয় করো নাকি উৎপলা?

—না—ভালোবাসি—উৎপলা সস্মিত স্বীকৃতি জানাচ্ছে—কিন্তু বিকাশ, ওকে ভালোবাসা আর নিরাকার ঈশ্বরকে ভালবাসা এক কথা! এসো। নমস্কার মিঃ সাহা।

ওরা বেরিয়ে গেল!

আলোক আপন মনে হাঁটছিল, অকস্মাৎ তার মনে পড়লো—এ মাসের "জ্যোতি" পত্রিকায় তার লেখা একটা প্রবন্ধ বেরিয়েছে—অথচ পত্রিকাখানা এখনো হস্তগত হয় নি; সম্পাদক হয়তো আলোকের পূর্ব্ব ঠিকানাতেই পত্রিকাখানা পাঠিয়ে দেবেন, উৎপলার আশ্রমে—এবং সেটা আলোক আর পাবে না! 'জ্যোতি' পত্রিকার অফিস বালীগঞ্জে। সেখানে গিয়েই পত্রিকাটা নেবে, ভেবে আলোক একখানা চলতি বাসে উঠে পড়লো!

নিজের চিন্তায় সে এত নিবিষ্ট যে সন্ধ্যা হয়ে গেছে, পত্রিকার অফিস হয়ত বন্ধ হয়ে যাবে, এ সব কথা তার মাথায় এলো না। ভীষণ ভীড়ের মধ্যে দোতলা বাসের দ্বিতলে চড়ে সে রাস্তার জনসমুদ্র দেখতে দেখতে এসে পড়ল বালীগঞ্জের গড়িয়াহাট মার্কেটের কাছে! এইখানেই 'জ্যোতি' পত্রিকার অফিস। অফিস বন্ধ হয়ে গেছে ঠিক ছ'টায়—এখন সাতটা কুড়ি; নির্বোধের মত আলোক ভাবতে লাগলো—অনর্থক এতখানা রাস্তা এই ভিড়ের মধ্যে এল সে। কিন্তু ভগবানের রাজ্যে কিছুই নিরর্থক যায় না; আলোক ওখান থেকে পায়ে হাঁটা সুরু করলো।

হাঁটছে আলোক, আপনার মনে ভাবছে; এটা ওর চিরদিনের অভ্যাস। হঠাৎ মনে পড়লো, অবন্তীর বাড়ীটা কাছেই—পাঁচ-সাত মিনিটের পথ এখান থেকে। অবন্তী জানে না যে আলোক চাকরী ছেড়ে দিয়েছে; ক'জনই বা জানে! ওখানে এই ক'বছরে বহু লোকের সঙ্গেই পরিচয় হয়েছিল আলোকের—তাদের কাউকেই আলোক জানায় নি তার পদত্যাগের কথা। তারা ওখানে গিয়ে খোঁজ করবে আর নিরাশ হয়ে ফিরবে। কিন্তু কেন খোঁজ করবে তারা! আলোক এমন কিছু বিরাট ব্যক্তি হয়ে ওঠেনি ওখানে, যাতে লোকে তার খোঁজ করতে যাবে!—তবে সে ওখানকার সেক্রেটারী ছিল—বহু ধনীর কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করতে হোত তাকে! ঐ সংগঠন-শক্তি তার আছে বলেই উৎপলা তাকে অতখানা শ্রদ্ধার চোখে দেখতো। ওমনি কোনো ব্যক্তির হয়তো প্রয়োজন হতে পারে আলোককে; ওমনি কোনো জন-কল্যাণকর আশ্রম সংগঠনের জন্য তার সাহায্য প্রয়োজন হতে পারে। এ রকম প্রস্তাব কে যেন একবার করেছিলেন আলোকের কাছে! হ্যাঁ, মনে পড়েছে—মিঃ ম্যাকৃ করেছিলেন প্রস্তাব একবার।

হাসি পেল আলোকের। মিঃ ম্যাক্‌কু না বললে চটে যান; অথচ পৈত্রিক উপাধি মাক্‌! ওকে ইংরাজি-গন্ধী না করলে আস্বাদ লাগে না। ইংরাজ কি চমৎকার ভাবে এদেশের মানসিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়ে গেল! ওঃ! রাধাগোবিন্দ হয়েছেন আর, গেভিন্‌; শ্রীসুদর্শন মুখোপাধ্যায় হয়েছেন মিঃ স্যাণ্ডার্শন ম্যাকাঞ্জি,—ইত্যাদি অসংখ্য দৃষ্টান্ত থেকে প্রমাণ করা যায় যে ইংরাজ তার চিন্তাধারাকে এদেশের মানুষের মজ্জায় মজ্জায় সঞ্চারিত করে দিয়েছে বহু রকমে—ইরাণ-তুরাণ, মোগল-পাঠান কেউ একাজ করতে পারে নি! আশ্চর্য্য শক্তি ঐ জাতটার। মাত্র পৌনে দুশো বছরের শাসনে একটা বিরাট দেশের বিপুল ঐতিহ্যকে ভুলিয়ে দিয়েছিল প্রায়। শুধু তাই নয়—সরকারী অফিস থেকে সাধারণ মানুষ পর্য্যন্ত প্রত্যেককে লিখতে হোত—'ইয়োর মোষ্ট ওবিডিয়েণ্ট্‌ সারভেণ্ট্‌'—একান্ত অনুগত ভৃত্য হওয়া ছাড়া অপর কিছু চিন্তা করবার সুযোগও যাতে না থাকে, এমন পাকা ব্যবস্থা! তবু ভারত বিদ্রোহ করেছে—বিপ্লব জাগিয়েছে এবং শেষ পর্য্যন্ত জয়ী হয়েছে স্বাধীনতা-সংগ্রামে!

জয়ী হয়েছে—স্বাধীন হয়েছে, স্বরাজ্য লাভ করেছে ভারত; সত্যি করেছে? কে জানে! এখনো বিশ্বাস করবার মত কোনো প্রমাণ মেলেনি—তবে মিলবে—আশা করা অন্যায় হবে না!—আলোক শ্লথপদে বড় একটা পার্কে ঢুকে পড়লো! রাত হয়েছে আটটার উপর—কিন্তু এখন আর ভয় নাই! কিছুদিন আগের ঈর্ষা-বিদ্বেষ প্রসূত ভ্রাতৃহত্যা নিবারিত হয়েছে। নিশ্চিন্তে এখন ঘুরে বেড়ানো যায়; নিঃসঙ্কোচে অন্য মানুষকে আলিঙ্গন করা যায়—আলাপ করা যায়।

পার্কটা প্রকাণ্ড! বাংলার স্মরণীয় একজন নেতার নামে ওর নামকরণ। আলোক শ্রদ্ধায় মাথা নোয়ালো;—'জাতির সম্পদ—মৃত্যুর মহিমময়

শিখরে বসেও তুমি সম্পদ আমাদের; তোমাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা নিজদিগে শ্রদ্ধেয় করে তুলবো'।

আলোক এসে বসলো একটা গাছের তলায়। কিছুক্ষণ জিরিয়ে নেবে সে। আজ রাতটা তুষারের ওখানেই কাটাবার কথা,—কিন্তু ওখানে আর যেতে ইচ্ছে করছে না আলোকের। তুষার যে লোকটির কাছে ওকে নিয়ে গিয়েছিল, সেই মিঃ সাহার উপর আলোকের মনটা বিরূপ হয়ে উঠেছে—ঐ সঙ্গে তুষারের উপরেও। তুষার যে কাজ করে, সেটা ভাল কি মন্দ কাজ, তা অবশ্য তখন ভাবেনি আলোক, কিন্তু এখন তার মনে হচ্ছে, ওরকম কাজ যারা করে, তাদের মধ্যে আলোকের না-যাওয়াই ভাল; অথচ আজ রাতটা থাকার মত যায়গার তার অভাব। এত রাত্রে হঠাৎ কোনো হোটেল বা বোর্ডিংএ যাওয়া ঠিক হবে না। কিছুক্ষণ বসে তো থাকা যাক!

পার্কের লোকজন সব চলে যাচ্ছে—প্রায় ফাঁকা হয়ে এল পার্কটা। কত লোক কত রকম মন নিয়ে এসেছিল এখানে, জুড়ুতে কেউ—কেউ-বা কিছু কুড়ুতে, মন কিম্বা মোতি। আলোক এসেছে শুধু দেখতে—কিন্তু দেখবার আর কিছু নেই এখন; সব পার্কটাই ফাঁকা হয়ে গেল! আলোক উঠবে।

ওপাশে, অনেক দূরে কে যেন ক্রমাগত দেশলাই জ্বালছে। হাওয়ায় নিবে যাচ্ছে দেশলাই—চারটে—পাঁচটা কাঠি জ্বালালো সে—দেখছে আলোক। বিড়ি ধরাবে হয়তো……আলোক উঠে ঐদিক পানেই চলতে লাগলো! কোনো কারণ নেই তার যাবার ওদিকে—অথবা ঐদিকে সর্টকাট করে আলোক এসে 'আশুমুখুজ্যে রোডে' পড়তে পারে শিগ্রি—ট্রাম ধরবার সুবিধা হবে।

লোকটা আবার দেশলাই জ্বালালো। আলোক খুব কাছে এসে পড়েছে। দেখতে পেল দূরের বিজলী আলোর আবছা আলো-আঁধারে,

লোকটি বেশ আসন করে বসে আছে! সমুখে কতকগুলো-কি সাজানো, ফুল-মালা বা ঐ রকম কিছু যেন! দেশলাই জ্বেলে তাতেই আগুন ধরাতে চাইছে সে। কি ব্যাপার! আলোক অতিবিস্মিত হয়ে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়ালো। আবার দেশলাই জ্বালালো লোকটা। কিন্তু আগুন ধরবার আগে নিবে গেল কাঠিটি; আলোক ওরই মধ্যে দেখতে পেল, কতকগুলো ফুল-মালা, শুকনো পাতা এবং কাগজের স্তূপ—তার উপর কি যেন ঝকঝক করছে। কোনো ধাতব দ্রব্য—আর লোকটা সবশুদ্ধ পুড়িয়ে ফেলবার জন্য দেশলাই জ্বালছে! অনর্থক পরিশ্রম! হাওয়া এত জোর যে এখানে আগুন ধরানো প্রায় অসম্ভব—পেট্রল দিলে জ্বলতে পারে আগুন। আলোক এগিয়ে এল লোকটাকে দেখবার জন্য। আবার দেশলাই জ্বালালো সে। আলোক অবাক হয়ে গেল ওকে দেখে। ঝকঝকে বস্তুটাও দেখতে পেল আলোক। আগুনটা এবার জ্বলেছে কাগজের স্তূপে; ভালই দেখা যাচ্ছে লোকটাকে, আর ওর পোড়াবার জিনিষটাকেও। আলোক দেখে নিয়ে বলে উঠলো,

—ভুল করছিস সিধু—মমতাকে মুছে ফেলা এত সহজ নয়!

চমকে উঠলো সিদ্ধেশ্বর! হক্‌চকিয়ে তাকালো চারিদিকে!

—কে? শ্রীগুরুদেব?—সিধু যেন নিদ্রোত্থিতের মত বলে উঠলো!

—না ভাই, আমি আলোক!—বলেই আলোক এসে চট্‌করে তুলে নিল আগুনের মধ্য থেকে অবন্তীর ফ্রেমশুদ্ধ ফটোখানা। বললো আস্তে,

—এটাকে পুড়িয়ে নষ্ট করবি সিধু, তবু এতে ফুলের মালা পরিয়েছিস তুই! সন্ন্যাসীর আচরণে এতবড় ফাঁকি আর নেই সিধু,—তোর গুরুকে শুধোস!

—আলোক—সিধু উঠে দাঁড়ালো তীরের মত;—তুই কি করে বুঝলি আলোক? সারাদিন আমি আজ ঐ নিয়ে ভেবেছি, আর ওটাকে নষ্ট করবার চেষ্টা করেছি, পারিনি—কিন্তু আমি ওটাকে পোড়াবই!

—এটার উপর এত রাগ কেন সিধু? —আলোক হাসলো—বললো, অবন্তীকে তুই ভালোবাসিস—এ সত্য অস্বীকার করে মনকে ফাঁকি দিস্‌নে আর। এটাকে না আনলেই পারতিস সঙ্গে, কিম্বা অনায়াসে ফেলে দিতে পারতিস রাস্তায়, পুড়িয়েও দিতে পারতিস যে-কোন ময়রার দোকানের উনুনে; তা না করে তুই ফুল দিয়ে একে সাজিয়ে-গুছিয়ে বেশ ভাল যায়গায় বসিয়ে রীতিমত শ্রদ্ধার সঙ্গে, হয় তো মন্ত্র পাঠ করে কুশপুত্তলি দাহ করতে বসেছিস অবন্তীর!—হা-হা-হাঃ!

জোরে হেসে উঠলো আলোক। লজ্জিত সিদ্ধেশ্বর মাথা নামিয়ে নিচ্ছে। বললো—তুই সব কথা কি জানিস আলোক? অবন্তীর সঙ্গে দেখা হয়েছে তোর?

—হ্যাঁ—তবে সব কথা জানি না, জানি কিছু কিছু। তুই কখন এসেছিস ওখানে?

—এসেছিলাম সকালে; তার কিছুক্ষণ পরেই চলে এসেছি। আসবার সময় কেন যে ঐ ছবিটা সঙ্গে আনলাম, কে জানে! আমার পাপের মার্জনা নেই!

—পাপ কিসের? কাউকে ভালবাসায় কোনো পাপ হয় না সিধু! এ শিক্ষা কে দিয়েছে তোকে? প্রেমের মধ্যে দিয়েই মানুষ মহা-প্রেমময়কে লাভ করে। আয়, ওদিকে বসে শুনি তোর কথা···আলোক ওর হাত ধরে একটা বেঞ্চে বসালো।

চুপ করে রয়েছে সিধু; আলোক বুঝতে পারলো সিধুর মনের অবস্থা। সাধারণ সন্ন্যাস-জীবনে সর্ব্বাগ্রে জাগে পাপের ভয়, পতনের আশঙ্কা। এই বুঝি পড়লাম, এই বুঝি নষ্ট হয়ে গেল সব-সাধন-ভজন; আলোক পড়েছে দু-একজন সন্ন্যাসীর লেখা ডায়েরীতে; উত্তর কালে তাঁরাই সর্ব্বজন নমস্য সাধক হয়েছিলেন! আলোক বলল,

—জীবনকে জটিল করবার কাজ সাধুর নয় সিদ্ধেশ্বর—সাধুর জীবন সরল-সহজ-ঋজু হবে।

—হুঁ—সিধু শুধু সমর্থন করলো কথাটা ওর! অবন্তীর ফটোখানা একচোখ দেখে আলোক বললো—এটা কি ভাবে তুই পেয়েছিস, আমি জানি না; কিন্তু সারাদিন এটাকে পুড়িয়ে ফেলবার চেষ্টা না করে যদি "বেশ আছে—থাক" বলে রেখে দিতিস তোর ঝোলার মধ্যে, তাহলে আপনিই ওটা সহজ হয়ে যেত তোর কাছে—সয়ে যেত; সাধনার বিঘ্ন বলে মনে হোত না—হয়তো সাধনার সহায়ক হয়ে উঠতে পারতো!

—হুঁ—সিধু যেন বিচারকের কাছে আসামীর মত "হুঁ" দিচ্ছে। আলোক হাসলো। বললো,

—যে-পথে তুই আজ চলেছিস—আমি যদিও জানি না, সেটা কোন পথ, তবু আন্দাজ করতে পারছি—সেটা ত্যাগের পথ। কিন্তু সিধু, ত্যাগ অর্থে সব ছেড়ে-ছুঁড়ে পালিয়ে যাওয়া নয়—সেটা সন্ন্যাসীর সাহসের পরিচায়কও নয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়,—
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ—"

অর্থাৎ সব কিছুতে জড়িয়ে থেকেও সব কিছুর উর্দ্ধের যে মানসিকতা মহাজ্যোতির পানে উঠতে চাইছে মানুষের অন্তর-দেউল থেকে, সেই মানসিকতার অনুশীলনটাই বড় কথা! স্ত্রী-পুত্র-পরিবার ছেড়ে বনে পালিয়ে গিয়ে যে নিশ্চিন্ততার আরাম—গৃহবাসী যে-কেউ তার সংসার নিয়ে তা' থেকে অনেক বেশী কঠোর সাধনা করে। যদি ঐ গৃহবাসী মনটাকে উর্দ্ধমুখীন রাখতে পারতো তাহলে মোক্ষ হোত তার করামলকবৎ! কিন্তু তা হতে পারে না—গৃহবাসীরা ঈর্ষা-দ্বেষে, পাপপুণ্যে জড়িয়ে পড়ে; কিন্তু থাক এখন এ সব কথা; তুই কখন এলি, কেন এলি, আর তারপর কি ঘটল, সব বল দেখি আমায়।

সিধু ধীরে ধীরে আরম্ভ করলো বলতে। গঙ্গাস্নান-পর্ব্ব থেকে অবন্তীর বাড়ী পৌঁছানো পর্য্যন্ত সে বেশ বলে গেল, তারপর ক্রমে উত্তেজিত হতে হতে কেমন যেন অন্য মূর্ত্তি হয়ে উঠলো সিধু। যেন সে-সিধু নয়। আলোক আশ্চর্য্য হয়ে ভাবলো—এ যেন সেই আদিম দস্যু, দুর্দ্দান্ত, গ্রাম্য, সিদ্ধেশ্বর, গাঁজাড়ে সিধু!

কিন্তু সিধু সামলে নিল নিজকে অত্যন্ত আকস্মিকভাবে; অতি করুন কণ্ঠে বললো,

—তুমি তো আমাকে চেন আলোক; অবন্তীর দেহের উপরে লোভ ছিল আমার দুর্ব্বার; আজ আমি হয়তো সৎসংসর্গে পড়ে কিছুটা ভালো হয়ে উঠেছি, কিন্তু এখানে এসে বুঝতে পারলাম—ভালো হওয়া অত সোজা নয়। মানুষের অন্তর থেকে মোহকে তাড়িয়ে দেওয়া মহত্তম সাধনা-সাপেক্ষ; সারাদিন আমি আজ কি করেছি, জানো আলোক?

—কি করেছ?—আলোক জিজ্ঞাসা করলো।

—বার বার অবন্তীর ঐ ফটোখানা বের করেছি আর দেখেছি; আর ভেবেছি, এখুনি ওটাকে নষ্ট করে ফেলবো; কিন্তু আলোক, সারাদিন সহস্রবার চেষ্টা করেও পারলাম না।

—পারবে না; মানুষের মনে এই দুর্ব্বলতা নিত্য, শাশ্বত, একে ক্ষয় করে নিঃশেষ করা অসম্ভব, তাই মানুষকে আরো মহৎ কিছু আশ্রয় করতে হয়, যার মহিমায় এই পার্থিব স্পৃহা লুপ্ত হয়ে যেতে পারে।

—সে কি বস্তু আলোক?

—তাকে বলে ভূমানন্দ! কিন্তু সে-ভূমিতে পৌঁছাবার পথে এগুলোকে এড়িয়ে যাওয়া চলে না সিধু—ফাঁকি দিয়ে সেখানে যাওয়া যায় না!—কিন্তু তুই এখন কি করবি, ভাবছিস?

—চলে যাব আশ্রমে; আজ সারাদিন আমার খাওয়া হয় নি আলোক!

আমার শালগ্রামশিলা পড়ে আছেন হাওড়ার পুলের কাছে গঙ্গার ঘাটে! তাঁর আরতিও হয় নি!—সিধু নিশ্বাস ফেললো!

—তাহলে চল—সেখানেই যাওয়া যাক!—আলোক উঠলো।

হাওড়া ষ্টেশনগামী একখানা বাসে চড়ে দু'জনে চলে এল পুলের কাছে। বিরাট ব্রিজ—বর্ত্তমান যুগের পূর্ত্তবিদ্যার বিপুল গৌরব ঘোষণা করছে সদর্পে। আলোক নেমে পড়লো সিধুকে নিয়ে। যে-দোকানে জিম্মা দেওয়া ছিল সিধুর জিনিষগুলি, সেই দোকানী নাই; ঘর তালাবন্ধ করে বাড়ী চলে গেছে। সিধু ভাবছে, অতঃপর কি সে করবে!—আলোক বলল,

—গঙ্গাজলেই পূজা করে নে তোর; তারপর চল, কিছু খাওয়া যাক্।

সিধু তাই করলো। আজ দীর্ঘ তিন বছরের বেশি হোল, সিধু কোনো দিন তার শালগ্রামের পূজা বাদ দেয় নি; আজই পূজা হোল না। কাছের একটা দোকানে কিছু খাবার কিনে জলযোগ করলো দুজনে। আলোক কথায় কথায় জেনে নিল সিধুর গ্রাম ত্যাগ করবার পর থেকে সন্ন্যাস নেওয়া এবং অবন্তীর সঙ্গে কাশীতে সাক্ষাৎ হওয়া পর্য্যন্ত সমস্ত ইতিহাস। সব শুনে প্রশ্ন করলো,

—অবন্তী সম্বন্ধে তোর সংঘ-নেতার অভিমত কি সিধু?

—কিছু না! অবন্তী গেলে তিনি তাকে সংঘে গ্রহণ করবেন; না গেলে কোনো আপত্তি নাই।

—তাহলে, যে-পথে তুই চলেছিস সিধু, অবন্তী গেলে সে-পথে তোর বাধাই হবে; অথচ, বেশ বোঝা যাচ্ছে, অবন্তীর উপর তোর লোভ-মোহ যথেষ্ট এখনো!

—তাই তো আজ দেখতে পাচ্ছি! কিন্তু আমি তাকে একখানা চিঠি লিখে বেশ তো চলে আসতে পারলাম আলোক!

—ওটা তোর তথাকথিত "সন্ন্যাসী-আমির" অহঙ্কারের আত্মপ্রকাশ! আলোক বললো,—অবন্তীকে ছেড়ে আসতে তোর কোথাও বাধে না, এই বাহ্যিক অহঙ্কারটাই দেখাতে চেয়েছিলি তুই; কিন্তু ওটা সত্য নয়। তাই সারাদিন মনের এই যন্ত্রণা তোর!

—এখন আমি কি করবো আলোক?

—কাল সকালে বলবো—এখন ঘুমো—বলে আলোক ঐখানেই একটা চত্বরে শুলো। সিধুও শুয়ে পড়লো ওর পাশে। আলোক ঘুমিয়ে গেছে, সিধু কিন্তু চেয়ে রয়েছে তারাভরা আকাশের পানে। আর্ত্ত অসহায় ওর দৃষ্টি—যেন সর্ব্বস্ব-হারা পান্থ, পথও দেখতে পাচ্ছে না!—সারা রাত্রি কেটে গেল এমনিই! সকালে স্নান-পূজা সারা হলে সিধু আবার শুধুলো আলোককে, সে কি করবে!

—তুই আশ্রমে ফিরে যা সিধু—অবন্তীর ছবিটাও নিয়ে যা—তোর শালগ্রাম-শিলার সঙ্গেই রেখে দিস—একাসনে, একই শ্রদ্ধার বেদীতে! কিছুদিন পরে আমি যাব ওখানে, তখন গিয়ে বলবো কি করতে হবে। আলোক ফেরৎ দিল অবন্তীর ছবিখানা।

—আলোক—সিধু বললো—বিদ্যা-বুদ্ধি-বিচক্ষণতায় আমি তোর হাঁটুর যুগ্যি নই, কিন্তু এ তুই কি বলছিস! ঐ ছবি নিয়ে গেলে আমার অবস্থা যে ভয়ানক হয়ে উঠবে আলোক!

—না নিয়ে গেলেই ভয়ানক হয়ে উঠবে! যা বলছি, কর।—আলোক উত্তর দিল।

সিধু ছবিখানা ছোট ঝোলায় ভরলো—যে ঝোলায় আছে শালগ্রাম-শিলা; ট্রেণ ধরলো গিয়ে!

আলোক এসে পৌঁছালো বন্ধুর মেসে ; তুষার চিন্তিত ছিল, আলোককে দেখেই বললো,

—জানি, তুই চিরদিনের বাউণ্ডুলে ; কোথায় ছিলি কাল রাত্রে ?

—গঙ্গার ধারে একটা চত্বরে।—বলে আলোক বসলো বিছানায়। দেখলো, ওর ছাতাটা তুষার আনতে ভোলে নি। তুষার একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো,

—তাহলে কি করবি ভাবছিস ? চাকরী তো একটা করতে হবে! নাকি ?

—চাকরী করবার ইচ্ছে নেই ! ব্যবসাও জানি না—গল্পলেখার কাজেও জবাব দিয়ে এলাম।

—গল্পটা লিখে দিলে কিছু টাকা পেতিস আলোক্! অবশ্য সে গল্প তোর গল্প থাকতো না, মিঃ সাহা সেটা নিজের নামেই চালাতেন—এরকম করেন উনি ; কিন্তু লিখলি না কেন ?

—ওরকম গল্পে কী উন্নতি হবে পৃথিবীর ? সাহিত্যেরই বা কি উন্নতি হবে ?

—কিছু পয়সা আসবে ; ভালোরকম পয়সা—তুষার নিম্নস্বরে বললো।

—চুরি করেও ত পয়সা আসে তুষার—কিন্তু পয়সা আনাটাই আমার জীবনের লক্ষ্য নয় ! ছেলে-মেয়ে নাই, বিয়েও করিনি—পয়সার তাগাদা দিতে কেউই নাই।

—বিয়ে তো করতে হবে ! ছেলেমেয়েও হবে।

—খুব সম্ভব না !—আলোক একটু হাসলো।—বিয়ে বিলাসিতা ; পৃথিবীর বেশি লোক বিয়ে করে, তার কারণ পৃথিবীর বেশী লোকই বিলাসপ্রিয়—হাসলো আলোক আবার।

—তুই কি তাদের বাইরে ?

—না, ঠিক বাইরে নয়, আমি তাদের ব্যতিক্রম!

—ঠিক বুঝলাম না আলোক!

—মানে, আমি পৃথিবীরই মানুষ, তবে বিলাসী মানুষ নই, বীতস্পৃহ মানুষ!

—এটা তোর অহঙ্কার আলোক! কে জানে, কবে, কোথায় মন তোর জড়িয়ে পড়বে। স্বয়ং শিবও এ বিষয়ে গর্ব্ব করতে পারেন না—তুষার দৃঢ় কণ্ঠে বললো!

—গর্ব্ব করছি না!—আলোক বললো—স্পৃহা যদি সত্যি জাগে কোনো দিন, তাহলে বিয়ে করবো না, এরকম ধনুকভাঙা পণও আমার নেই। উপস্থিত আমি নিস্পৃহ।

তুষার ও নিয়ে আর কোনো আলোচনা করলো না। বেলা হয়েছে; বলল,

—চল, খেয়ে নিই!—আমাকে এখুনি একবার যেতে হবে মিঃ সাহার ওখানে! তারপর যাব হরিমতী নামে একটা মেয়ের কাছে। মিঃ সাহার রক্ষিতা আর তাঁর সিনেমার অভিনেত্রী সে। সে-ই বরাবর নায়িকা হোতো, তবে এখন নাকি বয়স হয়ে গেছে বলে মিঃ সাহা নতুন কাউকে চাইছেন!

নিজের মনেই যেন কথাগুলো বলে গেল তুষার। ওসব শুনবার কোনই আগ্রহ আলোকের নাই; কোনো প্রশ্নই করে নি সে। কিন্তু শেষের কথাটা শুনে শুধুলো,

—নতুন কাউকে পেলেন নাকি অভিনয়ের জন্য?

—হ্যাঁ—শুনছি পাবেন! কাল উৎপলা দেবী নামে একজন মহিলা এসেছিলেন। তাঁরই আশ্রমে আছে নাকি এক উর্ব্বশী—তাকেই আনা হবে। তার জন্য হাজার পাঁচেক টাকা গত কালই দেওয়া হয়েছে উৎপলাকে!

আলোক ভাতের থালার সামনে বসতে যাচ্ছিল, হঠাৎ থেমে গেল যেন।

—উৎপলার আশ্রম? কি নাম মেয়েটির?—আলোক প্রশ্ন করলো।

—কি যেন রেবতী না রম্ভাবতী! আমি যদি ঐ মেয়েটাকে আনতে পারতাম, অন্ততঃ শ'পাঁচেক টাকা দালালী পেতাম; লাক্!

মহাদুঃখিত হয়েছে তুষার—বোঝা যাচ্ছে! কিন্তু আলোক ওদিকে লক্ষ্য করছে না। সে ভাবছে, উৎপলা একি করলো! কেন করলো? কিসের লোভে? কার প্ররোচনায়? আলোকের আসার পর একটা দিনও উৎপলার সবুর সইল না এমন একটা কাজ করতে! তবে কি আলোকের জন্যই উৎপলা এতদিন এরকম কাজ করতে পারে নি?—কে জানে! বারবার যে নিজকে দীনাতিদীনা সাধারণ নারী বলে বৈষ্ণব-বিনয় দেখিয়েছে—সে এতবড় শয়তানী—আলোক বিশ্বাস করতে পারছে না! কিন্তু এ সত্য! এর চেয়ে মিথ্যা যে অনেক ভালো ছিল!

আলোক খেতে পারলো না। কে যেন তার কণ্ঠরোধ করে দিচ্ছে! ঐ উৎপলাই সেদিন বলেছিল—'পাপকে সে ঘৃণা করে, কিন্তু পাপীকে সে সহানুভূতির চোখে দেখে'...এত বড় প্রতারণা করেছে উৎপলা আলোকের সঙ্গে!

—কিছুই খেলিনে তুই আলোক; শরীর খারাপ লাগছে নাতো?—তুষার জিজ্ঞাসা করলো।

—না—সকালে কিঞ্চিৎ জলখাবার খেয়েছিলাম।—আলোক উঠলো; হাত ধুলো, তারপর উপরে এসে সটান শুয়ে পড়লো তুষারের বিছানায়। তুষার বসে বসে একটা সিগারেট শেষ করে জামা-কাপড় পরলো—ছাতাটা নিল আলোকের, তারপর বললো,

—তুই তাহলে ঘুমো ; আমি ঘুরে আসি। আমি না আসা পর্যন্ত বেরুস না যেন।

চলে গেল তুষার ; আলোক আকাশ পাতাল ভাবছে! ঘরটায় আর কেউ থাকলে সে দুটো কথা কয়ে বাঁচতো। কিন্তু তুষারের ঘরটুকু শুধু তুষারের জন্যই! আলোকই ওখানে বাড়তি হয়ে উঠেছে! এদিক-ওদিক চেয়ে আলোক দেখলো, কোনো পুঁথি-পত্তর পাওয়া যায় কি না—নেই। পড়াশুনোর পাট চুকিয়ে দিয়েছে তুষার অনেকদিন। সময়টা আলোক কাটাবে কি করে? কোণাভাঙা একখানা আয়না পড়ে আছে একদিকে ; সেইটা তুলে এনে আলোক নিজের মুখ দেখলো—শুকিয়ে গেছে মুখখানা। দাড়িও উঠেছে বদ্‌খৎ রকমের—দেখতে কুৎসিৎ লাগছে! কিন্তু সে জানে, সে সুন্দর। সুন্দর বস্তু কুৎসিৎ হতে বেশি দেরী হয় না ; অসুন্দরকে সুন্দর করাই সুমহৎ সাধনা। সেই মহান সাধনায় নিজকে নিযুক্ত করতে গিয়েছিল আলোক,—আত্মজের হত্যাপ্রচেষ্টায় কলঙ্কিতা উৎপলা আবার সুন্দর হয়ে উঠেছে, এই ছিল তার ধারণা—অত সহজ নয় সুন্দর হওয়া!

কিন্তু কেন একথা ভাবছে আলোক! উৎপলা হয়তো বিশেষ কোনো কারণে রেবতীকে দিতে রাজী হয়েছে এবং ভাল একটা পথেই তাকে এগিয়ে দিচ্ছে!—রেবতীর অন্য আর কি পথ আছে? অভিনয়ে দক্ষতা দেখাতে পারলে তার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। তখন হয়তো ঐ রেবতীই বিশেষ একটা শ্রদ্ধা-সম্মানের আসন পেতে পারবে দেশের মানুষের চোখে। শিল্পীর আভিজাত্য অর্জ্জন করতে পারবে। ধনে-জনে-যশে পরিপূর্ণা হয়ে উঠবে।—আলোকের অন্তরটা যেন কিছু শান্ত হয়ে আসছে ধীরে ধীরে।

কিন্তু উৎপলার কাজটাকে তবু সমর্থন করতে পারছে না আলোক। মনে হচ্ছে, আলোক যেন নিজের মনকে ফাঁকি দিতে চাইছে! উৎপলাকে সে 'দেবী' ভাবেনি কোনোদিন—মানবীই ভেবেছিল, এমন কি, সেই

দুর্যোগরাত্রের দুর্ঘটনার পরেও আলোক প্রচুর সহানুভূতি অনুভব করেছে উৎপলার উপর ; আজ মনের সে-ই কোমলতা থাকছে না। নারী সম্বন্ধে কেন ভারতের বিধানকর্তারা এতো কঠোর বিধি-নিষেধ আরোপ করেছিলেন, তা যেন আজ অনুভব হচ্ছে আলোকের ! কিন্তু সেদিন যা প্রয়োজন ছিল, আজ তা নেই ; সে-দিনের শান্ত সমাজগত জীবন আজকার অশান্ত, বিক্ষুব্ধ জীবনের সামাজিকতার সঙ্গে মেলে না কোথাও ; সেদিনের আদর্শ-বাদ আজকার গোঁড়ামী-গোঁয়ার্তুমী—একদেশদর্শী শাস্ত্রকারের প্রলাপ-অপলাপ। এর শেষ কোথায় ? পরিণাম কি ?

ক্লান্তি বোধ হচ্ছে আলোকের ! প্রদীপের গর্ভে তেল না থাকলে শিখার উজ্জ্বলতা যেমন কমে, তেমনি ওর মনের চিন্তাশিখা স্তিমিত হয়ে আসছে। আলোক চোখ বুজলো ; ঠিক ঘুমুলো না, আচ্ছন্নবৎ পড়ে রইল বিছানায়। অনেক, অনেকক্ষণ পড়ে রইল আলোক। বেলা দুটা আড়াইটা হবে ; হঠাৎ ওর মনে হলো, এভাবে এখানে পড়ে পড়ে সময় নষ্ট করার কোন অর্থ হয় না। অকারণে একটা গোটা দিন নষ্ট করলো আলোক ! এর থেকে যদি সারা ভারত ঘুরে দেখবার কাজে বেরিয়ে পড়ে তো কাজ হবে ; কি-ইবা করবে এখানে আর !

উঠে পড়লো আলোক বিছানা ছেড়ে ; গুছুবার মত কিছুই তার নাই, সবই প্রায় ঠিক করা আছে ; জিনিষকটা তবু একবার দেখে নিল। টাকাগুলো গুণলো। মাত্র একশ কুড়ি টাকা পাঁচ আনা আছে। এতে খুব বেশি ঘোরা হবে না। কিন্তু কে যেন বলেছিলেন—"এক কপর্দ্দকও সঙ্গে না লইয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করা চলে—" সমগ্র আর নাই ভারত, খণ্ডিত হয়েছে ; তা হোক, আলোক যতটা পারে দেখবে মাতা ভারতের রূপ। আলোক মন স্থির করে তৈরী হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো

তুষারের জন্য। তুষার ফিরলো পাঁচটার সময়; এসেই বললো—তোর জন্য একটা চাকরী ঠিক করে এলাম।

—সে কি? কোথায়? কি চাকরী?—আলোক শুধুলো।

—একটি মেয়েকে পড়াতে হবে। থাকতে পাবি, খেতে পাবি, আর কুড়ি-পঁচিশ টাকা হাতখরচ।

—কিন্তু ভারত-ভ্রমণে বেরুবো ভাবছি—আলোক হেসে বললো—চাকরী তো নিতে পারবো না তুষার।

—ওসব বাতিক এখন রাখ আলোক—ভারত-ভ্রমণে পরে গেলেও চলবে।—তুষার যেন ধমকই দিচ্ছে আলোককে। স্নেহের ধমকানি!

আলোক হাসলো, বললো—মেয়েটি কতদূর পড়েছে?

—এবার বি, এ, দেবে। বাপের ঐ একমাত্র মেয়ে। ভালো ফ্যামিলী ওরা—তোর কিছু অসুবিধা হবে না!

—অধিক সুবিধা আমার সয় না তুষার—আলোক বললো!

সকালে জামা-কাপড় পরিয়ে তুষার সঙ্গে নিয়ে গেল আলোককে! ঠন্‌ঠনের কাছে একটা কাণা গলি; অত্যন্ত পুরাণো একখানা দোতালা বাড়ী; তারই একতলায় সেকালের মস্ত চৌকী সেগুন কাঠের, তাতে ফরাস পাতা! তার ওদিকে একখানা প্রকাণ্ড টেবিল, খান চার-পাঁচ চেয়ার—তারই একখানায় চশমা চোখে বসে আছেন এক প্রৌঢ় ব্যক্তি—কষ্টিপাথরের পাহাড়ের মত দেখতে লাগছে! সামনে এক গাদা পুঁথি-পত্তর—বই—ফাইল; একগোছা কলম, তিনটে পেন্‌সিল, দুটো ফাউন্টেন পেন—একখানা ইরেজার—গোটা পাঁচ সাত পাথরের ছুড়ির কাগজচাপা

আর একটা মাটির ছোট ভাঁড়! ভাঁড়টা নিতান্ত ছোট, বেশ কার্য্য করা তার গায়ে! ভাঁড়টায় চুরুটের ছাই ঝাড়া হয়।

আলোক সমস্ত ঘরের অবস্থাটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার দেখে নিল। তুষার নমস্কার জানিয়ে আলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল ভদ্রলোকটির। নাম গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়—বাড়ী দু-তিন পুরুষ থেকে কলকাতাতেই। দু-তিন খানা বাড়ী ভাড়া খাটে, আর এই পৈত্রিক ভদ্রাসনখানিতে নিজে থাকেন। অধ্যাপনা করতেন কোন্ এক মফঃস্বল কলেজে, এখন অবসর গ্রহণ করেছেন। তবে এখন নাকি কাজ ওঁর বেড়ে গেছে; উনি একটা বিরাট কাজে লিপ্ত আছেন, সেটি হচ্ছে—'প্রাচীন দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত বাংলার বিভিন্ন জেলায় যত 'শব্দ'-'প্রবচন' আর 'পরিভাষা' চলিত হয়েছে, তার তালিকা করা এবং শব্দকোষ প্রণয়ন করা'; জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত উনি ঐ কাজই করবেন। একটি মাত্র মেয়ে—কুমারী; এবার বি, এ, পরীক্ষা দেবে। তাকে শিক্ষিতা করছেন, সে যাতে বাবাকে সাহায্য করতে পারে, আর বাবার মৃত্যুর পর তাঁর কাজটা শেষ করতে পারে।

আলোক ধীর ভাবে শুনে গেল গুরুদাসবাবুর কথাগুলি; বেশ লাগছে ওর! এ এক আশ্চর্য্য খেয়াল এই মানুষটির, কিন্তু খেয়ালটা প্রশংসনীয়। মদ খেয়ে বা নারীর মোহে পড়ে কত মানুষ খেয়াল পরিতৃপ্ত করে; রেস্ খেলে টাকা উড়িয়ে কেউবা আনন্দ পায়—কেউবা সমাজ-হিতকর প্রতিষ্ঠানের পেছনে ঘুরে নারীর সাহচর্য্য লাভের চেষ্টায় রত থাকে—ইনি কিন্তু ওসবের ধারে-পাশেও যান নি। আপন ঘরে পুঁথি-পত্র নিয়ে বেশ আছেন। আলোকের সঙ্গে আলাপ করতে লাগলেন ভদ্রলোক! তুষারের অন্যত্র কাজ ছিল; সে নমস্কার জানিয়ে উঠলো—বললো আলোককে,

—এ বেলা আমার ওখানে গিয়েই খাবি; ওবেলা থেকে এখানে; কেমন?

—হ্যাঁ—মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো আলোক। তুবার বেরিয়ে গেল!

গুরুদাসবাবু বললেন—নিজে ওকে পড়াবার একেবারে সময় পাই না; অথচ পরীক্ষায় ভাল ফল করাতে হলে পড়ানো দরকার। তা' তুমি শুনলাম, খুব ভালভাবেই পাশ করেছ—লেখা-টেখাও আসে!

আলোক সস্মিতভাবে মাথা নাড়লো। উনি বলতে লাগলেন,

—ছেলের মতন থাক বাবা, বুঝলে, আমার কাজেও একটু সাহায্য করতে হবে; ঐ জন্যই তোমাকে বাড়ীতে রাখতে হচ্ছে! মস্ত বাড়ী, থাকবার লোক নেই! তিনটি তো প্রাণী—মেয়ে, তার মা আর আমি—আর দুটো ঝি-চাকর! তোমাকে নিয়ে হোল ছ-জন।

আলোক আবার মাথা নাড়লো। উনি বললেন আবার,

—তাহলে তোমার ছাত্রীকে ডাকি, সে-ই তোমাকে ঘর দেখিয়ে দেবে।

ডাকতে লাগলেন গুরুদাসবাবু—অনু—অনু—ওরে অনুজু-মা!

—যাই বাবা—দোতালা থেকে সাড়া এলো! সদ্যস্নাতা একটি আঠারো-উনিশ বছরের মেয়ে এসে দাঁড়ালো ঘরে। আলোককে দেখেই চাঞ্চল্য থামিয়ে ধীর হয়ে উঠলো অকস্মাৎ; বললো,

—ডাকছো বাবা?—

—হ্যাঁ—এই তোর মাষ্টার, প্রণাম কর।

অনু হেঁট হয়ে প্রণাম করলো আলোককে। বেশ লম্বা দোহারা গড়নের মেয়ে—মুখ-চোখ-নাকও নিন্দার নয়; রং শ্যামল-কালো। আলোক দু'তিন সেকেণ্ড দেখলো ওকে—নিজের পায়ের দিকে চেয়েছিল অনু।

—তোমার নাম কি?—আলোক একেবারে 'তুমি' বলেই কথা বললো প্রণাম পেয়ে।

—শ্রীমতী অঞ্জনা দেবী—চট্টোপাধ্যায়!—অতি ক্ষীণ হাসলো অ একটু।

—অঞ্জনা! বেশতো নামটি!—শেষের প্রশংসার কথাটা আলোক অতি আস্তে বললেও অঞ্জনা শুনতে পেল। সলজ্জভাবে বাবার কাছ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে! আলোক হঠাৎ বলে উঠলো—

—অত লজ্জার কি আছে! আমি কনে' দেখতে আসিনি—তোমায় পড়াতে এসেছি! পড়তে না পারলে ঠিক তোমার বড়দার মতন কাণ ধরে.....

অঞ্জনা দিব্যি হেসে উঠলো; হেসে উঠলেন গুরুদাসবাবুও। বললেন,

—যা, বড়দাকে তার ঘর দেখিয়ে আন! ওবেলাই এসে যাবে ও এখানে।

অঞ্জনা আর কোনো কথা না বলে এগুলো ভেতর দিকে। আলোক চললো পিছনে! একটু করিডোর মত—যায়গাটায় আলো কম! অঞ্জনা যেতে যেতে বললো—তাহলে বড়দাই হলেন তো?

—হ্যাঁ—যদি ভালভাবে পড়াশুনো করো।

—না হলে?—অঞ্জনা ওর দিকে চেয়েই শুধুলো এবার!

—না হলে কি! হতেই হবে। অমন বাপের মেয়ে মূর্খ থাকতেই পারে না!

—তাহলে আপনিও বড়দা না হয়েই পারেন না।

একটা ঘরের দরজা ঠেলে দিল অঞ্জনা। মস্ত বড় ঘর; কিন্তু বাড়ীর একেবারে পিছনের দিকে! ঘরটার ওদিকে আবার হাত পাঁচ-সাত চৌকোমত যায়গা, তাতে কয়েকটা ফুলের গাছ—বাগান আর কি।

—ঐ বাগানের ফুলে ঠাকুর পূজো করে মা রোজ—অঞ্জনা বললো।

—ও, বেশ! কিন্তু এটা কোন্ দিক্—উত্তর না দক্ষিণ?

—হয়েছে! ও জানতে হলে দিক্‌নির্ণয়-যন্ত্র দরকার বড়দা! তবে ছোট বেলা থেকে দেখছি, সকালের রোদ এই গাছে পড়ে—পূর্ব দিকই হবে। ভয় নাই, হাওয়া পাবেন।—অঞ্জনা হাসলো—এর পাশের ঘরটা মা'র পূজোর ঘর! আর ওদিকে রান্না ঘর। এই দিকে স্নানের ঘর—আসুন…।

—অত সব আর দেখবার দরকার নেই দিদি—মাকে বলো, ওবেলা থেকে খাব! আর তুমি ঘরটা ঝাঁট-পাট দিয়ে রেখো, আমি সন্ধ্যে নাগাদ এসে আস্তানা গাড়বো।—চলো!

আলোক বেরিয়ে এল একেবারে গুরুদাসবাবুর কাছে। পিছন থেকে অঞ্জনা বললো—এক কাপ চা খেয়ে যাবেন বড়দা!

চা খেয়ে বেরিয়ে এল আলোক। বলে এল, সন্ধ্যায় আসবে! অন্ধকার ঐ ঘরটায় আলোক দেবে কিছুদিন কাটিয়ে; মন্দ কি! খাবে-দাবে, পড়বে আর পড়াবে অঞ্জনাকে। ওকে পাশটা করিয়ে দিতে হবে। বেশ লক্ষী মেয়ে অঞ্জনা। ভালই লাগলো আলোকের। কিন্তু সেদিন স্বপ্নে ভৈরবী রূপিণী জননী তাকে কি ঐ ভাবে জীবন কাটাবার জন্য আশ্রমের চাকরী ছাড়তে বলেছিলেন? কি হবে ওতে লাভ আলোকের! আলোক ভাবতে লাগলো ফেরবার পথে। লাভ কিছু নাই—তবে লোকসানও কিছু হচ্ছে না! ঐ প্রায়ান্ধকার ঘরে আলোক নিবে থাকবে কিছুদিন। ও-ও একরকম সাধনা! নিজকে নিষ্ক্রীয় করে রাখা বড় কম সাধনা নয়। তাছাড়া গুরুদাস বাবুর গবেষণার কাজটা সত্যি ভালোকাজ,—মহৎ কাজ বলে মনে হচ্ছে। আলোক তাঁকে সাহায্য করবে! নিজের অধীত বিদ্যার অনুশীলন করবার বিশেষ সুযোগ সে পায় নি;—এখানে হয়তো পাবে; হয়তো কেন, নিশ্চয় পাবে। এই গোপন গলির মধ্যে ঐ ঘরটিতে বসে আলোক ভাষা-ভারতীর আরাধনা করবে কিছুদিন। কেউ জানবে না,

কোনো পরিচিতকে দেখতে হবে না—কোনো প্রতারণার কথা শুনতে হবে না। বেশ থাকবে।

আলোক সন্ধ্যার আগেই গিয়ে উঠলো অঞ্জনাদের বাড়ীতে!

টলিউডেএর ষ্টুডিও থেকে ফিরছিল উৎপলা। সঙ্গে মিঃ সাহা, তাঁরই প্রকাণ্ড গাড়ীখানা। উৎপলার গাড়ী ষ্টুডিওর ওখানে খারাপ হয়ে যাওয়ায় মিঃ সাহার গাড়ীতেই ফিরতে বাধ্য হচ্ছিল সে আজ। উৎপলা অবশ্য অভিনয় করতে যায় নি—এমনি দেখতে গিয়েছিল—মাঝে মধ্যে যায়।

গাড়ী ফিরছে,—পাশাপাশি দুজনে বসে। উৎপলা বললো,

—এখনো ছবি শেষ হোল না, আর কি কাণ্ড করে বসলেন আপনি!

—ভাবনার কি আছে! ডাঃ গুহ তো রয়েছেন!—হাসলেন মিঃ সাহা একটু।

—ডাঃ গুহর সাহায্য নিতে আমার ইচ্ছা নাই—উৎপলা বললো, ওটা আমি পছন্দ করি না।

—তাহলে কি করতে চান?

—বিয়ে দিয়ে ফেলতে চাই ওর।

—বেশ, ছেলে যোগাড় করুন! কিন্তু পাওয়া মুস্কিল!

—আপনিই যোগাড় করে দিন। দায়িত্ব আপনারই!

—আমার!—হাসালেন মিঃ সাহা। —কেন?

—কেন,—তা জানেন আপনি।

হাসলেন মিঃ সাহা আবার। উৎপলা অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করছে যেন! অসহায় বোধ হচ্ছে ওর। একটু থেমে আবার বলল,

—চলুন—ডাঃ গুহ্ কি বলেন, শুনে আসি।

—চলুন!—মিঃ সাহা গাড়ী ঘোরাতে বললেন লেকের দিকে; যেতে যেতে হঠাৎ বললেন,

—অবন্তী নামে কোনো মেয়ের সঙ্গে আপনার আলাপ আছে নাকি?

—আছে! আপনি কি করে জানলেন মিঃ সাহা!

—ঐ ডাঃ গুহই বলছিলেন। তাঁর বাড়ীর কাছেই নাকি থাকেন। আপনার বান্ধবী? আপনার আশ্রমের কর্ম্মীসঙ্ঘের মেম্বার নাকি তিনি?

—না—মেম্বার নয়। কিন্তু ওর সম্বন্ধে এত আগ্রহ কেন আপনার? উৎপলা মৃদু হেসে শুধুলো।

—আমার নয়, ডাঃ গুহর আগ্রহ! তিনি নাকি প্রেমে পড়ে গেছেন ঐ মেয়েটির! আমাকে বলছিলেন যে ওকে পেলে বিয়েও করতে রাজি তিনি।

হাসলেন মিঃ সাহা কথাটা বলতে বলতে। আবার বললেন,

—ডাঃ গুহ বিয়ে অবধি আসতে চান—শুনে তাজ্জব বনে গেলাম। কি এমন মেয়ে সে? দেখাতে পারেন একবার?

—না—উৎপলা নিরস কণ্ঠে বললো—আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর থেকে ক্রমাগত ভাঙন চলছে আমার জীবন-নদীতে; আমি প্রায় কীর্ত্তিনাশা পদ্মা হয়ে উঠ্‌লাম।

—উৎপলার কণ্ঠস্বর কাঁদছে যেন—রেবতীর সর্ব্বনাশ করলাম—নীলিমাকেও দিলাম ভাসিয়ে; আর কেন? যে আশ্রমের জন্য করলাম এত সব, সে আশ্রমও টিকবে বলে মনে হয় না; কৃষ্ণা চলে গেছে পদত্যাগ করে। চতুর্দ্দিকে অন্ধকার দেখছি আমি।

— রেবতীর সর্ব্বনাশ করলেন, একথা ভাবছেন কেন, বলুন তো? ওকে কি রকম 'বুম্' করছি, দেখছেন না! হাজার পনর টাকা ওর নামে পাব্‌লিসিটিতে খরচ করবো আমি—করছি খরচ। কয়েক দিনের মধ্যে

দেখবেন—সারা সহর—সারা বাংলাদেশ ওর নাম জেনে গেছে! তারপর ওর দাম হবে লক্ষ টাকা প্রত্যেক ছবিতে। টাকার কুমীর বনে যাবে দু'বছরে।

—তাতে ওর হারানো রত্ন ফিরে আসবে না।

—ওর রত্ন অনেক আগেই হারিয়েছিল মিস্ উৎপলা দেবি! আর সে নিজে তো মোটে দুঃখিত নয়···আপনি কেন এত ভাবছেন?

—সে দুঃখিত হবার মত বয়সে বা অভিজ্ঞতায় এখনো পৌঁছায় নি!

উৎপলার কণ্ঠস্বরে যথেষ্ট তিক্ততা। লক্ষ্য করে মিঃ সাহা বললেন,

—অত যদি দরদ আপনার তাহলে দিলেন কেন? এ রকম হয়েই থাকে।

গাড়ীখানা রুখতে বললেন মিঃ সাহা ড্রাইভারকে। গাড়ী থেমে গেল একটা আর্ত্তনাদ করে। উৎপলা চেয়ে দেখলো—জনৈক যুবক সিগারেট হাতে হাওয়া খেতে যাচ্ছিল লেকের দিকে—তাকে দেখেই মিঃ সাহা গাড়ী থামাতে বললেন এবং গাড়ী থামার সঙ্গে সঙ্গে ডাক দিলেন,

—হা-ল্লো—মিঃ মুকুর্জি···অনেকদিন দেখা নাই যে?

—নমস্কার মিঃ সাহা!—এগিয়ে এল যুবকটি—উৎপলার পানে চাইল একবার, বললো—দেখা করবার সময় পাইনি মিঃ সাহা; কিছুদিন একটা চাকরী নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম, উপস্থিত সেটা ছেড়ে দিয়ে বেঁচেছি! এখন আদেশ করুন···হাসলো।

—এখন তাহলে করছেন কি?—মিঃ সাহা জিজ্ঞাসা করলেন!—হাতে কিছু আছে?

—আছে একটা—হাসলো যুবক—মিসেস সাহার কাছেই কি বলবো?

উৎপলাকে ও সাহার পত্নী ভেবেছে নাকি! লোকটা তো আচ্ছা নির্বোধ! উৎপলা অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে মাথা নামালো। মিঃ সাহাই বললেন,

আপনি ভুল করছেন মিঃ মুকুর্জি—উনি আমার বান্ধবী—নাম মিস্ উৎপলা…

—ওহো, স্যরি—নমস্কার…আচ্ছা, আমি আপনার বাড়ীতেই যাব কাল সকালে। এ ছবিটা কতদূর এগুলো আপনার?

—এটা শেষ হব-হব প্রায়! নেক্স্‌টটার জন্যই ভাল একখানা মুখ খুঁজছি।

—এ ছবির যে নায়িকা—তাকে দিয়ে নেক্স্‌টটা করাবেন না নাকি?

—না—তার একটু অসুবিধা হচ্ছে—হাসলেন মিঃ সাহা।

—ওঃ, বুঝেছি! আছে একখানা ভালো মুখ—কাল যাব সকালে!

—আসবেন—নমস্কার।—গাড়ী আবার চলতে লাগলো। উৎপলা কাঠের মত কঠোর হয়ে বসে আছে। মিঃ সাহা আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়লেন। উৎপলার পানে বার দু-তিন অপাঙ্গে তাকিয়ে বললেন,

—শুনুন উৎপলা দেবি,—ভালোকে আমি কোনোদিন মন্দ করতে যাই না। যারা সত্যি মা-বোন-মেয়ে, তাদের উপর শ্রদ্ধা আমার কিছু কম নেই। আমিও মানুষ, মাঝে-মধ্যে মাতাল হই—কিন্তু মাতলামীটাই তো আমার সত্যি স্বরূপ নয়—ওর বিরাট ফাঁকে ফাঁকে স্ত্রী-কন্যা-ভগিনীর পবিত্রতা আমিও দেখতে চাই। তার জন্যই আমার ছবির গল্পে আমি সব সময় নৈতিক আদর্শটা রক্ষা করে চলি—দেখেছেন বোধ হয়!—তুষারকে চেনেন নিশ্চয়। ওকে কেন ভালোবাসি জানেন? অতিমাত্রায় শয়তান ও, কিন্তু ওর মধ্যে একটা মহৎ মানুষ আছে, মাঝে মাঝে দেখা দেয়। সেই মহৎ মানুষটি আমাকে সাবধান করে সময় সময়। মা-বোন-স্ত্রী-কন্যা যারা, তুষার তাদেরকে আমার সামনে থেকে সরিয়ে দেয়—আমার অপ্রীতিভাজন হবার ভয় রাখে না। বহু সময় ওর উপর চটে যাই—ভাবি, তাড়িয়ে দেব—

কিন্তু আবার মানুষ হলেই বুঝতে পারি, ও আমাকে ভয়ানক একটা পাপ থেকে বাঁচিয়ে দিল!

—মনুষ্যত্ব আপনারও জাগে তাহলে মাঝে-মধ্যে!—উৎপলার হাসিটা ব্যঙ্গের হাসি!

—মানুষ মাত্রেরই জাগে উৎপলা দেবি; মানুষের স্বভাবকে অতিক্রম করে তো আমি যেতে পারি নি! তাহলে তো সাধকই হয়ে উঠতাম। ব্যঙ্গটাকে ব্যর্থ করে দিলেন মিঃ সাহা। উৎপলা আর কিছুই বললো না। গাড়ীও পৌঁছে গেল ডাঃ গুহের বাড়ী।

ডাঃ গুহ বাড়ী নেই, কোথায় বেরিয়েছে! মিঃ সাহা বললেন,

—আচ্ছা, পরে হবে কথা—চলুন; আপনার বন্ধুর বাড়ীটি কোথায়?

উৎপলা বুঝতে পারলো, অবন্তীকে দেখবার জন্য মিঃ সাহা অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। হাসি পাচ্ছে ওর; অবন্তী রেবতী নয়; সে ঘরপোড়া গরু—বয়স্কা, শিক্ষিতা, এবং আত্মরক্ষা করতে সম্পূর্ণ সক্ষমা। তবু ওর ইচ্ছে করছে না ওদের দেখা করিয়ে দিতে।

কিন্তু মিঃ সাহা ভাগ্যবান ব্যক্তি। রাস্তার ওপাশেই অবন্তীর বাড়ী। সে লনে চা খেয়ে বসেছিল ওখানেই। উৎপলাকে দেখে বেরিয়ে এসে বলল,

—পলাদি! এ পাড়ায় হঠাৎ?

—হ্যাঁ—ইনি মিঃ সাহা, মন্দার-প্রডাক্‌সন্সের মালিক, আর এই অবন্তী।

—নমো-স্কার—টানা নমস্কার জানালেন মিঃ সাহা অবন্তীকে। অবন্তীও প্রতিনমস্কার করলো; কিন্তু আর কিছুই সে বলছে না। মিঃ সাহা বললেন,

—আলাপে খুবই সুখী হলাম। ডাঃ গুহর কাছে শুনেছি আপনার নাম। এখানে কি আপনি একলাই থাকেন ?

—না—আমার মা-ও থাকেন। তিনি আছেন বাড়ীতে।—অবন্তী "মা" কথাটায় জোর দিল।

আলাপটা একটু জমাতে পারলে ভাল হোত, কিন্তু অবন্তী জমাচ্ছে না; উৎপলাও কোনোরকম সাহায্য করছে না। মিঃ সাহা হঠাৎ বলে ফেল্‌লেন,

—একদিন আসুন-না আমার ওখানে! নতুন যে গল্পটা নিচ্ছি, তার সম্বন্ধে আলোচনা করা যাবে! বর্ত্তমানে সোস্যাল প্রব্‌লেম্—ইকনমিক্ ক্রাইসিস্—পলিটিকেল সিচুয়েশ্যান্—চমৎকার ফুটানো হয়েছে গল্পটায়; তার সঙ্গে সুন্দর একটি প্রেমের গল্প—হাসি, রঙ্গ-ব্যঙ্গ-নাচ-গানও যথেষ্ট দেওয়া হয়েছে এণ্টারটেইনমেণ্টের জন্যে!

—আমার ও বিষয়ে কোনো রকম অভিজ্ঞতা নেই মিঃ সাহা—সিনেমা আমি কম দেখি।

—সে-কি!—বিস্মিত হয়ে বললেন মিঃ সাহা—ডাঃ গুহ বলছিলেন যে আপনি নাকি চব্বিশ ঘণ্টা পড়াশুনো নিয়েই থাকেন।

—হ্যাঁ, পড়ি কিছু কিছু; কিন্তু সে গল্পের বই নয়; গীতা-চণ্ডী, উপনিষদ, সদ্‌গুরুর সঙ্গ—অভয়ের কথা।

—আই সি!—মিঃ সাহা ইংরাজিতে বিস্ময় বাড়িয়ে দিলেন যেন। এর পর আর কথা চালানো কঠিন, কিন্তু তিনি কথা চালাতেই চান। তাই একটু ভেবে বললেন,

—দেশের ইকনমিক্ বা সোস্যাল্ প্রব্লেম সম্বন্ধে আপনাদের মত শিক্ষিতা মেয়েদের চিন্তা যথেষ্ট মূল্যবান হতে পারে—তাছাড়া নারী-সমস্যাও তো আপনাদের চিন্তার বিষয় প্রধানতঃ। সে-সব কি একেবারেই করেন না ?

—না! ওসব উৎপলাদি করুন—হাসলো অবন্তী একটু; বললো, —দেখুন, যার যেখানে অধিকার। আমি ছোটবেলায় পল্লীতে মানুষ, মিটিং, বক্তৃতা, মেলামেশা বিশেষ করতে পারি না—তাছাড়া, এখন যা-যুগ পড়েছে, তাতে ওসব করে কিছু হয় বলেও আমার বিশ্বাস নেই; হ্যাঁ, নিজের কিছু উপকার হয়—মানে—অর্থলাভ হয়—পদলাভ হয়—প্রতিষ্ঠা হয়!

—কেন আপনি একথা বলছেন? মিঃ সাহা প্রশ্ন করলেন—এতে যে আপনার বান্ধবী উৎপলা দেবীকে আক্রমণ করা হচ্ছে—হাসলেন।

—না, আক্রমণ কাউকেই করছি না আমি; তবে ধান ভানতে শিবের গীত গাওয়া আমি পছন্দ করি না। গত পরশুকার কাগজে দেখলাম—'জাগ্রত-এশিয়া-সংস্কৃতি-নারী-মহামণ্ডলী' নামে একটা প্রতিষ্ঠান গড়া হয়েছে; তার মিটিংএ কয়েকজন নামকরা মহিলা বক্তৃতা দিয়েছেন—সবই ছাপা হয়েছে; পড়ে হাসি পেল—সবাই বক্তৃতা দিয়েছেন,—"নারীর হাতেই সংস্কৃতি রক্ষার ভার; নারীই মানুষের সভ্যতা গড়েছে—রক্ষা করছে—রচনা করছে—অতএব"—হাসলো অবন্তী—"এসো আমরা কুটির-শিল্প—চরকা-কাটা থেকে শেলাই-বোনা, জামা-সেমিজ তৈরী করা—গ্রামে গ্রামে গিয়ে শিক্ষা দান—ম্যালেরিয়া নিবারণ থেকে মাথাধরার জন্য এস্‌পিরিণ খাওয়া পর্য্যন্ত শিখিয়ে বেড়াই।" —অত বড় একটা গালভরা নামের কার্য্যতালিকা দেখে মানুষ বীতশ্রদ্ধ না হয়ে পারে না—সর্ব্বত্রই ঐ; বড় বড় নামের পিছনে ফাঁকা কাজের বুকনি!

—ওতে কিছু উপকার হবে না, বলতে চান?—মিঃ সাহা বললেন!

—হবে—হোক—কিন্তু সেটা আলাদা কাজ! সংস্কৃতির সঙ্গে ওর যোগটা কোথায়? ওটা ত ডাল-ভাত যোগাড়ের কাজ মশাই!

—ডাল-ভাতের যোগাড় আগে করা দরকার মিস্…

—বেশতো—সেইটা বল্লেই হয়। "জাগ্রত-এশিয়া-সংস্কৃতি" বলে ধাপ্পা দেবার কি দরকার ?—আপনি "মন্দার প্রডাক্‌সনস্‌" চালান—ছবি-তোলার কাজ, বেশ—কিন্তু আপনি যদি ওটার নাম দেন "মন্দার বিশ্ববিদ্যালয়" 'এখানে সিনেমা আর্টিষ্টদের ট্রেণিং দেওয়া হয়',—তাহলে কি রকম শোনায় ?

মিঃ সাহা চুপ করে রইলেন। উৎপলা এতক্ষণে কথা বললো,

—বড় নাম দিয়ে রাখলে কাজের অনেক সুবিধা হয় অবন্তী !

—হ্যাঁ—ঐ সুবিধাবাদের কথাই তো বলছিলাম পলাদি—সবাই সুবিধাবাদী !

—আমিও ?—উৎপলা হেসে শুধুলো।

—হ্যাঁ—তুমিও !—অবন্তীও হাসলো।

—চলুন মিঃ সাহা—ওর সঙ্গে আর কথা নয়—বলে মুখের হাসিটা বজায় রেখেই উৎপলা টান দিল মিঃ সাহার হাতে ; গাড়ীতে গিয়ে উঠলো।

—রাগ কোরো না পলাদি—কথাটা রূঢ় হলেও সত্যি—অবন্তী বললো।

—না—রাগ করিনি, এতো স্পষ্ট সত্যি বলতে শিখলি কোথায় তুই অবন্তী ?

—আলোকদার কাছে—অবন্তী উত্তর দিল।

—সে কি এসেছিল ?

—হ্যাঁ, সে সারাদিন সূর্য্যের আলোতে ছিল—রাত্রে তারার আলোতে থাকবে।

অবন্তীর চোখে কী ও ? উৎপলা চাইলো। মিঃ সাহাও চেয়ে দেখলেন জ্যোতির্ম্ময়ী সীতা-সাবিত্রী-অরুন্ধতীর দ্যুতি যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে ! পতীতা অবন্তী—পাতকিনী অবন্তী—পিশাচিনী অবন্তী কোথায় ? এ যেন মহাকবির সেই, "নিমেষে ধৌত নির্ম্মল রূপে বাহিরিয়া এলো কুমারী নারী—"

মিঃ সাহা সভয়ে এসে গাড়ীতে উঠলেন। ওখান থেকেই বললেন, —নমস্কার-নমস্কার!

—নমস্কার!—অবন্তী বাড়ী-ঢুকলো গিয়ে। মিঃ সাহা গাড়ী চালাবার আদেশ দিয়ে বললেন—ভালোবাসবার মত মেয়ে—সত্যি! ডাঃ গুহকে দোষ দেওয়া যায় না।

—আপনার কিন্তু আর বিয়ের বয়স নেই। বাড়ীতে ছেলেমেয়েও আছে শুনেছি!

—আছে, মন্দার আমার ছেলেরই নাম। কিন্তু আমার বিয়ের কথা আমি ভাবছি না।

—কার কথা ভাবছেন?

—ডাঃ গুহর! এ মেয়েকে বিয়ে করলে ওঁর 'প্রফেসন' তিনি আর চালাতে পারবেন না।

—কেন? উৎপলা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করলো।

—এ মেয়ে সতীর বাচ্চা! এখানে আমার শ্রদ্ধা অগাধ উৎপলা দেবি! কিন্তু আলোকদা কে? নামটা যেন শোনা-শোনা মনে হচ্ছে!

—যে একদিন আপনাকে গল্প লিখবে না বলে জবাব দিয়ে এসেছিল।

—ও হ্যাঁ—তুষার এনেছিল ছেলেটিকে; সে কোথায় এখন?

—জানি না—উৎপলার কণ্ঠ অকস্মাৎ কেমন নিরস-উদাস হয়ে উঠলো।

—ওর কে হয়?

—ও ভালোবাসে তাকে!

—বিয়ে হচ্ছে না কেন?

—কারণ—আলোকের সাহায্যে পথ দেখা যায়—তাকে ধরে লাঠির মত ব্যবহার করা চলে না।

—তাহলে ওর 'ইউটিলিটি' কি? প্রয়োজনীয়তা কোথায়?

—আপনার কাছে আপনার চোখের প্রয়োজনীয়তা যতখানি।

মিঃ সাহা চুপ করলেন! গাড়ী এগিয়ে চলছে চৌরঙ্গীর উপর। উৎপলা চোখ বুজে আছে।

* * *

—বেশ কথাটি—"দিনে সূর্য্যের আলোতে ছিল, রাত্রে তারার আলোতে থাকবে" আমার আগামী বইটায় এই সংলাপটা ব্যবহার করতে হবে, কিন্তু ও 'চাঁদের আলোতে' বললো না কেন? সূর্য্যের পর চাঁদের কথাই তো আসে?—মিঃ সাহা শুধুলেন।

—না—উৎপলা চোখ খুলে বললো—চাঁদ খুব কাছে থাকে, আর চাঁদের আলোটা তার নিজের নয়, তাছাড়া—উৎপলা তাকালো মিঃ সাহার পানে—তাছাড়া চাঁদ বিলাসীর বৈদ্যুতিক বাতি—তারার প্রদীপের পবিত্রতা ও কোথায় পাবে? কলঙ্কী চাঁদ!

—চমৎকার কথাগুলো কিন্তু! এটাও আমার বইতে লাগাতে হবে! মিঃ সাহা হাসলেন।

উৎপলা চুপ করে রইল। ভাবছে! অবন্তী পায় আলোকের সান্নিধ্য! সত্যি পায়—প্রত্যুষে সূর্য্যের আলো আলোকরূপে ওর বাড়ীর দরজায় নামে। রাত্রে তারার আলোতে চেয়ে থাকে জানালাপথে ওর মুখের পানে। উৎপলার বাড়ীর শ-খানেক বিজলীবাতির আলোতে কেমন করে আসবে সে! দিনেও তো কৃত্রিম ঝরণা, পাহাড় অর্কিড-হাউসের আওতায় ঢেকে রেখেছে সে তার বাড়ী! হ্যাঁ—আলোক আসতো যদি বিকাশ না আসতো—না আসতেন এই সাহা মহাশয়—না আসতো রেবতীর জীবনে এই বিপর্য্যয়!……উৎপলার মাথাটা ভারী হয়ে উঠছে ক্রমশঃ—আলো, আরো আলো—Light, more light! তমসো মা জ্যোতির্গময়;

অসতো মা……নাঃ—উৎপলা ওসব উচ্চারণ করবার অধিকারিণী নয়; নয়-নয়-নয়!

মিঃ সাহা হঠাৎ বললেন,

—দেখুন, ঐ যে মেয়েটিকে দেখে এলাম—ওরা আলাদা থাকের। আপনি বলছিলেন যে আপনার জীবনে ভাঙন ধরেছে! ভাঙন ধরেছে সবেতেই—গোটা সমাজটাতেই, নইলে স্বামী স্ত্রীকে নিয়ে আসে অভিনয় করাবার জন্য, বাবা আনে মেয়েকে, ভাই আনে বোনকে……কিন্তু ভয় নাই; ঐ যেমন দেখে এলাম, অমনি গোটাকয়েক থাকলেই সমাজ বেঁচে যাবে। ডাঃ গুহ বলছিলেন, উনি নাকি বাগদত্ত বরের জন্য তপস্যা করেন?

—হ্যাঁ—উৎপলা আস্তে বললো। মিঃ সাহা যে অবন্তীর সম্বন্ধে অত্যন্ত উচ্চ ধারণা করেছেন, এটা সে অনেক আগেই বুঝেছে। সে ধারণা ভাঙতে চাইল না।

—ওরাই সতীর জাত্; ওদের রক্তে আগুন,—বিষ,—আবার অমৃত! ডাক্তার গুহর কথা বিশ্বাস করি নি; আজ করলাম। ওদের আমরা ঘাঁটাতে যাই না—বুঝলেন,—মানুষের মনোজগতের যে শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা—ওদের পায়ে আমরা সব সময়ই তা নিবেদন করি!

—শুনে সুখী হলাম মিঃ সাহা!—উৎপলা ধীরে ধীরে বললো। কিন্তু ওর নিজের উপর অশ্রদ্ধাটা বিপুল হয়ে উঠছে। যে উচ্চে উঠেছিল উৎপলা, সেখান থেকে কত নীচে তার পতন হয়েছে, ভাবতে ভয় করে! বিকাশের সংসর্গই এর কারণ; বিকাশ না এলে উৎপলাকে কেউ নামাতে পারতো না। বিকাশের কাছে উৎপলা বহুদিন পূর্ব্বেই প্রকাশিত হয়ে গেছে। পুরুষ বিকাশ নারী উৎপলার প্রতি কোনো শ্রদ্ধা পোষণ করে না আর! কেন করবে? উৎপলা নিজের দুর্ব্বলতার জন্যই রেবতীকে এখানে দেওয়ার প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করতে পারে নি—বিকাশ প্রায় জোর করেই

তাকে দিয়ে ওটা করিয়ে নিল—তারপর গলাজল, এখন ডুবজলে পড়েছে এসে উৎপলা—ডুবতে হবে—অন্ধকার!—Light, more Light! আলো, আরো আলো।

—উঃ!—আর্ত্তনাদ করে উঠলো উৎপলা। মিঃ সাহা সিগারেট টানছিলেন। হঠাৎ উৎপলার অব্যক্ত শব্দটা শুনে তাকালেন তার দিকে; বললেন—কি হোল আপনার? মাথাব্যথা নাকি?

—না—ছারপোকা! উৎপলা মৃদু হাসলো! আশ্চর্য্য তার মনের শক্তি! এমন অবস্থাতেও সে অনায়াসে আত্মগোপন করতে পারে। যেন অভ্যাস হয়ে গেছে এই লুকোচুরি খেলা!

—এই ড্রাইভার, কাল গাড়ীটো আচ্ছাসে ধো দেও—গরম পানি লাগানা।

—জি আচ্ছা!—ড্রাইভার জবাব দিল প্রভুকে। উৎপলা বললো,

—আমাকে আশ্রমের গেটেই নামিয়ে দিন মিঃ সাহা—ওখানে একটু কাজ রয়েছে!

—সন্ধ্যা হয়ে গেছে; এরপর আপনি বাড়ী ফিরবেন কি করে?

—ট্যাক্সি করে চলে যাব।—এই, রোখো!—গাড়ী থামাতে বললো উৎপলা।

আশ্রমের গেট ছাড়িয়ে যাচ্ছিল গাড়ী। নেমে উৎপলা নমস্কার জানালো।

মিঃ সাহার সান্নিধ্যটা খারাপ লাগছিল নাকি উৎপলার? তারই জন্য নেমে গেল অত তাড়াতাড়ি?—না, নিজের অন্তরের রূপটাকে আজ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে উৎপলা; পাছে আর কেউ দেখতে পায়, এই ভয়ে নেমে গেল! গাড়ী ঘুরিয়ে মিঃ সাহা চলে গেলেন। আশ্রম পর্য্যন্ত আসবার আকাঙ্ক্ষা উনি জানালেন না,—কারণ, জানেন,—সন্ধ্যার পর

ওখানে প্রবেশ নিষেধ পুরুষের। জানেন—ওগুলো আইন। জনসাধারণকে ফাঁকি দেবার জন্য বড় বড় অক্ষরে লিখে দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখলেই সাতখুন মাপ। আইন আছে বলেই তো এতো ফাঁকি চলে পৃথিবীতে—চোর-ছ্যাচড় থেকে খুনী পর্য্যন্ত আইনের ফাঁকে কেমন গলে যাচ্ছে—মিঃ সাহাও গলে আসছেন এতকাল আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে—ভাবতে ভাবতে ফিরেই গেলেন মিঃ সাহা।

উৎপলা পিছন ফিরে দেখলো, মিঃ সাহার গাড়ী চলে গেল। আস্তে এসে গেটে দাঁড়ালো আশ্রমের। দারয়ান আগেই টের পেয়েছিল উৎপলা নামছে রাস্তায়। নিঃশব্দে সে গেট খুলে দিয়েছে—নীরবে সেলাম জানালো উৎপলাকে ; মাথাটা একটু নুইয়ে উৎপলা চলে এল ভেতরে। খানিকটা উঠোন—তারপর প্রকাণ্ড বাড়ীটা—তিনতলা।

আলোক যাওয়ার পর তার যায়গায় অন্য লোক নিযুক্ত হয়েছেন, তার নাম সুহৃৎ রায়—বয়স চুয়ান্ন বছর ; দাঁতগুলি সবই বাঁধানো—বিপত্নীক। ভদ্রলোক। মিঃ ম্যাক্কু যোগাড় করে দিয়েছেন লোকটিকে। বেশ কর্ম্মঠ লোক—বয়সের তুলনায় বেশি কর্ম্মঠ! তিনিই কাজকর্ম্ম করেন এবং আলোক যে-ঘরে থাকতো সেই ঘরটাতেই থাকেন। উৎপলা এসময় আসবে, তিনি জানতেন না। তাছাড়া আজ রবিবার, ছুটির দিন। উৎপলা এসেই আস্তে ডাক দিল—সুহৃৎ বাবু! সুহৃদ বাবু আছেন?—সাড়া পাওয়া গেল না।

অত বড় বাড়ীটার নীচে কেউ নাই ; আশ্রমের মেয়েরা নীচে খেলা করে বিকালে, এখন উঠে গিয়ে পড়তে বসেছে। নীচে অপর্ণার ঘর ওদিকে ; উৎপলা চেয়ে দেখলো, অপর্ণার ঘরে আলো জ্বলছে—দরজা বন্ধ। উৎপলা আস্তে এগিয়ে গেল ঐদিক পানে। কোনো দিন যায় না—আজ বিধাতার ইচ্ছা, আর উৎপলার মনের অস্বস্তি তাকে যাওয়ালো! বিলাতী

লতার জাল্‌তি দিয়ে সামনেটা ঢাকা অপর্ণার ঘরের। ওরই বাইরে সাধারণের ব্যবহার্য্য জলকল, চৌবাচ্চা, ডাষ্টবীন—যায়গাটা বড্ড অপরিষ্কার। কিন্তু উৎপলা ওসব গ্রাহ্য না করে এগিয়ে এল—ছোট একতালা ঘর, ঝি-চাকরের ব্যবহার্য্য ; দরজার ফাটলে আলো আসছিল ! উৎপলা আস্তে গিয়ে একটা চোখ দিল সেই ফাঁকে। ভেতরে সুহৃৎবাবু—অপর্ণা !—চমকে উঠলো উৎপলা, স্তম্ভিত হয়ে গেল ! মানুষ কি সর্ব্বত্র জানোয়ার হয়ে গেছে, কিম্বা তারও বেশী ? না, মানুষ ঠিক মানুষই আছে ; মানুষের রাজ্যে কতকগুলো জানোয়ার হানা দিয়েছে—তাদের সংখ্যা বড্ড বেশী ! যেমন গিয়েছিল, তার থেকে আরো আস্তে পা টিপে ফিরে এল উৎপলা, যেন সে ভয়ানক একটা অন্যায় কাজ করতে গিয়েছিল ! একেবারে বড় বাড়ীটার বারান্দায় উঠে একখানা চেয়ারে বসলো উৎপলা—হাঁফাচ্ছে !

—দারয়ান !—দারয়ান !—ডাক দিল।

—হুজুর !—দারয়ান এসে দাঁড়ালো !

—সুহৃদ্‌বাবুকে ডাক—চেঁচিয়ে ডাক—কোথায় গেলেন তিনি সন্ধ্যাবেলা ?

—সুহৃদ্‌বাবু···সু—হৃদ্—বা—বু···দারয়ান হাঁক দিচ্ছে ! লতার জাল্‌তির ওপাশে দেখা যাচ্ছে সুহৃদ্‌বাবুকে। ঘরটার পিছন দিক দিয়ে ঘুরে তিনি যেন বাগান থেকে আসছেন এমন ভাবে আসতে আসতে বললেন,—যাই !

উৎপলা লক্ষ্য রেখেছে। দেখলো, সুহৃদ্‌বাবু কোন্‌দিক দিয়ে এলেন !

—কোথায় গিয়েছিলেন সুহৃদ্‌বাবু ?

—এই—ওদিকে একটু বেড়াচ্ছিলাম !—বেশ সপ্রতিভভাবেই বললেন সুহৃদ্ রায়।

—ওঃ, আচ্ছা! কালই একটা জরুরী মিটিং করা দরকার। এখুনি নোটিশ লিখুন, কাল সকাল দশটার মধ্যে যেন প্রত্যেক মেম্বারের বাড়ী বাড়ী নোটিশ পৌঁছে দেওয়া হয়।

—কি করে হবে বলুন!—ডাকপিওন তো আমার ঠাকুরদা নয়!

—চুপ করুন সুহৃদবাবু—ধমকে উঠলো উৎপলা—ডাকপিওনের কথা আমি বলছি না, লোক দিয়ে পৌঁছাতে হবে—হবেই!

সুহৃদবাবু আগেই বিপন্ন বোধ করছিলেন, এখন ধমক খেয়ে আস্তে বললেন,

—অত লোক কোথায়? একটা বিয়ারা, সে আসবে দশটার পর।

—আপনি যাবেন—যাঁদের ফোন আছে—ফোনে বলে দেবেন—

—ফোন তো প্রায় সকলেরই আছে—সুহৃৎ বাবু বললেন সাহস করে।

—বেশ, সকলকেই বলে দিন—নোটিশ তাঁরা আসার পর হাতে হাতে দিলেই হবে!

উৎপলা মিটিংএর সময় বললো পরদিন বিকাল পাঁচটা—য়্যাজেণ্ডা—'আশ্রম সম্বন্ধে বিশেষ পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ায় বিশেষ পরামর্শ এবং কৃষ্ণা দেবীর পদত্যাগপত্র গ্রহণ সম্বন্ধে আলোচনা!'—উৎপলা উঠোনে নামলো। দারয়ানকে ট্যাক্সি ডাকতে বলে সুহৃৎ রায়কে শুধুলো—কৃষ্ণার কোনো চিঠি আসে নি?

—আজ্ঞে না! উনি তো বলেই গেছেন যে আসবেন না!

উৎপলা গেটের দিকে এগুলো। সুহৃৎ রায় ওকে দেখছে। উৎপলা চলে এল গেটে; আশ্রমের আবহাওটাও ওর বিষাক্ত বোধ হচ্ছে! ট্যাক্সি তখনো আসে নি। দেখলো, অপর্ণা চুপটি করে দাড়িয়ে আছে গেটে; কোলে ছেলেটা। উৎপলা কঠোর দৃষ্টি দিয়ে যেন বিদ্ধ করতে চায় ওকে। বললো—

মাত্র তিনচার মাস তোর দাদাবাবু গেছে অপর্ণা, এরই মধ্যে তুই,…উঃ! চলে যা—বেরিয়ে যা আমার সামনে থেকে!

উৎপলা পাশ কেটে চলে যাচ্ছে, যেন ছুঁয়ে ফেলবে অপর্ণা তাকে। কিন্তু অপর্ণা ছুঁয়েই ফেললো, একেবারে উৎপলার পায়ের উপর প্রায় মাথা ঠুকিয়ে বসে পড়লো সে; কাঁদছে। বললো—আমার কিছু দুষ নাই দিদিমণি, আমি কিছু জানি না। বাবু বলছিলেন, উনার দেশে জমিদারী আছে, তেজারতি আছে, আমাকে নিয়ে যাবে—রাণীর মতন রাখবে—আমি বিশ্বেস করি নাই দিদিমণি। আমি গরীব দুখী মেয়ে, আমাকে ক্ষিমা করো দিদিমণি—আমি…

—যাঃ—চলে যা এখান থেকে!

উৎপলা পা সরিয়ে নিয়ে চলে গেল। জন্তু—জানোয়ার—জঘন্য জীব! ট্যাক্সিতে উঠলো গিয়ে উৎপলা; বললো—চলো সামনে। নিজের নিদারুণ অশান্তিকে কোন্ আশ্রয়ে এনে আজ শান্তি দেবে! এই কি ছিল তার আশ্রম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য? সে একটা নারী-ব্যবসায়িনী হয়ে উঠেছে,—ধিক্!—উৎপলা নিজের কপালে হাতের চেটো দিয়ে আঘাত করলো। নিতান্ত নাটকীয়, কিন্তু মানুষ যখন তার মহত্তম আদর্শের মৃত্যু দেখে—অপমৃত্যু দেখে,—তখন নাটকের নায়ক হতে সে বাধ্য হয়। আজ উৎপলার মহৎ আদর্শের শুধু মৃত্যুই ঘটে নি—তার মহান্ আদর্শ প্রেতত্ব লাভ করেছে; অগ্নিসংস্কার হোল না সেই প্রেতের; তার কদর্য্য নৃত্য দেখে শিউরে উঠছে উৎপলা!

কোথায় যাবে—কার কাছে গিয়ে কিঞ্চিৎ জুড়োতে পারে উৎপলা? মা আছে বাড়ীতে! উৎপলার মা—পুতনা—স্তনে বিষ দিয়ে মানুষ করেছে উৎপলাকে,—বিষকন্যা করে তুলেছে। যেদিকে চায় উৎপলা, সব বিষাক্ত হয়ে যায়—বাতাস পর্য্যন্ত! উৎপলার মা তো অবন্তীর জননী

নয়—অমৃতময়ী ধাত্রী নয়—আনন্দময়ী শিবা নয়—উৎপলার মা রাক্ষসী!

'মা' শব্দটা কলঙ্কিত হচ্ছে উৎপলার মুখে যেন। 'মা' পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শব্দ—একাক্ষর অমোঘ মন্ত্র—তৃপ্তির, মুক্তির, মোক্ষের! অভাগী উৎপলা সেই মহামন্ত্র উচ্চারণ করবার অধিকার হারিয়েছে!···উঃ উঃ!

সারা প্রাণ হাহাকার করে কেঁদে উঠছে ওর। ড্রাইভার শুধোলো,

—কিধার যায়েগা হুজুর?

—চলো গঙ্গার কিনারা দিয়ে! একটু বেড়াবো!—উৎপলা বললো।

ওর গলার স্বর ক্রন্দন-কম্পিত, শিখ-ড্রাইভার একবার মুখ ঘুরিয়ে চাইল। মাথা নুয়ে আছে উৎপলার। অনন্ত নক্ষত্র-খচিত আকাশ গাড়ীটাকে দেখছে।

অবন্তীর জীবনটা নিজের সঙ্গে তুলনা করছে উৎপলা! ওর জীবনে সবই ভালো,—ভালো ওর জননী—ভালো ওর ভালোবাসার ধন আলোক, ভালো ওর স্বামীরূপে অধিষ্ঠিত সিদ্ধেশ্বর। তিন দিক থেকে তিনটে ভালো শক্তি ওকে উর্দ্ধ-গগনে তুলে ধরছে। ও কেন ভালো হবে না? উৎপলার যে কেউ নাই, কিছু নাই—কোনো সম্বলই নাই! যে-কদিন ছিল আলোক,—উৎপলা ভাল ছিল—ভাল হয়ে উঠছিল!—তারপর ছেয়ে গেছে অন্ধকার। জীবনের অন্ধকার মরুভূমে উৎপলার প্রাণস্বত্বা আছড়ে পড়তে চাইছে একফোঁটা আলোর জন্য—অন্তহীন বালুকারাশীর উষ্ণতা আছে—আলোর কণা নাই। ভাগীরথীর উচ্ছল স্রোতের পানে চাইলো উৎপলা; শত শতাব্দির সাংস্কৃতিক মহিমায় আজো উজ্জ্বল পবিত্রসলিলা গঙ্গা; লক্ষ লক্ষ নরনারীর অন্তরে আজো শান্তির অমৃত সিঞ্চন করেন—কিন্তু উৎপলা গঙ্গাকে কোনদিন সে-ভাবে দেখে নি! নদী—একটা নদী মাত্র! পৌত্তলিকতার দেবত্বে ওর বিশ্বাস নাই! বিশ্বাস থাকলে ভাল

হোত, একটা ডুব দিয়ে হয়তো আরাম পেত উৎপলা—কিন্তু, কতক্ষণ আর ঘুরবে! উৎপলা বাড়ী ফিরতে আদেশ দিল ট্যাক্সিকে।

রাত প্রায় দশটার কাছাকাছি; উৎপলা বাড়ী এসে পৌঁছালো। ওর মা চিন্তিত ছিল—কারণ উৎপলার নিজের গাড়ী মেরামত হয়ে ফিরে এসেছে অনেকক্ষণ।

—আয়! কোথায় ছিলি?

—ছিলাম জাহান্নমে!—বলেই উৎপলা পাশকেটে চলে গেল নিজের ঘরে। মা'কে ওরকম বলে ও! মা'র শোনা অভ্যাস আছে! কিছুই খারাপ ভাবে না মা ওর। যেন স্বাভাবিক—কথাটা শুনে মা বল্‌লে আজ,—অত মেজাজ দেখাস কাকে বাপু!

উৎপলা চলে এল নিজের ঘরে; টেবিলে একখানা চিঠি। কৃষ্ণা লিখেছে:—

শ্রীচরণেষু,

পলাদি, ভেবেছিলাম তোমার ওখানে সারাটা জীবন কাটাব। দেশে দেশে চলবে আমাদের নারী-উন্নয়নের কাজ। সংস্কৃতির প্রসারে, শিক্ষার প্রচারে আমরা হব আগামী যুগের অগ্রণীদল। এমন এক সৈনিকগোষ্ঠি আমরা সৃষ্টি করবো যারা হবে যুগোত্তর জীবনের স্রষ্টা! হিংসায়, দ্বেষে, দ্বন্দ্বে-যুদ্ধে হত-আহত, আর্ত্ত-ব্যথিত পৃথিবীর মাতৃ-অন্তরকে আমরা সেই সন্তান উপহার দেব যারা শান্তি-সাম্য-সৌভ্রাত্রের বিজয়গানে পূর্ণ করবে আগামী দিনের পৃথিবীকে! কিন্তু পলাদি—যে কদর্য্য ব্যাধির বীজাণু তোমার ঐ আশ্রমকে আক্রমণ করেছে, তাতে সেখানে থাকা বিপজ্জনক হলেও থাকতাম, যদি জানতাম সেই ব্যাধির ওষুধ তুমি সংগ্রহ করছো। অভিযোগ করছি না পলাদি—দুঃখ হচ্ছে তোমার আত্মার অপমৃত্যু দেখে! কিন্তু মানুষ দুঃখ জানিয়ে অপর মানুষের কিছুই করতে পারে না। ঈশ্বর

যদি থাকেন, এবং তিনি চান যদি পৃথিবীর মঙ্গল, তাহলে তোমাকে তিনি বাঁচাবেন—আশা করে রইলাম। প্রণাম জেনো। বিদায়!

—কৃষ্ণা।

উৎপলার দুচোখে দুফোঁটা জল দেখা দিল এতক্ষণে! কৃষ্ণা আজ চার-পাঁচ দিন হোল দেশে যাবার নাম করে চলে গেছে—ওদিকে সুহৃৎ বাবুর কাছে পদত্যাগপত্র দাখিল করে গেছে! উৎপলার সঙ্গে দেখা করে নি—হয়তো উৎপলা স্নেহের দাবীতে তাকে আটকে রাখবে—এই আশঙ্কায়! সুহৃৎ বাবুকে সে বলেই গেছে, সে আর আসবে না। তার চার্জ্জ বুঝিয়ে দিয়ে গেছে নলিনীকে। নলিনী একজন শিক্ষয়িত্রী—মাস তিনেক মাত্র এসেছে—এনেছেন মিঃ গায়েন।

উৎপলা চোখ মুছলো; কাঁদবার কি হয়েছে? কেঁদেই বা কি হবে? উৎপলা বহু জলে গিয়ে পড়েছে; কৃষ্ণার মত মেয়ে তার সঙ্গে হাবুডুবু খাবে, এ সম্ভব নয়! কৃষ্ণা ঐ আলোকেরই সমধর্ম্মী—ও গেছে, ভালই হয়েছে; উৎপলা একাই অন্ধকারে ডুবে যাবে—তলিয়ে যাবে—যাক!

শুয়ে পড়লো উৎপলা! মিঃ সাহার ওখানে—ষ্টুডিওতে জলযোগটা ভালই হয়েছিল। কিছু আর খাবার ইচ্ছে নাই! জানিয়ে দিল উৎপলা মা'কে শুয়ে শুয়েই! তারপর ঘুমুলো।

শীতকালের জড়তা ছাড়তে চাইছে না, কিন্তু উৎপলার ঘুম ভেঙেছে! উঠি-উঠি করেও পড়ে আছে বিছানায়! হঠাৎ ক্রিং ক্রিং টেলিফোন! এতো ভোরে কে ডাকে? তাড়াতাড়ি উঠে উৎপলা ফোন ধরলো।

—হ্যালো—মেম্ সাব্—হামি দারয়ান কথা বলছি হুজুর।

—কি বলছো?

—সুহৃৎবাবু, আউর অপর্ণাদিদি ঘরমে নেই! অপর্ণা দিদির বাচ্চাটা কাঁদছে!

—কোথায় গেল ?

—তা জানি না হুজুর ! বাচ্চাটা বহুৎ কাঁদছে !

—আচ্ছা, আমি যাচ্ছি।—উৎপলা ফোন রেখে বসে পড়লো ঐখানেই। কিন্তু যেতে হবে। যে দায়ীত্ব আজ স্বেচ্ছায় সে নিয়েছে মাথায়, সেই বোঝা গলায় বেঁধে অতলে ডুবে যেতে হবে উৎপলাকে ! মিনিট পাঁচ পরে উঠে তৈরী হতে গেল উৎপলা।

নির্দ্দয় শীতের নিষ্ঠুর পীড়ন : পার্ব্বত্য প্রদেশের মৃত্যুশীতলতা ; তুষারের অন্তহীন কুহেলি—কিন্তু যোগিদের এই সময়টাই নাকি সাধনার বিশেষ কাল। কঠোর হঠযোগ বা সুকঠিন অভ্যাসযোগ এই সময়টাতেই আয়ত্ত করা সহজ। সিধু সাধনা করছে ! অন্তরে উঠেই আরম্ভ করেছে তার সাধনা। কিন্তু সিধুর সাধনা অন্য রকম ; সাধারণ যোগ-সাধনার সঙ্গে তার বিশেষ যোগ নাই ; ওদের বিরাট মঠ—বহু ব্যক্তিই আছেন—যেন একটা বিশ্ববিদ্যালয়। সকলের উপর আছেন কর্ণবিজয়—ওদের শ্রীগুরুদেব। তিনি পার্থিব জীবনকে অপার্থিব জীবনের সঙ্গে মিলন-সাধনার পরীক্ষা চালাচ্ছেন এখানে শিষ্যদের নিয়ে। এ পরীক্ষায় সফল হবেন কি না, জানা নেই—তবু উনি করছেন পরীক্ষা। সাধারণ মানব-জীবনের মধ্যে মহত্তম জীবনানুভূতিকে উনি সুপ্রতিষ্ঠ করতে চান—মানুষকে মহান্ করতে চান। সৃষ্টির মধ্যে যে ঐক্যের রাগিণী, তাকেই ধরতে চান মানব-জীবনে।

সিধু ভোরে উঠে বেড়ালো খানিক—তারপর অবগাহন স্নান করলো ; এবার এসে পূজায় বসবে। এতো বেশী শীত যে অন্য কেউ হলে হাত-পা'র

অসাড়তার জন্য হাঁটতেই পারতো না—সিধু অভ্যস্থ হয়ে উঠেছে। এলো নিজের গুহায়। আসন বিছানোই থাকে—সাধনার আসন তুলতে নেই! সিধু বসলো! সিংহাসনে ওর পূজিত শালগ্রাম ; তার পাশে ছোট সোনালী ফ্রেমের মধ্যে অবন্তীর ফটোখানা—নিত্য সিধু পূজো করে একসঙ্গে শালগ্রামের এবং অবন্তীর। লোকে শুনলে হাসবে, এমন কি, সিধুরই হাসি পেয়েছিল প্রথম দিন আলোকের কথা শুনে। কিন্তু এখানে পৌঁছে গুরু কর্ণবিজয়কে সে যখন বললো সব কথা—শুনে উনি অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন,

—সেই আলোক নামে লোকটি সন্ন্যাসী না গৃহী ?

—তা ঠিক জানিনে প্রভু ; তবে সন্ন্যাসী নয়! খুবই ভালো ছেলে ; বরাবর ফার্ষ্ট হয়ে পাশ করেছে—বিপ্লবী হয়ে জেলে গেছে—এখন কি করছে, শুধুলাম না—সিধু উত্তর দিয়েছিল। শুনে কর্ণবিজয় পুনরায় প্রশ্ন করেছিলেন,

—অবন্তীর সঙ্গে তার আলাপ কতখানা আর তোমার সঙ্গেই-বা বন্ধুত্ব কেমন ?

—ছোটবেলা খেলাধুলো করেছি! অবন্তীর মা'র সঙ্গে আলোকের মা'র সখীত্ব ছিল, সেই সূত্রে আলোক প্রায়ই থাকতো অবন্তীদের ওখানে ; অবন্তী ওর ছোটবেলার খেলার সাথী। অবন্তীর জীবনে ঐ দুর্ঘটনা না ঘটলে ওরই সঙ্গে নিশ্চয় অবন্তীর বিয়ে হোত ; আর ঠিকই হোত। অবন্তীর যোগ্য বর আলোক! এখন হয়তো আলোকের ইচ্ছে হলে তাকে বিয়ে করতে পারে।

—না!—কর্ণবিজয় বলেছিলেন—তোমার মুখে তার বিষয় যা শুনলাম, তাতে মনে হচ্ছে—সে একটা অত্যন্ত বড় আদর্শের মূর্ত্ত রূপ—সে একটা আইডিয়া। বেশ, তোমাকে সে যা বলেছে, তাই কর—আমারও ঐ আদেশ।

—গুরুদেব, নারায়ণ শিলার সঙ্গে অবন্তীর ছবি রাখবো আমি?—সন্দেহাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করেছিল সিদ্ধেশ্বর! গুরুদেব মৃদু হেসে বলেছিলেন,

—হ্যাঁ—রূপজ প্রেম রূপাতীত হবে, দেহজ মোহ মোহমুক্ত হবে—কামজ কদর্য্যতা কামগন্ধহীন প্রেমে পরিণত হবে···সিধু, তোমার সেই বন্ধুটি শুধু শিক্ষিত নয়, সে সাধক! শিক্ষায় এ জ্ঞান আয়ত্ত করা যায় না!

আলোকের উপর শ্রদ্ধায় অন্তর পূর্ণ হয়ে উঠেছিল সিধুর। সেই থেকে শ্রীগুরুদেবের আদেশ আর আলোকের অনুরোধ মেনে একই সঙ্গে শালগ্রাম শিলা আর অবন্তীর পূজা করে সিধু। অবন্তীর ছবিখানি দু'বার দেখে দু'বেলা পূজার সময়, যেমন দেখে তার শিলামূর্ত্তিকে। দেখে, পুষ্পমালো সজ্জিত করে—আর ভাবে, তুমি আমার ঐ শালগ্রাম মূর্ত্তির সঙ্গে অভিন্ন—ঐতো তুমি—তুমিই শালগ্রাম!—অন্তরের গভীর চেতনায় সিধু অনুভব করে একটা অপূর্ব্ব শান্তি—অপর্য্যাপ্ত তৃপ্তি! অবন্তী তার অন্তরে-বাহিরে। অবন্তীর দৈহিক তত্ত্ব আছে, দেহ নাই—রূপ-গৌরব আছে, রূপসী নাই—কামনার মাধুর্য্য আছে, কামের অনুভূতি নাই—অবন্তী স্পষ্ট, সুন্দর, সহজ হয়ে উঠলো ওর মনে—ওর শালগ্রামশিলার মতই পূজার্হ, পবিত্র, প্রসন্ন হয়ে উঠলো।

দেহী অবন্তী কে জানে কবে লুপ্ত হয়ে গেছে ওর অন্তর থেকে; বিদেহী অবন্তী অনন্ত ঐশ্বর্য্য নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ওর উপাস্য ঈশ্বরের পাশে, যেন শ্রীরূপা,—যেন রূপের শ্রী—যেন মহালক্ষ্মী! সিধু পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করে, ওঁ লক্ষ্মীনারায়ণভ্যাং নমঃ। কে লক্ষ্মী? অবন্তী!—সিধু প্রথম দিকে চমকে উঠতো, আবার মনে পড়তো স্তোত্র,

"বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ স্ত্রীয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু—"

সিধু চুপ করে রইল। কর্ণবিজয় বুঝলেন, সিধু কিছু বলতে পারবে না। তিনিই বললেন,

—অবন্তীর কাছে ওকে রেখে আসতে পার না?

—গুরুদেব, অবন্তীর কাছে নির্ম্মলাকে রাখা কি ঠিক হবে? অবন্তী বিয়ে করে ভালভাবে সংসার করছে, কিম্বা হয়তো·····সিধু আর বলতে চাইলো না!

—পাপে ডুবে গেছে?—হাসলেন কর্ণবিজয়—বললেন,—অবন্তীর কাছেই নির্ম্মলাকে রাখতে হবে, এমন কথা আমি বলছি না। কিন্তু তোমার সেই বন্ধুটি—আলোক যার নাম—সে কোথায়?

—তার ঠিকানা তো আমি জানি না গুরুদেব!—সিধু জানালো।

—তাহলে নির্ম্মলাকে তুমি এখানেই নিয়ে এস! এখানে কিছুদিন রেখে কিছু শিক্ষা দিয়ে ওকে আমি পুরীর আশ্রমে পাঠিয়ে দেব।

—যে আজ্ঞে! কবে যেতে হবে?

—দু-চার দিনের মধ্যেই। তুমি তৈরী থাকো; যেদিন বলবো, যাবে।

—যে আজ্ঞে।

সিধু চলে এলো। নতুন করে আজ আবার অবন্তীর কথা মনে হো ওর! উঃ! দেহের লোভ কী প্রচণ্ড, রূপের মোহ কী ভীষণ, কামনার ল কী অসহনীয়? সিধু আবার যাবে বাংলায়—কলকাতায়, অবন্তীর বাড়ীর কাছাকাছি। গুরুর আদেশ, যেতেই হবে—সিধুর অন্তরাত্মা আনন্দিত হচ্ছে। এ কি রকম আনন্দ? কাম-গন্ধহীন? নাকি কামনা-কলুষিত? কে বলে দেবে সিধুকে? কে?

সারাদিন সিধুর কাটলো একটা আশ্চর্য্য অনুভূতির মধ্যে; জীবনে এ অনুভূতি অভিনব তার; কেমন একটা আনন্দ; কেমন একটা শিহরণ; কেমন

একটা জলন্ত যন্ত্রণা ; কিন্তু কেন এমন হচ্ছে ? সে তো অবন্তীকে [illegible] উর্দ্ধে স্থান দিয়েছে ! আপনার উপাস্য দেবতার আসনে স্থাপন করেছে—ঈশ্বরের সঙ্গে একত্বে অভিষিক্ত করেছে। না—করতে পারে নি। সিধু আত্মস্থ হয়ে ভেবে দেখলো—সে যা মনে করেছিল, তা হয় নি ; হওয়া অত সহজ নয় ! মনে পড়লো অগণ্য পুরাণে লিখিত অসংখ্য ঋষির ইতিহাস—উত্থান পতন। বিচলিত-বীর্য্য মহাঋষি পরাশর, ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র— ; স্বয়ং স্রষ্টা ব্রহ্মা পর্য্যন্ত বাদ যান নি ! নারী—মহামায়ার মায়াবিভূতি ! মহাবিভূতি ! মোহবিভূতি !—সিধু অস্থির হয়ে উঠছে !

শ্রীগুরুদেব কবে যেতে আদেশ করবেন, কে জানে ! হয়তো কালই বলবেন—'সিধু, এখনই যেতে হবে' ;—কিন্তু এত শিষ্য থাকতে সিধুর উপরই কেন এ আদেশ ? গুরুদেব কি সিধুকে পরীক্ষা করছেন—অবন্তীর কাছাকাছি পাঠিয়ে ?—হ্যাঁ—তাই করছেন ! নইলে নির্ম্মলাকে আনতে অন্য যে-কেউ যেতে পারতো ! গুরুদেব নিশ্চয় এই কয়েকমাস দেখছিলেন সিধুকে, অবন্তীর ছবিখানা নিয়ে সিধু কেমন থাকে—এখন একবার ভালো করে দেখে নিতে চান। সিধু কি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবে না ?

সিধু প্রার্থনা করলো গভীর রাত্রে ; কিন্তু ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গেই গুরুর আদেশ এল, তাকে যেতে হবে আজই, এখুনি, এই স[illegible]লের ট্রেণে। সিধু শ্রীগুরু স্মরণ করে উঠে পড়লো—প্রাতঃকৃত্য সমাপন করলো, তারপর বেরুলো ষ্টেশনের পথে। পরদিন সকালে পৌঁছাবে ; দূর পথ—দুর্গম পথ—কারণ বর্ত্তমানে একরাজ্য থেকে আর এক রাজ্যে যাওয়ার পথ ওটা। তবে প্রথমতঃ কলকাতাতেই যাবে সিধু ! যদি সুযোগ পায়, আলোকের সঙ্গে একবার দেখা করবে। কিন্তু কি করে করবে দেখা ! আলোক কোথায় থাকে সিধু তো জানে না ! সেবার নিজের চিন্তায় এত ব্যস্ত ছিল সিধু যে আলোক

কোথায় থাকে, কি করে, কিছুই জানতে চায় নি সে। আলোক নিশ্চয় কোনো ভাল কাজই করে। কিন্তু কলকাতা সহরে কোনো ভাল কাজ-করা লোককে খুঁজে পাওয়া একান্ত অসম্ভব! আর কারো সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছা নাই সিধুর! সটান সে চলে যাবে নির্ম্মলার ওখানে কালই; তাকে নিয়ে ফিরে চলে আসবে আশ্রমে!—কিন্তু যদি দেখা হয়ে যায় অবন্তীর সঙ্গে? অবন্তীর মার সঙ্গে যেমন শতবার কাশীতে হয়েছিল!—সিধু শিউরে উঠছে—আনন্দে, না আতঙ্কে?

এই জীব—এই জীবন! এই দুর্ব্বলতা! এই প্রলোভন! এই পাপ! এই নিয়েই চলছে জীবজগৎ—মানবজগৎ;—হয়তো দেবজগৎও এই মহা দুর্ব্বলতা থেকে মুক্ত নয়। আশ্রমের সাধক-সিধু আর অবন্তীর স্বামী-সিধু—এর কোনটার দিকে তোমার করুণার-তুলাদণ্ড বেশি ঝুঁকবে ঈশ্বর?—তোমার সহানুভূতি কার অন্তরকে স্নিগ্ধ করবে?—পাপী সিধু, প্রতারক সিধু, লোভী সিধু ছিল, আজও আছে—আবার সাধক সিধু, ত্যাগী সিধু, তপস্বী সিধুও আবির্ভূত হয়েছে তোমার এই রাজত্বে; কিন্তু মানুষের রাজ্যে যারা মানুষ হয়ে বেঁচে থাকে, তোমার সাধক-সিধুর উপর শ্রদ্ধা তাদের যতই থাক—সাধারণ সিধুর প্রতি সহানুভূতিও তাদের কম হবে না!—সিধু ভাবতে ভাবতে ট্রেণ থেকে নেমে গঙ্গাস্নান করলো। এবার আর সাধারণ বেশ করলো না সে; তার আশ্রমের বেশেই ট্রামে উঠলো শিয়ালদহে এসে আবার ট্রেণ ধরে নির্ম্মলার কাছে যাবার জন্য। ওর গলায় ঝোলানো ঝোলায় আছে শালগ্রাম আর অবন্তীর ছবি; ঠিক তেমনি আছে, যেমন থাকে ওর আশ্রমগুহায়; একসঙ্গে পাশাপাশি অবন্তী আর শালগ্রাম। ট্রামের ঝাঁকুনিতে ঝোলাটা দুলছে—বুকে আঘাত করছে মৃদু,—মিষ্টি—অবন্তীই যেন বুকে ছোঁয়া দিচ্ছে ওর।

সিধু চোখ বুজে বসে রইল।

বেলা বারটার মধ্যেই পৌঁছে গেল সিধু নির্ম্মলার [illegible] গ্রামটা, পাকিস্তানে পড়েছে, নিতান্ত ছোট গ্রাম; বাস করেন [illegible] বাস। ওর এক দূর সম্পর্কের দাদামশাই ওর দেখাশুনা করতেন। [illegible] তিনি অন্যত্র চলে যাবেন—তাই নির্ম্মলার ওখানে আর থাকা হবে না। নির্ম্মলা জানতো, সিধু আসছে—চিঠিতে খবর পেয়েছিল। তৈরী হয়েও ছিল সে সিধুর সঙ্গে যাবার জন্য।

—স্নান-পূজা করেই তো এসেছেন—তাহলে খাবার দিই!—নির্ম্মলা বললো,

—দাও—সিধু বেশি বাক্যব্যয় না করে খেতে বসলো। ঝোলাটি সযত্নে তুলে রেখেছে নির্ম্মলার তুলসীমঞ্চের উপর। নির্ম্মলা ওকে খেতে বসিয়ে শুধুলো,

—আপনার বউ ওখানে যাবেন, শুনেছিলাম, তাঁর কি হোল সিধুদা?

—বউ?—সিধু চমকে উঠলো—না, তার সঙ্গে বিয়ে তো ঠিক হয় নি আমার; হবার কথা ছিল! বাগদত্তা হয়ে ছিল সে—সিধু ঢোক গিললো একটা; এই কথা মিথ্যা কি সত্য—ও জানে না—ওর জ্ঞানের পরিধির বাইরে সে তত্ত্ব—বললো,

—আমি সন্ন্যাসী নির্ম্মলা, বাক্য প্রত্যাহার করলাম। এখন সে অন্য কাউকে বিয়ে করবে!—সিধু আবার একটা ঢোক গিললো ভাতের সঙ্গে।

—তাই নাকি!—নির্ম্মলা অতি বিস্ময়ে বললো—তবে যে শুনেছিলাম, সে আপনার বউ!

—তুমি ভুল শুনেছিলে!—সিধু কাটিয়ে দিল কথাটা। বললো,

—তোমার সব ঠিক আছে তো? আজই সন্ধ্যার গাড়ীতে তাহলে যাওয়া যাবে!

—হ্যাঁ, ঠিক আছে। তবে আজই কেন? আজ থাকুন—কাল সকালের গাড়ীতে যাব।

সিধু আর কিছু বললো না; খেয়ে বিশ্রাম করলো। বিকালে নদীধার দিয়ে একটু বেড়াতে বেরুলো সিধু।—সন্ধ্যায় ফিরে এসে পূজা করতে বসলো। ঝোলা থেকে বের করলো শালগ্রামশিলা—অবন্তীর ছবিখানাও। নির্ম্মলা পিছন থেকে দেখছে। সে ভেবেছিল, জগন্নাথ বা বদরীনারায়ণের ছবি হবে, কিন্তু ও যে ফটো, মানুষের ফটো—সুন্দর একটি মেয়ের ছবি! নির্ম্মলা বিস্মিত হয়ে শুধুলো,

—ও কার ছবি সিধুদা? ভারী সুন্দর চেহারা তো! কে মেয়েটি?

—অবন্—সিধু সামলে গেল। সজোরে স্তোত্র পাঠ আরম্ভ করলো—ওঁ নারায়ণ পরা বেদা……কিন্তু ঐ 'অবন্' উচ্চারণই যথেষ্ট নির্ম্মলার নারী-মনের কাছে। সে বুঝে নিয়েছে। বললো,

—অবন্তী? ওরই সঙ্গে বিয়ে হবার কথা ছিল তো আপনার?

—হ্যাঁ—সিধু সত্য বললো। মিথ্যাকে আশ্রয় সে আর করবে না। যা ঘটে ঘটুক। মিথ্যাকে সে নির্ম্মমভাবে ত্যাগ করবে। সিধু স্তোত্রটা আবার আরম্ভ করলো। নির্ম্মলা চেয়ে আছে ওর মুখের পানে। সিধু আরতি আরম্ভ করলো—বিস্ময়ের উপর বিস্ময়; সিধু নারায়ণশিলার সঙ্গে অবন্তীর ফটোর আরতি করছে! নির্ম্মলা এ সময় তাকে প্রশ্ন করতে পারে না। ভাবতে লাগলো। একি আশ্চর্য্য ব্যাপার! কেন এমন কাজ করছেন উনি? আরতি শেষ হলে শুধুলো,

—ওকে কি আপনি দেবীর আসনে বসিয়েছেন সিধুদা?

—হ্যাঁ দিদি—ওকে ভালোবাসি ছোটবেলা থেকে। [illegible] তাকে তো ফেলা যায় না! সে থাকবে, পত্নীর আসনে নাই বা [illegible] প্রেমের আসনে রাখলাম।

—তাহলে বাগদান প্রত্যাহার করলেন কেন? বিয়ে করলেই হোত!

—তাতে ওর দেহটাকে পেতাম—হারাতাম ওর ওপর আমার প্রেম, আমার পূজা!

—এ কোন শ্রেণীর সাধনা, সিধুদা?

—তা জানি না নির্ম্মলা,—এটা মোটেই সাধনা কিনা, তাই জনি না; তবে একটা বস্তু জেনেছি।

—কি?—নির্ম্মলা আগ্রহে এগিয়ে এল ওর দিকে।

—দেহীকে ভালবাসা আর দেহাতীতকে ভালবাসার তফাৎ। দেহীর সঙ্গে চলে শুধু দেওয়া আর নেওয়ার কারবার, আর দেহাতীতকে নিয়েই যাওয়া যায়, দিতেই ইচ্ছে হয়—দেওয়ার ভাণ্ডার অফুরন্ত, অক্ষয় হয়ে ওঠে! দানের সেই তৃপ্তি কত বড়, দেহাতীতকে যে ভাল না বেসেছে, সে জানে না! ওর রূপ আর যৌবন-এর ছবি আমি নিই নি—দেখছ তো—আমি নিয়েছি ওর কিশোরী মূর্ত্তি—কুমারী রূপ—যে-রূপ দেহাতীতকে ধরিয়ে দেবে আমার মানসলোকে—আমার মরমদেউলে। সিধু চুপ করলো।

নির্ম্মলা কিছু বুঝলো, কিছু বা বুঝলো না। বললো—আপনার 'ইষ্ট' তাহলে ঐ অবন্তীই!

—তাতে কিছু অনিষ্ট নেই নির্ম্মলা,—শিলায় যদি পূজা করা যায়, অবন্তীর ফটোতেই বা যাবেনা কেন? এই বিশ্বের প্রতি অণুতে তিনি—যে অণুটি আমার ভাল লাগে, আমি তাতেই তাঁর প্রকাশ দেখি। ঐ ফটোতে দেখি তাঁর রূপ—অনন্ত ঐশ্বর্য্য—অপার বিভূতি।

নির্মলাকে নিয়ে পরদিন সিধু ফিরে এল কলকাতায়; রাত্রের ট্রেনে আশ্রমে যাবে।

উৎপলা বেরিয়ে পড়লো আশ্রমের উদ্দেশে! গাড়ীতে বসে আছে উৎপলা—সর্ব্বহারার রিক্ততা ওর চোখে! যে মহান আদর্শ ওকে উদ্বুদ্ধ করে তিনটা বছর বৈদ্যুতির উৎস-যন্ত্রের মত চালিয়ে আনলো, আজ সেই শক্তির উৎস শুকিয়ে গেছে—মৃত সূর্য্যের মত অনন্ত গগনমণ্ডলে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেই যন্ত্রদানব, কখন উৎপলায় মাথায় পড়বে—জানা নেই!

কিন্তু উৎপলার অসীম সহ্যশক্তি। না হয়, আপন হাতে গড়া খেলাঘর সে ভেঙ্গেই দেবে—জীবনের জটিল গ্রন্থীকে খুলে ফেলবে উৎপলা—সহজ হয়ে যাবে। কিন্তু সহজ হওয়া খুব সহজ নয়;—একজন ছিল, যে সহজ হবার উপদেশ দিত উৎপলাকে—সে আলোক; আলোকের মতই সহজ-সুন্দর-শক্তিশালী! সে আজ নাই; সহজ করবে কে আর উৎপলাকে! আলোক যে কী ছিল উৎপলার জীবনে—আজ যেন উৎপলা আরো ভালো করে অনুভব করছে।

কিন্তু আলোক চলে গিয়েও তার রেশ রেখে গিয়েছিল—মনে পড়লো, মিঃ সাহার বাড়ীতে চেকখানা নেবার সময় আলোকের ফেলে-যাওয়া ছাতাটার কথা। উৎপলা তক্ষুনি সাবধান হতে পারতো—হয়নি; একটা ধাপে নেমে এসেছে উৎপলা আঁধার গর্ত্তের নিম্নতলে—এখন আর……

উৎপলা আশ্রমে পৌঁছালো; দারয়ান গেটেই দাঁড়িয়ে ছিল। গাড়ী থেকে ওখানেই নেমে উৎপলা প্রশ্ন করে জানতে পারলো—সুহৃৎবাবু এবং

অপর্ণা কখন গেছে, দারয়ান সঠিক জানে না। সে অপর্ণার ছেলেটার কান্না শুনে দেখতে যায়—ভীষণ কাঁদছে ছেলেটা—আর অপর্ণা ঘরে নাই। তারপরই দেখতে পায়, বাগানের খিড়কী দরজা খোলা। গত সন্ধ্যায় উৎপলা ভর্ৎসনা করেছিল অপর্ণাকে, সেইটা শোনা ছিল, তাই দারয়ান সন্দেহাকুল হয়ে সুহৃৎবাবুকে খবর দিতে গিয়ে দেখে, তিনিও নাই। তখন ব্যাপারটা আন্দাজ করে দারয়ান ফোন করেছে উৎপলাকে।

—আশ্রমের মেয়েরা এসব শুনেছে?

—কি জানি হুজুর—তবে নলিনী দিদিমণিকে আমি তখুনি জানিয়েছি।

উৎপলা গেট থেকে সটান চলে এল ভেতরে—অফিসঘরে। ছেলেটা তখনো কাঁদছে—কেঁদে কেঁদে গলা ধরে গেছে ওর—চোখ ফুলে উঠেছে; আছাড়-পাছাড় করছে ছেলেটা সেই বিলিতী লতার জালতিটার কাছে পড়ে; সর্ব্বাঙ্গে ওর কাদা—কদর্য্যতা; কুৎসিৎ হয়ে উঠেছে অমন সুন্দর শিশু! মাতৃহারা! না—অপর্ণা কি ওর মা নাকি! মা নয়, রাক্ষসী; ফেলে চলে গেল নিজের গর্ভজাত পুত্রকে! কেন? কিসের লোভে? কোন্ জৈব-জীবনের প্রমত্ততায়? আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!

উৎপলার বিস্ময়টা বিস্ময়কেও অতিক্রম করে যাচ্ছে যেন। মা ছেলেকে ছেড়ে পালাতে পারে? পারে—নিজের ছেলেকে হত্যা করেও……মা—না—না—না—! উৎপলা ছুটে গিয়ে দুহাত বাড়িয়ে কোলে তুলে নিল ছেলেটাকে।

—জীবন! জীবন!

না,—ও রুদ্র; জীবনকে ও ধ্বংসের রুদ্রশূলে বিদ্ধ করে—শ্মশানের প্রেতায়িত অন্ধকারকে জাগিয়ে তোলে জননীর জীবনে। জীবনের কামনা-বীজাণুর তীক্ষ্ণতম অভিব্যক্তি ও—উগ্র, উদগ্র পাশুপৎ—বিশ্বম্ভরের বিশ্বধ্বংসী মহাশূল!

উৎপলার কণ্ঠে জড়িয়ে দিয়েছে দু'খানি হাত—যেমন করে উৎপলা একদিন এক শিশুর কণ্ঠে……না—না…না…না…না! এই ললিত-পেলব, কোমল-সুন্দর, আর্ত-অসহায় হাতদুটি যে আশ্রয়প্রার্থী শিশুদেবতার! ক্রোড়দেবতার! কুলদেবতার! জীবনদেবতার! এ হাত উৎপলার হত্যা-কলঙ্কিত হাত নয়—এ হাত স্নেহের নবনীতে গঠিত—সৃজনের মহিমায় অভিসিঞ্চিত—স্বর্গের সুষমায় মণ্ডিত!

উৎপলা দুচোখ ভরে দেখলো ছেলেটার মুখখানা। চুপ করে গেছে জীবন, কাদামাখা মুখখানা পরিপূর্ণ করে হাসি ফুটিয়ে দিল—যেন পচা খানাডোবায় ফুটল পদ্মফুল!

চুমায় চুমায় আচ্ছন্ন করে দিল উৎপলা ওর মুখ…ওর সর্ব্বাঙ্গ! বুকে করে নিয়ে এল আশ্রমের অফিসঘরে! ডাকলো আবার—জীবন!—রুদ্র!

সুন্দর শুভ্র শাড়ীটায় কাদা লেগে গেছে—নষ্ট হয়ে গেছে শাড়ীখানা। নলিনী দেবী দাঁড়িয়েছিলেন; বললেন,—একখানা শাড়ী এনে দিই—ওটা ছেড়ে ফেলুন!

উৎপলা উত্তর দিল না। ছেলেটা অতক্ষণ ধরে কাঁদছে, ওরা কেউ তোলে নি। কারণ ও ঝি অপর্ণার ছেলে! এই নারী—এই মা—এই মাতৃ-অন্তর! এদেরই সন্তানগণ হবে দেশের সম্পদ! ধিক্! উৎপলা কঠিন চোখে চাইল নলিনীর পানে। তারপর ফোনের রিসিভার তুলে ফোন করলো প্রেসিডেন্ট আচার্য্যকে! সব শুনে তিনি বললেন—এ রকম হবে, আন্দাজ করা গিয়েছিল অনেক আগেই। যাকগে, পেপারে পাবলিসিটি না হয়, সেইটা দেখতে হবে। ব্যাপারটা 'হাস-আপ' করে দিতে হবে ওখানেই! নইলে আশ্রম রাখা কঠিন হয়ে পড়বে।

—আশ্রম আর রাখতে ইচ্ছে করছে না আমার!—উৎপলার কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ অথচ করুণ!

—ও রকম হয় ; অত ভাববার কি আছে। বড় একটা কাজ [illegible]
লে বহু বাধাই আসে, বহু বিপর্য্যয় ঘটে—তা'বলে কি কাজ বন্ধ করা
চিৎ !

—কে আমাকে সাহায্য করবে, বলুন ! আলোকবাবু চলে গেছেন,
ক্ষাও চলে গেল। ভাঙন ধরেছে আশ্রমে, আর আমার জীবনেও আমি
ার বরদাস্ত করতে পারছি না ! •

—এতটা অসহনীয় হবার মত কি হয়েছে ?—আচার্য্য যেন সান্ত্বনার
রে বললেন।

—কী হয়েছে ! রেবতী এখন এই আশ্রমের কেউ না হলেও আমার
আপনার—তাকে আমি স্নেহ করতাম—সে ওখানে গিয়ে বিপন্না হয়েছে।
ীলিমার অবস্থাও খুব খারাপ। বিকাশ বাবু তাকে নিয়ে গেছেন অন্য একটা
ায়গায় ·····সে কান্নাকাটি করে চিঠি লিখেছে আমায় ! আজ এখানে যে
ঘটনা ঘটলো, তাতে মেয়েদের মনের 'মর‍্যাল', নৈতিক শক্তি যে ঘা খেল—
তারপর এ আশ্রমে কোনো ভাল কাজ হবে, আমি আশা করি না।

—হবে।—সভাপতি দৃঢ়স্বরে বললেন—এই দুর্ঘটনাকে চাপা দিয়ে
ফেলা হোক ! অফিসের জন্য অন্য কাউকে আমি দেখছি—আলোককে
পেলে খুবই সুবিধা হোত···কিন্তু · সে কোথায়—জানা আছে ?

—না। তার যাওয়ার পর আর খবর পাইনি। তাছাড়া সে
আসবে না ! সে কেন আসবে এমন কদর্য্য যায়গায় ?

—সে থাকলে ব্যাপার এতটা গড়াতে পারতো না।—সভাপতি
বললেন !

উৎপলা চুপ করে রইল। সভাপতিই বললেন—আশ্রমটা নষ্ট হয়ে
গেলে আমি বড়ই দুঃখ পাব। ওকে টিকিয়ে রাখতেই হবে ! তবে
পরিচালনা ব্যাপারে আমাদের আরো শক্ত হওয়া দরকার।

—আমি এখন কি করবো ?—উৎপলা প্রশ্ন করলো।

—বিশেষ কিছু না—অফিসের চার্জ পরবর্ত্তী ক্লার্ককে দেওয়া হোক, আর সুহৃৎ বা অপর্ণার যাওয়ার খবরটা বাইরে যাতে প্রকাশ না হয়, তার ব্যবস্থা করা হোক।

—বাইরে প্রকাশ হবেই। এ সব কথা লুকানো থাকে না!

—তা হোক, সেটা কাণাঘুষা। কাগজে কলমে প্রকাশ [illegible]লই হোল!

—তা হলে মিটিং ডাকবো না ?

—না-না! মিটিংএর কি দরকার! এ সব ব্যাপার নিজেদের মধ্যেই সামলে নিতে হবে।

উৎপলা ফোনটা ছেড়ে দেবে,. হঠাৎ সভাপতি প্রশ্ন করলেন ওকে,

—অপর্ণার যে একটা ছেলে ছিল, সে কোথায় ?

—তাকে ফেলেই চলে গেছে—সে এখানেই রয়েছে!—উৎপলা চাইল ছেলেটার দিকে।

—ফেলে গেছে! কী শয়তান মেয়ে!—সভাপতি বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

কিন্তু উৎপলা ওঁর বিস্ময়টা দেখে আরো বিস্মিত হোল,—বললো,

—মানুষ যে জন্তু, সেটা আরেকবার প্রমাণ হোল!—হাসলো উৎপলা মৃদু।

—ও ছেলেও একটা 'জন্তু' হবে! ওটাকে করা যাবে কি ? "অনাথ 'শিশু-সদনে" পাঠিয়ে দিলেই তো চুকে যায়—সভাপতি বললেন।

উৎপলার অন্তরটা মুচড়ে উঠলো অকস্মাৎ! 'অনাথ-শিশু-সদনে' পাঠিয়ে দেবে ওকে ? হ্যাঁ—তাছাড়া কোথায় রাখবে ওকে উৎপলা!

কিন্তু ছেলেটা নিশ্চুপ, নির্জীব হয়ে পড়ে আছে ওর কোলে—হয়তো [illegible] গেছে! উৎপলা ডাকলো,—জীবন!

—উঁ!—লম্বা টানা উজ্জ্বল চোখদুটি খুললো ওর প্রভাতের পদ্ম পাপড়ীর মত।

—না—উৎপলা ফোনের নলে মুখ রেখে বললো—ও থাক আমার কাছে!

—সে কি! না—সভাপতির কণ্ঠে প্রচুর বিস্ময়, তার সঙ্গে নিষেধের অনুশাসন!

—হ্যাঁ—উৎপলার ঔদার্য্য শিশুর ললাটে নামলো! চুমা দিল উৎপলা ছেলেটাকে। ফোন রেখে দিয়ে তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করে ফেললো যথাসম্ভব। ক্লার্ক এখনো আসেন নি—উৎপলা [illegible] নামে আদেশপত্র লিখে রাখলো। দারয়ানকে বললো একটা [illegible] দেখে কি যোগাড় করতে; নলিনীকে বললো, আশ্রমের মেয়েরা যেন [illegible] নিয়ে গল্প-গুজব না করে, ঘোঁট না পাকায়, বা ভয় না পায়—তা' দেখতে। তারপর জীবনকে কোলে নিয়ে গাড়ীতে উঠলো।

চলেছে উৎপলা বাড়ীর দিকে! চেয়ে দেখলো কোলের ছেলেটাকে। এ কার ছেলে? অপর্ণার ছেলে এতো সুন্দর হোল কি করে? কি আশ্চর্য্য সুন্দর! যেমন রং তেমনি গড়ন। ধুলো-কাদা লেগে রয়েছে, —নইলে রাজপুত্রের মত চেহারা! ওকে একবার গঙ্গায় নাইয়ে নেবে উৎপলা; তারপর বাড়ী গিয়ে আবার সাবান ঘষে পরিষ্কার করবে। উৎপলা নিজেও নেয়ে নেবে! গাড়ী চালাতে বলল গঙ্গার দিকে।

অকস্মাৎ উৎপলার হাসি পেল; গঙ্গা নাইতে যাচ্ছে উৎপলা! আশ্চর্য্য! কিন্তু হলোই বা আশ্চর্য্য! কত শত, কত সহস্র লোক তো নাইছে

রোজ গঙ্গায়! কত লোক কত টাকা খরচ করে ঘাট বাঁধিয়ে দিয়েছে, কত সাধু মোহান্ত বসে আছে সেই ঘাটে—স্নান করছে—পূজাও করছে, পবিত্র হচ্ছে। পবিত্রতা মনে—কিন্তু মনকে উপলক্ষ্য দিতে হয়। গঙ্গাকেই যদি উপলক্ষ্য করা যায় তো মন্দ কি!—উৎপলা গাড়ী থেকে নামলো এসে একটা ঘাটের কাছে। বিস্তর লোক স্নান করছে—তেল মাখছে, গল্প করছে—মেয়েদের আলাদা ঘাট—পুরুষদের আলাদা; বেশ বন্দোবস্ত। উৎপলা এমন করে কখনো দেখেনি—কোনোদিন গঙ্গাস্নান করেছে বলে মনে পড়ে না ওর! কে করাবে? ওর মা তো ও-পাট রাখেন না! কিন্তু উৎপলা করাবে স্নান এই ছেলেটাকে! ও যেন বলতে না পারে, ওর মা ওকে গঙ্গাস্নান করায় নি! ও ধার্ম্মিক হবে, কি পাপী হবে, উৎপলার জানা নেই, কিন্তু উৎপলার কাজ ওর মধ্যে সাংস্কৃতিক গৌরববোধ জাগবার চেষ্টা করা—উৎপলার কর্ত্তব্য: কিন্তু ও কেমন বাপের ছেলে! কে জানে, ওর মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতির গৌরববোধ কোনদিন জাগবে কি না—হয়তো জাগবে না; কিম্বা হয়তো ভারতীয় সংস্কৃতির সমুন্নত মহিমায় উন্নীত হয়েও একদিন ও জানতে পারবে, ও এদেশের কেউ নয়, এই সংস্কৃতির বাহক হবার কোনো অধিকার ওর নাই। সেদিন ধাত্রী উৎপলা হয়তো বেঁচে থাকবে না। কিন্তু ও সেদিন কি চোখে দেখবে উৎপলাকে?—ভাবতে ভাবতে উৎপলা ছেলেটাকে নিয়ে ঘাটে নামছে। বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছে ছেলেটা এর মধ্যে। কিন্তু ওর খিদে পেয়েছে খুব—বলল,

—খাব!

—খাবি? আয়, স্নান করে নে, তারপর খাওয়াবো।

শীতের সকাল—স্নান করা অত সোজা নয়! কাপড় গামছা কিছুই আনেনি উৎপলা! এক মিনিট দাঁড়িয়ে ভাবলো—স্নান করলে তাকে ভিজে

কাপড়েই বাড়ী ফিরতে হবে। না—স্নান করা হলো না উৎপলার। আরেকদিন আসবে! উৎপলা ফিরে এসে গাড়ীতে উঠলো!

•

সারাদিনটা আজ বেশ কেটেছে উৎপলার। ছেলেটাকে স্নান করিয়ে, কাজল পরিয়ে—চুমা দিয়ে ওর ক্ষুধিত মাতৃত্ব যেন তৃপ্তি পাচ্ছে; যেন সীমাহীন শূণ্যতার মধ্যে একটা অবলম্বন পেয়েছে উৎপলা। ওর মা বিরক্ত হয়েছে খুবই, কিন্তু উৎপলা গ্রাহ্য করে না—ওর মা উৎপলা নয়—উৎপলা জীবনের মা! উৎপলা ওকে মানুষ করবে আলোকের আদর্শে,—ওমনি তেজস্বী, দীপ্ত—শানিত করে; আলো কোথাও কলঙ্কিত হয় না—কোথাও মরচে ধরে না—সব সময়ই লক্ষ মাইল গতিশীল!

ছেলেটাকে বুকে নিয়ে ঘুম পাড়াচ্ছিল উৎপলা বাগানে বেড়াতে বেড়াতে। কিন্তু আলোকের আদর্শে কেন ওকে মানুষ করবে উৎপলা? কেন একথা ভাবলো সে? আলোকের থেকে বড় আদর্শ কি চোখে কখনো পড়ে নি? আলোক কী এমন লোক? কী সে করেছে জীবনে? কেন তার উপর মোহ উৎপলার? সুন্দর, শিক্ষিত, চরিত্রবান—তাতে উৎপলার কি? কিন্তু কি আশ্চর্য্য চরিত্র? অবন্তীর মত অপরূপ সুন্দরী মেয়েকে মুখের উপর বলে দিল—"তোমার সঙ্গে আমার প্রীতি সাজিক"! উৎপলা ওকে ভালবাসে, জেনেও চলে গেল এখান থেকে—একবার ফিরে তাকালো না—অভাগী উৎপলার হোল কি! সে আছে কেমন! সেই যে গেছে, আর কোনো খবর নেই। এতো মনের জোর পায় কোথায় আলোক?

জীবন ঘুমিয়ে গেছে—ওকে শোয়াতে হবে—উৎপলা বাগান থেকে ঘরে এসে উঠলো। বিকাশ বসে অপেক্ষা করছে! সস্মিত অভিবাদন জানালো উৎপলা। বিকাশ প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে তাকালো,

—ও ছেলেটা কার? সেই ঝিটার না?

—হ্যাঁ—এখন আমার!—উৎপলা হাসলো।

প্রায় মিনিট খানেক ওর পানে চেয়ে রইল বিকাশ; উৎপলা ইতিমধ্যে জীবনকে শোয়াল ঐখানেই একটা কৌচে—তারপর ওর কাছে বসে চাইল বিকাশের দিকে।

—ওসব রাখো উৎপলা, এসো, এবার বিয়ে করে সংসার করা যাক্। বিকাশ বললো।

—তার মানে?—উৎপলা যেন কথাটা বুঝতে পারছে না ঠিক মত।

—মানে—বিকাশ একটু হাসলো—মানে, জীবনের এই জ্বালাময় পথে আর চলা যাচ্ছে না—ক্লান্ত হয়ে পড়েছি; একটু বিশ্রাম দরকার। একটি ছোট্ট নীড়, একটি নারী, যাকে ঘিরে স্বপ্ন দেখা সহজ হবে……!

—ওঃ! কাব্য!—উৎপলা হেসে উঠলো—কিন্তু এরকম তো আর হয় না বিকাশ, কাব্য তরুণ জীবনের উপজীব্য…তাকে আমরা ছাড়িয়ে এসেছি বহুদিন!

—সে কি উৎপলা? মানুষ যে-কোনো বয়সে বিয়ে করতে পারে যদি থাকে তার শারীরিক সামর্থ্য—আর্থিক সঙ্গতি……

—পারে, কিন্তু সেটা আর কাব্য হয় না, হয় কনট্রাক্ট,—চুক্তিনামা! কিন্তু বিকাশ, সে চুক্তি অন্তরের স্বভাবজ বন্ধনকে স্বীকার করে না—অস্বাভাবিক আইনকে তাই তার ফাঁকি দিতে বেশী সময়ও লাগে না। ও চুক্তি দুদিনেই ফেঁসে যাবে—থাক্!

—কেন এমন কথা বলছো উৎপলা?—বিকাশ কিঞ্চিৎ [illegible] করলো।

—বলছি এই জন্য যে নারী হিসাবে তুমি যেমন আমাকে শ্রদ্ধা করো না, পুরুষ হিসাবে আমিও ঠিক তেমনি তোমাকে শ্রদ্ধা করি না।

—প্রমাণ?

—তুমি কি করেছ বা কর, আমি সে কথা তুলবো না, কিন্তু আমাকে দিয়ে তুমি যে-সব কাজ এই ক'মাসে করালে, সাধারণ গণিকাকে দিয়েও কোনো পুরুষ তা করাতে ভয় পায়। অর্থাৎ তুমি আমাকে তার থেকেও হীন ভাব!

উৎপলার কথা শুনে বিকাশ কিছুক্ষণ একেবারে চুপ মেরে গেল। কিন্তু হঠাৎ যেন কথা খুঁজে পেয়েছে, এমনি ভাবে বলে উঠলো,

—প্রয়োজনের তাগিদে কোনো কাজ করতে আমি কখনো পিছুই না উৎপলা, দেখলাম তুমি সেই সাহস রাখ—তাই তোমাকে সহধর্ম্মিনী করতে চাইছি।

—সহধর্ম্মিনী হবার আমার আর ইচ্ছা নেই বিকাশ—কারো সমান ধর্ম্ম আর আমি চাইছি না—এখন আমার নিজের ধর্ম্মেরই অনুশীলন করতে চাই।

—কি তোমার ধর্ম্ম উৎপলা?—বিকাশ যেন কিঞ্চিৎ উষ্ণ, কিছু ক্ষুব্ধ, কিছু হতাশ!

—মায়ের ধর্ম্ম। ঐ ছেলেটাকে আমি মানুষ করবো। আলোকের মত উজ্জ্বল আর বজ্রের মত কঠোর করে গড়বো ওকে—আপনার হাতে যেমন করে কুমোর গড়ে কাঁচা মাটিতে তার মানস-মূর্ত্তি!

বিকাশ একেবারে চুপ হয়ে গেল উৎপলার কথাটা শুনে। কিন্তু কথা তার যোগায়—এবং কথা—বাণী—বক্তৃতা—এই দিয়েই সে বড় হয়েছে। বলল,

—তুমি ভুল করছো উৎপলা; 'হেরিডিটির' একটা মূল্য আছে! ও কার ছেলে, কেমন ওর বাবা—সে সৎ না শয়তান, তোমার জানা নেই।

—হিঃ হিঃ হিঃ! উৎপলা হেসে উঠলো,—দুঃখ করো না বিকাশ, সত্যের খাতিরে বলতে বাধ্য হচ্ছি, ওর বাবা যেই হোক, আর যত বড় শয়তানই হোক, সে নিশ্চয় তোমাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে নি! আর ওর মাও আমাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে নি।

ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়ে উঠলো বিকাশের মুখখানা। উৎপলা লক্ষ্য করছে, ছোট টেবিলটার দিকে মুখ করে আছে বিকাশ। হঠাৎ বললো,

—আচ্ছা উৎপলা—আসি!

—চা খেয়ে যাও—উৎপলা বললো।

—থাক—আর কেন!—বিকাশ উঠে দাঁড়ালো যাবার জন্য।

—তুমি রাগ করছো বিকাশ! কিন্তু ভেবে দেখ—তোমাকে শ্রদ্ধা বা ঘৃণা কিছুই আর দিতে পারি না! কি ভাবে তোমার সঙ্গে ঘর করবো—বল! নারী কাকে শ্রদ্ধা বা ঘৃণা করতে পারে, জানো বিকাশ? যে তার চোখে সাধারণের থেকে অন্ততঃ কিঞ্চিৎ ভিন্ন! তুমি আমার চোখে শুধু সাধারণ নও, অতি সাধারণ! যেমন দেখেছি যুদ্ধের আমলে বহু পুরুষকে, যেমন দেখছি আশ্রমের কাজে-কর্ম্মে বহু কর্ম্মীকে—দেখছি মিঃ সাহাকে, ডাঃ গুহকে, তুমি তার থেকে একচুল ভাল বা মন্দ নও—ভীরু বা বীর নও, সাধু বা শয়তান নও। বসো, চা খাও—সহজ সত্যি কথায় রাগ করবার কি আছে!—প্রতি নারীর মধ্যে যেমন সর্ব্বাগ্রে তুমি গণিকাটাকে দেখতে পাও, প্রতি পুরুষের মধ্যে আমিও তেমনি অজবৃত্তি-পরায়ণ এক অসুরকে দেখি। বিয়ের ভণ্ডামী আর করতে চাই নে বিকাশ—অনুরোধ করি, তুমিও কোরো না সে ভণ্ডামী। কিন্তু একটা প্রশ্ন করবো? অবশ্য কিছু যদি মনে না কর!

—কর !—বিকাশ বললো। চা তৈরী করে আগিয়ে দিল উৎপলা ; বললো,

—হঠাৎ আমাকে বিয়ে করে ঘর-সংসার করবার ইচ্ছা তোমার মনে কেন উদয় হোল আজ—বলতে পার বিকাশ ?

—হঠাৎ নয়,—ইচ্ছাটা বহুদিন থেকেই সুপ্ত ছিল মনের মধ্যে।

—তোমার কথার সত্যতা যাচাই করতে চাইলে কিছু মনে করবে না তো বিকাশ ?

—না—যাচাই কর !—বিকাশ ধীরে ধীরে চা খাচ্ছে।

—আলোককে আমি ভালোবাসি—একথা তোমাকে একদিন বলেছিলাম, আজ আবার বলছি ; এটা জেনেও কি তুমি আমাকে বিয়ে করতে রাজি আছ ? সে-সম্পর্ক কোনো দিন তো কদর্য্য হয়ে উঠবে না তোমার সন্দেহের কশায় ! তোমার সুপ্ত ইচ্ছাটা কি আমার আলোকের উপর প্রেম থেকেই জাগে নি ?

—তুমি কি এটাকে জেলাসি বলতে চাও ? ঈর্ষা ?—বিকাশ তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করলো।

—হ্যাঁ—উৎপলা গভীর স্বরে উত্তর দিল—যাকে তুমি গণিকার থেকে কিছুমাত্র বেশি মনে কর না—তাকে বিয়ে করতে চাইবার মূলে এ ছাড়া আর কি থাকিতে পারে ?

—তোমাকে আমি প্রথম যৌবনে ভালবেসেছিলাম উৎপলা—বিকাশের স্বর গাঢ়—কোমল !

—কিন্তু প্রথম যৌবন আজ ফুরিয়ে গেছে বিকাশ—কুমারী উৎপলা বেঁচে নেই ! আজ যে আছে, তাকে আপন সন্তানের জননী করবার মত সাহস বা সদ্‌বৃত্তি তোমার আছে কি ?

—উৎপলা, ও থাক ! আমার প্রস্তাব আমি প্রত্যাহার করছি !

—ধন্যবাদ।—উৎপলা হাসলো।

ট্রেণ থাওয়া শেষ করে বিকাশ চলে গেল। উৎপলা উপরে উঠে যাচ্ছে ঘুমন্ত জীবনকে বুকে নিয়ে। আপন মনেই বলতে বলতে যাচ্ছে,

—কারো সহধর্মী আর হচ্ছিনে, জীবন, বুঝলি, এবার মায়ের ধর্ম্মেই দীক্ষা নিলাম। এমন ছেলের মা হব, যে-ছেলে কালের ধ্বংসশীলতার মধ্যে জীবনকে জাগিয়ে রাখতে পারবে। তুই হবি আমার সেই ছেলে—সেই রুদ্ররূপী মহাকাল।—চুমা দিল ওর ঠোঁটে।

উৎপলার সারা দেহে ষোড়শ-মাতৃকার জাগৃতি!

প্রকাশক—
শ্রীশান্তিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়
ভারত বুক এজেন্সী,
২০৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

মুদ্রাকর—
শ্রীগৌরচন্দ্র পাল
নিউ মহামায়া প্রেস,
৬৫।৭ কলেজ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

আমাদের প্রকাশিত পুস্তক

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের

জীবন রুদ্র—৩।০ কালরুদ্র—৪৲

চিতা-বহ্নিমান—৪৲ জ্যোতির্ময়—

হে মোর দুর্ভাগা দেশ—(১ম) ৩।০

হে মোর দুর্ভাগা দেশ—(২য়) ৪৲

নীলালক্তক—২।০

রুবেন রায়ের

স্পন্দন—৩৲ জাগ্রত জীবন—২৲

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়ের শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্তের

রাত্রির যাত্রী—৩।০ বন্ধনহীন-গ্রন্থি—৩৲

ডাঃ হেমেন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের

ভারতের বিপ্লব কাহিনী—(১ম) ৪৲

ভারতের বিপ্লব কাহিনী—(২য়) ৪৲

শ্রীকুমারেশ ঘোষের

ত্যাগাবগুস্—৩।০ ওগো মেয়ে সাবধান—২৲

শ্রীশৈলেশ বিশির

বিপ্লবী শরৎচন্দ্রের জীবন-প্রশ্ন—২৲

বীরেন দাসের

চলচ্চিত্র—৩৲ হে সৈনিক তোল নিশান—৩৲

শ্রীমাখন লাল রায় চৌধুরীর

বিশ্বের বিচিত্র পত্রাবলী—২।০

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের

জীবন রুদ্র

কালরুদ্র মহারুদ্র

রক্তঝরা • অগ্নিক্ষরা উপন্যাস !

শিল্পকে যাঁরা নিয়তির কালো কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিতে চাইবেন,—মনকে যাঁরা মানুষের শক্তিশালী মননশীলতায় লালন করতে চান,—হৃদয়কে যাঁরা অনুভূতির অভিসার-পথে ঘুরিয়ে নিতে চান পরমানুভূতির সুবর্ণময় প্রকোষ্ঠে,—সাহিত্য যেখানে সৎ—চিৎ এবং আনন্দে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ—

এ বই তাঁদেরই জন্য

দেবশ্রী সাহিত্য সমিধ

৩৫, তারক প্রামাণিক রোড, কলিকাতা—৬